অবসর প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
প্রতীক ডট ডিজাইন

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

অনুবাদকের উৎসর্গ

তিবো আন-মারি ওয়ালীউল্লাহ্-র
স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : প্রচ্ছদের অন্তরালে

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (জন্ম : ১৫ আগস্ট ১৯২২, মৃত্যু : ১০ অক্টোবর ১৯৭০) সঙ্গে, যেন আক্ষরিক অর্থেই, একেবারে নিয়তিচক্রে বাঁধা পড়েছিলাম। এই মহান বাঙালি মুসলমান লেখকের মৃত্যুর সিকি শতাব্দী পরে—*ভোরের কাগজ* ও *প্রথম আলোর* সাহিত্য সাময়িকী ও অন্যান্য ক্রোড়পত্র সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করার সময়—আমাদের হাতে আসতে শুরু করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র একাধিক অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, পত্রগুচ্ছ, আলোকচিত্র, এমনকি বাংলায় লেখা একটি মৌলিক গল্পের খণ্ডাংশ পর্যন্ত। কখনো নিজেদের অনুসন্ধানসূত্রে, কখনো বা আকস্মিক সব বিচিত্র উৎস থেকে, কখনো যেন বা প্রায় দৈবক্রমে সেসব এসে পৌঁছাতে থাকে আমাদের হাতে। আমরাও ভূতগ্রস্তের মতো সে লেখাগুলো একের পর এক প্রকাশ করে চলি।

কিন্তু আগের সকল প্রাপ্তিকে প্রবলভাবে ছাপিয়ে দেন ওয়ালীউল্লাহ্‌র মামাতো বোন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক—সুলতানা সারওয়াতারা জামান। প্রথম বৈঠকের পরপরই আলাদীনের দৈত্যের মতো তিনি আমাদের হাতে তুলে দেন ওয়ালীউল্লাহ্‌র এক আস্ত গুপ্তধন। সেই রচনারাশির মধ্যে ছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস *দি আগলি এশিয়ান*, একটি উপন্যাসিকা *হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিন্‌স্*, তাঁর নিজের লেখা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শিল্পসমালোচনা নিয়ে একটি প্রতিক্রিয়ার জবাব এবং তাঁকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী আন-মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌র এক দীর্ঘ স্মৃতিকথা। আন-মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌র সূত্রেই মূলত সুলতানা জামান লেখাগুলো পেয়েছিলেন। এসবের বাইরেও যে গল্প ও প্রবন্ধসহ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আরো বেশ কিছু লেখা রয়ে গিয়েছিল, তা জানা যায় আন-মারির কিছু চিঠি এবং পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তাঁর দেওয়া ওয়ালীউল্লাহ্‌র অপ্রকাশিত রচনার একটি অসমাপ্ত তালিকা থেকে। তালিকায় আমাদের অজানা রচনাগুলোর মধ্যে ছিল শিল্পী জুবেইদা আগা ও সাদেকাইনের চিত্রসমালোচনা; পাকিস্তানের জনগণ, সঙ্গীত ও নারীস্বাধীনতা নিয়ে আলাদা আলাদা প্রবন্ধ; 'অভিজাত বনাম গণসংস্কৃতি', 'গ্রন্থ উন্নয়ন', 'অনুন্নয়ন' এবং 'গণমাধ্যম ও সন্ত্রাস' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ইউনেস্কোর জন্য লেখা সন্দর্ভ;

স্ত্রীর কাছে লেখা অজস্র চিঠি। ধারণা করা যায়, লেখাগুলো ইংরেজি ভাষাতেই রচিত। ফরাসি ভাষায় লেখা একটি পাণ্ডুলিপির শিরোনামও এ তালিকায় দেখা যাচ্ছে। এ লেখাগুলো তালিকায় ছিল, কিন্তু কোনো পাণ্ডুলিপি আমরা পাইনি।, আশঙ্কা হয়, চিরতরেই আমরা সে লেখাগুলো হারিয়ে বসেছি কি না।

সৈয়দ আকরম হোসেনের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনাবলির দুটি খণ্ড আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। আন-মারির ইচ্ছা ছিল, আরো কিছু অপ্রকাশিত গল্প, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও শিল্পকর্মের অনুলিপিসহ এই পাণ্ডুলিপিগুলো বাংলা একাডেমী থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনাবলির তৃতীয় খণ্ড হিসেবে প্রকাশিত হবে। সে খণ্ডের যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে নিজের নামও তিনি প্রস্তাব করেছিলেন। বাংলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক মনসুর মুসার কাছে লেখা একাধিক চিঠিতে তাঁর সে তীব্র আকুতি ঝরে পড়ছে। আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না, বাংলা একাডেমী তাঁকে মৌখিক আশ্বাসও দিয়েছিল। ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ তারিখের এক চিঠিতে মনসুর মুসাকে আন-মারি লিখছেন :

> With reference to our discussion with you I am proposing to Bangla Academy to take up the project of publishing the complete works of my husband Syed Waliullah...I still have his unpublished stories, some letters, articles and paintings with me which could be of value to readers...If Bangla Academy approves of this proposal, I offer myself to work as co-editor for this publication.

আন-মারির পরের চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, বাংলা একাডেমী তাঁকে কোনো জবাব দেওয়ার সৌজন্যটুকুও দেখায়নি। একই বছরের ২ সেপ্টেম্বর আরেকটি চিঠিতে আন-মারি লিখছেন :

> This is with reference to my previous letter to you dated 29th Feruary, 1926 (enclosed) regarding a request to publish the complete works of Syed Waliullah. Unfortunately I never received any reply from you.

এর পর কী হয়েছিল, তা আমাদের অজানা। তবে বাস্তবতা এই যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌-রচনাবলির আর কোনো খণ্ড বাংলা একাডেমী থেকে বেরোয়নি।

যা হোক, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র একটি আস্ত অপ্রকাশিত উপন্যাস আছে এবং সেটি আছে সুলতানা জামানের কাছে, বছর দশেক আগে কারো মুখে শুনেছিলাম এ কথা। কার মুখে, আজ আর মনে নেই। তবু তার উদ্দেশে আজ সালাম।

দি আগলি এশিয়ান রচনার দীর্ঘ অনেকগুলো বছর বাদে এর বাংলা তরজমা *কদর্য এশীয়* বেরোনোর প্রাক্কালে আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই সুলতানা সারওয়াতারা জামানকে; কেবল পাঠকের কাছে লেখাগুলো পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালনের জন্য নয়—পাণ্ডুলিপি-সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন, কৌতূহল ও ঝঞ্ঝাট প্রসন্নচিত্তে সইবার জন্যও বটে। তিনিই জানিয়েছিলেন, *দি আগলি এশিয়ান* উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি একবারে অখণ্ড আকারে তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছায়নি। নানা হাত ঘুরে এর বিভিন্ন খণ্ডাংশ বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর কাছে আসে। আর সেই টুকরো টুকরো অংশগুলো মিলিয়ে পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ হয় ১৯২৬ সালে।

২

প্রথমেই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, *দি আগলি এশিয়ান* উপন্যাসটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কখন রচনা করেছিলেন। *কদর্য এশীয়* শিরোনামে এ তরজমাটি *প্রথম আলোর* ঈদসংখ্যা ১৯২৬-এ প্রকাশ করার সময় 'ভূমিকা'য় লিখেছিলাম বটে :

> প্রথমে শুনে এবং পরে উপন্যাসে বর্ণিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও অন্যান্য দেশীয় আভাস বিবেচনা করে আমাদের ধারণা হয়েছিল এটি ষাটের দশকের শেষে/সত্তরের দশকের সূচনাকালে রচিত ওয়ালীউল্লাহ্র সম্ভাব্য সর্বশেষ উপন্যাস। এখন দেখা যাচ্ছে, এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে। সুলেখক মাহমুদ শাহ কোরেশীকে এক চিঠিতে আন-মারি ওয়ালীউল্লাহ্ লিখেছেন, 'By the way *The Ugly Asian* was started in Dhaka in 1955..., but it was only terminated, I believe in 1961 too late to be of any more interest to English publishers.' আন-মারির বিশ্বাস যদি সত্য হয় তবে ওয়ালীউল্লাহ্র এটি দ্বিতীয় উপন্যাস। অর্থাৎ আবার এ বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে হয় শুধু মননশীল রচনায় নয়, সৃষ্টিশীল রচনায়ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উভভাষী ছিলেন।

আন-মারির চিঠিটি থেকে এমন ধারণা জাগে যে ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৫৫ সালে ঢাকায় *দি আগলি এশিয়ান* লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু ১৯৬১ সালের দিকে লেখাটি আদৌ কোনো ইংরেজি প্রকাশককে টানতে পারবে কি না—এই শঙ্কায় তিনি উপন্যাসটি লেখা বন্ধ করে দেন। আবার আন-মারি তাঁর ওয়ালীউল্লাহ্-স্মৃতিতে তাঁর কাছে লেখা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র যে চিঠি দুটোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে এ লেখাটি শুরু করার তারিখ পিছিয়ে যায় আরো এক বছর, অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে। আন-মারির কাছে ৫ নভেম্বর ১৯৫৪ তারিখের এক চিঠিতে ওয়ালীউল্লাহ্ লিখছেন :

> নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব অনিশ্চয়তায় ভুগছি। ভবিষ্যতে কী করব জানি না; কেননা এখন যা করছি তা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্য কোনো সুযোগ এখন খোলা নেই। অদূর ভবিষ্যতেও সেগুলোর ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো লাগত। এজন্যেই যে বইটি (*দি আগলি এশিয়ান*) এখন লিখছি তার ওপর এত ভরসা। মনে হচ্ছে বাইরের কোনো প্রকাশক এটি গ্রহণ করলে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলব।

ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এ ব্যাপারে আমাদের কিছুটা দ্বিধায় ফেলে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে সন্দেহের প্রায় কোনো অবকাশই নেই যে *দি আগলি এশিয়ান* উইলিয়াম জে. লেডারার এবং ইউজিন বারডিকের *দি আগলি অ্যামেরিকান* নামের তীব্র কমিউনিস্টবিদ্বেষী উপন্যাসটির গরিব দুনিয়ার মানুষের পক্ষ থেকে লেখা এক দুর্মুখ প্রত্যুত্তর। এ উপন্যাস দুটির মিল শুধু তাদের নামের সাযুজ্যে নয়, অন্তরঙ্গেও। ওয়ালীউল্লাহ্ কেবল মূল উপন্যাসের উল্টো দৃষ্টিভঙ্গিটি *দি আগলি এশিয়ান*-এ সোজা করে দিয়েছেন।

১৯৫০-এর দশকের উপান্ত থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের অনুপ্রেরণায় এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে যে জাতীয় মুক্তির লড়াই শুরু হয়েছিল, *দি আগলি অ্যামেরিকান* উপন্যাস রচনার সেটি ছিল পটভূমিকা। এ উপন্যাসের একটি ইচ্ছা যদি হয়ে থাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে একটি ইতিবাচক মোড়কে হাজির করা; অপর ইচ্ছা তাহলে ছিল গরিব মানুষের মুক্তির লড়াইকে অঙ্কুরে

নির্বাপিত করার জন্য মার্কিন কূটনীতির সামনে নতুন কিছু কৌশল ও সুপারিশ তুলে ধরা। এশিয়ার এক কল্পিত দেশে এর কাহিনী ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এর পাত্রপাত্রী হিসেবে আস্তে আস্তে প্রবেশ করতে থাকে ক্ষমতার নায়কেরা : মার্কিন রাষ্ট্রদূত, উচ্চপদ মার্কিন সেনাকর্তা, কল্পিত এশীয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন জননেতা প্রমুখ। পলিটিক্যাল থ্রিলারের ধাঁচে উপন্যাসটি ঢুকিয়ে দিয়েই তাই ঔপন্যাসিক দুজন ক্ষান্ত হননি, উপন্যাসের শেষে সমাপনী অধ্যায় হিসেবে নিজেদের বক্তব্য সাজিয়ে তাঁরা একটি প্রবন্ধও জুড়ে দিয়েছেন।

দি আগলি এশিয়ান শৈলীর দিক থেকে *দি আগলি অ্যামেরিকান*-এর ধাঁচটিকেই আগাগোড়া অনুসরণ করেছে : সেই কল্পিত এশীয় রাষ্ট্র, ক্ষমতার সেই নায়কেরা, উপন্যাসের শেষে একটি প্রবন্ধে নিজের বক্তব্যের সেই সরাসরি উপস্থাপন। কিন্তু এ সবকিছুর মধ্য দিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ রচনা করে গেছেন *দি আগলি অ্যামেরিকান*-এর এক বিপরীত পাঠ। এর মধ্যে একদিকে আছে দুর্বল ও ছোট দেশগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে তাদের ক্রীড়াভূমি বানিয়ে তোলে, তার এক রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা; অন্যদিকে আছে তার বিরুদ্ধে মানুষের ছকভাঙা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের লড়াইয়ের কাহিনী। ওয়ালীউল্লাহ্ দেখাতে চেয়েছেন এই দুইয়ের বিপ্রতীপ টানে মানুষের মানবিক পরিণাম কত বিচিত্র দিকে পৌঁছাতে পারে এবং তার ধাক্কায় ইতিহাস কীভাবে তার পুরোনো খাত থেকে সরে আসে।

তবে কথা হলো, *দি আগলি অ্যামেরিকান* প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৯ সালে। তাই অন্তত এর আগে *দি আগলি এশিয়ান* কোনোভাবেই লেখা হতে পারে না। সে ক্ষেত্রে পুরোনো সেই প্রশ্নটি আবার নতুন হয়ে ফিরে আসছে : *দি আগলি এশিয়ান* উপন্যাসটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সত্যি সত্যি কখন রচনা করেছিলেন? আন-মারিকে লেখা ওয়ালীউল্লাহ্র আগের চিঠিটির একটি অংশ আবার আমরা খতিয়ে দেখি। আন-মারি উদ্ধৃত করছেন, 'এজন্যেই যে বইটি (*দি আগলি এশিয়ান*) এখন লিখছি তার ওপর এত ভরসা।' লক্ষ করার বিষয়, ওয়ালীউল্লাহ্ নিজে কিন্তু বলেননি তিনি যে উপন্যাসটি লিখছেন সেটি *দি আগলি এশিয়ান*; তাঁর চিঠির মধ্যে—সূত্র ধরিয়ে দেওয়ার জন্য—বন্ধনীর ভেতর আন-মারি বইটির নাম তুলে দিয়েছেন। আমাদের ধারণা, আন-মারি ভুল করেছিলেন। আমরা আন-মারির ওয়ালীউল্লাহ্-স্মৃতির কাছে আবার ফিরে আসি। আগের চিঠিটি উদ্ধৃত করার পরপরই তিনি লিখছেন :

> *পরে ১৫ অক্টোবর ১৯৫৪ তারিখের একটি চিঠিতে ওই বই প্রসঙ্গে সে [সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্] লিখেছে :*
>
> যে বইটির ওপর কাজ করছি সেটি সম্পর্কে কিছু লেখা কঠিন। বইটি লিখতে চাইলে বিশাল জায়গা নিয়ে ফেলবে। এটি আসলে এখানকার গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করে লেখা উপন্যাস, তবে এর পরতে পরতে আছে আমার ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তা। এর আঙ্গিকটি মজাদারও হতে পারে। জানি না, হবে কিনা।

কিন্তু *দি আগলি এশিয়ান*-এর কাহিনীতে বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামীণ পটভূমি কখনো-কখনো হাজির হলেও একে 'গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করে লেখা উপন্যাস' বলার মোটেই কোনো অবকাশ নেই। ব্যাপারটি কি তাহলে এই যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গ্রামজীবনের ওপর ভিত্তি করে একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন বটে, কিন্তু

পরে—মাহমুদ শাহ্ কোরেশীকে আন-মারি যেমন লিখেছিলেন—১৯৬১ সালে সে উপন্যাসের প্রকল্পটি শেষ অবধি বাতিল করে দেন? এবং সে উপন্যাসটি লেখার মধ্যপথে বা পরে *দি আগলি এশিয়ান* রচনায় হাত দেন? কিংবা এমনও কি হতে পারে যে সে উপন্যাসটি লেখার সময়ই *দি আগলি অ্যামেরিকান* পড়ে ওয়ালীউল্লাহ্ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং আগের সেই উপন্যাসটি পুনর্গঠন করে *দি আগলি এশিয়ান* নামের নতুন এই উপন্যাসটির মধ্যে আত্মস্থ করে নেন? কারণ, আর যা-ই হোক, *দি আগলি এশিয়ান*-এর তুমুল রাজনৈতিক বাস্তবতা অন্তত ১৯৭০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত টগবগে ছিল। ফলে গ্রামজীবনের আখ্যান নিয়ে বিদেশী প্রকাশকদের আগ্রহ না থাকলেও, এ উপন্যাসটি নিয়ে তাদের আগ্রহ ফুরিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তখনো আসেনি। তবু এসব আন্দাজ ও কৌতূহলের সুস্পষ্ট উত্তর আমরা আর কখনোই হয়তো কোথাও পাব না।

এ উপন্যাসটি ঠিক কখন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ লিখতে শুরু করেছিলেন তা পুরোপুরি সঠিকভাবে জানতে না পারলেও কখন এটি শেষ করেছিলেন সে সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটি ধারণায় পৌঁছেছি। ১৫ অক্টোবর ১৯৬৩ তারিখে প্যারিস থেকে লেখা এক চিঠিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কবিবন্ধু আবুল হোসেনকে নানা কথার ফাঁকে জানাচ্ছেন, 'I have just finished my novel in English; I will rest for a fortnight.' আমাদের ধারণা, তিনি *দি আগলি এশিয়ান*-এর কথাই এখানে বলেছেন। কারণ—ছোটগল্পগুলো আওতার বাইরে রাখলে—ইংরেজিতে তাঁর দীর্ঘ সৃজনশীল রচনা আর মাত্র একটাই, একটি উপন্যাসিকা : *হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিন্‌স্*।

৩

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রাজনৈতিক সত্তার খোঁজ না নিলে এবং মৃত্যু অবধি বিস্তৃত তাঁর লেখকজীবনের মধ্য দিয়ে সেটি কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে সে ধারণা না থাকলে *দি আগলি এশিয়ান* উপন্যাসটি পুরোপুরি বুঝে ওঠা যাবে না। *লালসালু*র (১৯৪৯) পর *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) ও *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) উপন্যাসে তাঁর যে লেখকমূর্তিটি ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে, তাকে আমরা মোটা দাগে অস্তিত্ববাদী বলে ভাবতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। আসলেই কি তাহলে ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাবনার কোনো রাজনৈতিক অভিমুখ ছিল? থাকলে কী ছিল সেই অভিমুখ?

১৯৪০-এর দশকের ঔপনিবেশিক ভারত এক টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মস্বাতন্ত্র্যের বোধ তখন তীব্র হয়ে উঠেছে। কী রকম রাজনৈতিক বণ্টনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে সেটি আকার পেতে পারে, তা নিয়ে নানা হট্টরোলের ভেতর ভারতের পরবর্তী কয়েক বছরের ইতিহাস প্রবাহিত হবে। ওয়ালীউল্লাহ্‌র আত্মমর্যাদাবান ও সংবেদনশীল মনে এর কোনো অভিঘাত এসে পড়বে না, সে এক অসম্ভব ব্যাপার। সে সময় তাঁর মন, অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানের মতোই, কংগ্রেসের রাজনীতিতে কোনো আস্থা বা আশ্বাস খুঁজে পায়নি। তাঁর কৃষ্ণনগর কলেজের বাংলা আবশ্যিক ক্লাসের সহপাঠী ঋষীকেশ লাহিড়ীর একটি দিনের স্মৃতিচারণা থেকে শোনা যাক :

> একদিন কৃষ্ণনগর কলেজ সংলগ্ন মাঠে দুজনে কথাবার্তা হচ্ছিল। আচমকা ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেব বলে উঠলেন, 'আমাদের বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হবার আগে আমার

যথার্থ পরিচয় আপনার জানবার দরকার। আমি মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ কর্মী। আশা করি আপনি হয় কংগ্রেসকর্মী, নয় কংগ্রেস সমর্থক। এবার আপনি ঠিক করুন আমাদের আর অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে কিনা।' এ ধরনের অভাবিত সত্যভাষণে আমি অভিভূত। দুজনের মধ্যে যে পর্দা ছিল সেটি অপসারিত হলো।

মুসলিম লীগের সমর্থক নয়, একেবারে 'একনিষ্ঠ কর্মী' হিসেবেই ওয়ালীউল্লাহ্ সে দিন নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে ওয়ালীউল্লাহ্ সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন, এমন কোনো তথ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। তাঁর উক্তির মধ্যে তরুণসুলভ চপল অতিশয়োক্তি থাকা বিচিত্র নয়, তবে তাঁর মুসলিম লীগে সমর্পিত মনোভাব এতে একেবারে খোলামেলা। ভারত রাষ্ট্রের ভেতর মুসলমানদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ রক্ষার জন্য অগ্রনায়ক হিসেবে তিনি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কেই মেনে নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র ঐতিহাসিক বিবেচনাটি কী ছিল তা বোঝার জন্য কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেয়ে ঋষীকেশ লাহিড়ীকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেওয়াই যথেষ্ট। জিন্নাহ্ মারা যাওয়ার পর, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ তারিখের সেই চিঠিতে, ওয়ালীউল্লাহ্ লিখছেন :

> কায়েদে আজমের মৃত্যু অপূরণীয়। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এ যাবৎ পৃথিবীর মহত্তম ব্যক্তিদের একজন। কিন্তু তার মহত্ত্ব ছিল প্রধানত এই যে তিনি অধঃপতিত, প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া মুসলমানদের অনিশ্চিত অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তিনি ভারতবর্ষে তাঁর স্বধর্মের কোটি কোটি মানুষের পক্ষে যে বিশেষ অবদান রেখেছেন, সেখানে তাঁর বড়ো মহত্ত্ব। গত দশ বছর যে তাঁর জীবনের সবচেয়ে কীর্তিময় সময় ছিল এটা আপনিও নিশ্চয়ই মানবেন; এই সময়কালে তাঁর সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল শুধু একটা লক্ষ্যের প্রতি : মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করা। এর জন্য তিনি কঠিন পরিশ্রম করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। তিনি যা কিছু করেছেন সে জন্য মুসলমানরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই বিদেহী নেতার মহত্ত্ব সম্পর্কে আপনার ইতিবাচক মূল্যায়ন তাঁর বিশ্বাসীদের অনুসারীদের জন্য বিরাট আনন্দের ব্যাপার।...
>
> আমরা, এই উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমানরা যদি জাতীয় পর্যায়ে এই উপলব্ধি অর্জনের জন্য আন্তরিকভাবে নিজেদের নিবেদন করতে পারতাম এবং তা অর্জন করতে সক্ষম হতাম, কী সুখী আর গর্বিতই না হতে পারতাম আমরা। পাকিস্তান ও ভারত উভয়ই আজ করুণভাবে খাটো হয়ে আছে। এই স্থায়ী বিচ্ছেদের ভবিষ্যৎ দুঃখজনক, কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবন রক্ষার জন্য এই অস্ত্রোপচার অনিবার্য ছিল। যদি আমরা শুধু এই অস্ত্রোপচারের জরুরি দরকারটাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারতাম।

এ চিঠিতে ওয়ালীউল্লাহ্‌র মনের বিষণ্ন দ্বিধাটুকু লক্ষ করার মতো। ভারত-পাকিস্তান ভাগ তিনি মেনে নিয়েছিলেন এক নিষ্ঠুর রাজনৈতিক বাস্তবতা হিসেবে। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, ঔপনিবেশিক ভারত রাষ্ট্রের সমাজ-রাজনীতিতে হিন্দু ও মুসলমানের বৈষম্যই একে এক নির্মম বিচ্ছেদের দিকে ঠেলে দিয়েছে; সমাজ-রাজনীতির ভেতরকার ফাটল পরিণামে আত্মপ্রকাশ করেছে এ রাষ্ট্রের ভূগোলের মধ্য দিয়ে। ভেতরের সেই ক্ষতের শুশ্রূষার মাধ্যমে এ রাষ্ট্রীয় বিচ্ছেদ এড়ানো গেলেই হয়তো তিনি সুখী বোধ করতেন। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে দানা বেঁধে ওঠা পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রকল্প

সে কারণে তাঁর মনের সায় পায়নি। তাঁর মন তখন আশ্রয় খুঁজেছিল হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের মধ্যে। আরো কয়েকজন বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে এক বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়ে ১৯৪৭ সালে তিনি তাই এ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হন।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই রূপান্তরশীল মন যে কোনো ছক-কাটা রাজনীতির মধ্যে আটকে না থেকে চলমান ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমাগত রূপায়িত হয়ে চলবে, সেটা অনুভব করা কঠিন নয়। তার প্রমাণ পেতে আমাদের বেশি অপেক্ষা করতে হয় না। মাত্র দেড় যুগের মধ্যেই *দি আগলি এশিয়ান* উপন্যাসে ওয়ালীউল্লাহ্‌র এক নতুন রাজনৈতিক চেহারা ঝলকে ওঠে। এ উপন্যাসে তাঁর রাজনৈতিক সত্তা যেন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে উদ্‌গীরিত হয়েছে। তিনি এতে প্রবলভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, বিভিন্ন গরিব দেশের জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ের অকুণ্ঠ সমর্থক, এমনকি সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর পক্ষপাতও মোটেই প্রচ্ছন্ন নয়। মনে রাখা দরকার, স্নায়ুযুদ্ধের সেই দ্বিধাবিভক্ত দুনিয়ায় পাকিস্তান তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক লেজুড়-রাষ্ট্রবিশেষ। এটি আর যা-ই হোক, ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বপ্নের রাষ্ট্র নয়, এ রাষ্ট্রে তাঁর মন পড়ে থাকার কথা নয়।

এই প্রস্থানপট মনে রাখলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসের এক ভিন্ন তাৎপর্যও সম্ভবত আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারে। এখানে এ নিয়ে বাগ্‌বিস্তারের অবকাশ নেই। আমরা শুধু সামান্য ইশারা দিয়ে শেষ করব। ভারতের বিশাল ভূখণ্ড দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে বিচ্ছিন্ন দুই অংশ নিয়ে গড়ে ওঠা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভৌগোলিক কাঠামোটি ছিল পৃথিবীতে নজিরবিহীন। কালক্রমে মূল ভূখণ্ড হিসেবে পোক্ত হয়ে ওঠা পশ্চিম পাকিস্তান তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানকে একাধারে প্রান্তিক ও নিজের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। কার্যত ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যে আদান-প্রদানের সমস্ত যোগ। পূর্ববাংলার স্বাধিকার আন্দোলন যখন বেগবান হয়ে ক্রমাগত জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, *কাঁদো নদী কাঁদোর* প্রকাশ সেই সময়ে, ১৯৬৮ সালে। সেই উত্তাল প্রেক্ষাপটে এ উপন্যাসে একটিমাত্র স্টিমার দিয়ে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে বাঁধা—যে সংযোগও কিনা একেবারে ছিন্নপ্রায়—কুমুরডাঙ্গা দ্বীপটির সঙ্গে পূর্ববাংলার আশ্চর্য মিল কীভাবে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল, সে এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

ওয়ালীউল্লাহ্‌-রচনার রাজনৈতিক বীক্ষণ আমাদের জন্য খুবই জরুরি। নইলে অতি অভ্যস্ত চর্বিত ভাষ্যে ওয়ালীউল্লাহ্‌র পুরো পরিচয় অধরাই থেকে যাবে।

৪

দি আগলি এশিয়ান উপন্যাসের যে পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে এসেছিল, সেটি দেখে প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ এটি চূড়ান্ত পাঠ হিসেবে তৈরি করেছিলেন। পুরো পাণ্ডুলিপি ফুলস্কেপ কাগজে ডাবল স্পেস দিয়ে পরিপাটিভাবে টাইপ করা, কখনো-কখনো দুয়েকটি শব্দের মাত্র সামান্য হস্তাবলেপন। কেবল পাণ্ডুলিপির ১৮৪ নম্বর পৃষ্ঠাটি—পর্ব : ৪, প্রথম অধ্যায়, ২ নম্বর পরিচ্ছেদের তৃতীয় অনুচ্ছেদের পরের কিছু অংশ—পাণ্ডুলিপি থেকে কোনোভাবে খোয়া গিয়েছিল আগেই। ওয়ালীউল্লাহ্‌র পুত্র ইরাজ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে এ ব্যাপারে প্যারিসে ইমেইলে যোগাযোগ করেও সে পৃষ্ঠার আর কোনো সন্ধান আমরা পাইনি।

দি আগলি এশিয়ান-এর পাণ্ডুলিপির ওপরে উপন্যাসের শিরোনামের নিচে লেখকের নাম হিসেবে লেখা ছিল আবু শরিয়া। একেবারে নিচে ওয়ালীউল্লাহ্-পত্নী আন-মারি তিবোর নাম ও ঠিকানা। কোনো এক রহস্যময় কারণে ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর উপন্যাস *দি আগলি এশিয়ান* ও উপন্যাসিকা *হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিন্‌স্* আবু শরিয়া নামে মুসাবিদা করেছিলেন।

নিজেকে প্রকাশ করার জন্য বাংলা ভাষা ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রধান মাধ্যম হলেও লেখকজীবনের প্রায় শুরু থেকে তিনি ইংরেজি ভাষাতে লেখালেখির চর্চাও সমান্তরালভাবে অব্যাহত রেখেছিলেন। তবে প্রথম দিকে এ দুই ভাষায় রচিত লেখাগুলোর স্বভাব ছিল আলাদা। তখন বাংলা ছিল মূলত তাঁর সৃজনশীল রচনার মাধ্যম, আর ইংরেজি মূলত মননশীল বা সমালোচনামূলক রচনার; যদিও ইংরেজিতে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু ছোটগল্প তিনি লিখেছেন। লেখকজীবনের মধ্যপর্যায়ে এসে তিনি ইংরেজিতে ক্রমাগত সৃজনশীলভাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেন। ১৯৫৪ সালেই—আগে উদ্ধৃত করা এক চিঠিতে ওয়ালীউল্লাহ্ জানাচ্ছেন—তিনি একটি ইংরেজি উপন্যাস লেখায় মন দিয়েছেন। আমাদের আন্দাজ অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের পরে কোনো এক সময় *দি আগলি এশিয়ান* লেখা শুরু করে ১৯৬৩ সালে যদি তিনি সেটি শেষ করে থাকেন, তাহলে সামগ্রিকভাবে এ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস—ইংরেজি ভাষায় প্রথম। এর পরের বছর, ১৯৬৪ সালে, বেরোয় তাঁর দ্বিতীয় বাংলা উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যা*। এখন বোঝা যাচ্ছে, দীর্ঘ এই এক দশক ধরে যে ওয়ালীউল্লাহ্ লেখালেখির মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষার দিকেই ঝুঁকে ছিলেন, এর পেছনে তাঁর সচেতন অভিপ্রায়, এমনকি এক মরিয়া প্রচেষ্টা ছিল। কী তাড়না ছিল সেই মনোভাবের পেছনে?

১৮ অক্টোবর ১৯৫৪ তারিখে—তাঁর ইংরেজি ভাষায় লেখালেখি আরম্ভ করার সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে—অস্ট্রেলিয়ায় প্রেস অ্যাটাশের পদ ছেড়ে তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্ বদলি হয়ে সিডনি থেকে ঢাকা আঞ্চলিক তথ্য দপ্তরে এসে যোগ দিয়েছেন। ঢাকা তাঁর রোচেনি। নিজের পেশাজীবন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যে সে সময় তিনি খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন, আন-মারিকে লেখা তাঁর ৫ নভেম্বর ১৯৫৪ তারিখের চিঠির উদ্ধৃতিটিতে সেটি স্পষ্ট। আবুল হোসেনের স্মৃতিকথায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে :

> এই পোস্টিং ওঁর একেবারেই পছন্দ হয় নি। এই সময় ওয়ালীউল্লাহ্ যতোদিন ঢাকায় ছিলেন ওঁর মন তেমন ভালো ছিল না। হয়তো সারাদিন অনভিপ্রেত অফিসের কাজের গ্লানি ডুবিয়ে দিতে হামেশাই সন্ধ্যার দিকে ছুটে আসতেন আমার আজিমপুরের ফ্লাটে।

আমাদের মনে পড়বে, ৫ নভেম্বর ১৯৫৪ তারিখের চিঠিটিতে ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর তখন রচিতব্য উপন্যাসটি সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'মনে হচ্ছে বাইরের কোনো প্রকাশক এটি গ্রহণ করলে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলব।' এ ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়। বিদেশী প্রকাশকেরা তাঁর বইটি গ্রহণ করলে ইংরেজিকেই যে তিনি লেখার প্রধান মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়ে নিজের জন্য একটি পেশাদার লেখকজীবন বেছে নিতেন, চিঠিটি সে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এখানে আর যে প্রশ্নটি ওঠা স্বাভাবিক, তা হলো অন্য কোনো সৃজন বা মননধর্মী লেখায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যেখানে কখনো ছদ্মনামের আশ্রয় নেননি, সেখানে বিশেষ এই লেখা দুটোতেই কেন তিনি ছদ্মনামের আড়াল নিতে গেলেন?

আমরা দেখেছি, লেখকজীবনের মধ্যপর্যায় থেকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক সত্তা ক্রমশ প্রত্যক্ষ আকার নিচ্ছিল। ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই কূটনীতিকের চাকরিসূত্রে ওয়ালীউল্লাহ্‌র বদলি হয়ে চলেছিল একের পর এক বিদেশী দূতাবাসে; ১৯৬৭ সাল থেকে তিনি জড়িয়ে পড়েন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায়। এমন ঘোরতর রাজনীতিলিপ্ত রচনাগুলোর সঙ্গে নাম জড়িয়ে ফেলে নিজেকে কি তিনি বিপন্ন করে তুলতে চাননি? নাকি নিজের এই সত্তাটিকে অজ্ঞাত কোনো কারণে তিনি নিভৃতে রেখে দিতে চেয়েছিলেন? এসব প্রশ্নেরও কোনো স্পষ্ট জবাব আমরা আর পাব না।

৫

সন্দেহ নেই, ওয়ালীউল্লাহ্‌র অন্যান্য উপন্যাসের মতো *কদর্য এশীয়* নিয়েও পাঠকমহলে দীর্ঘ আলোচনার সূত্রপাত হবে, বিশেষ এক কল্পিত ভূখণ্ডে ওয়ালীউল্লাহ্ যে আখ্যান বিশদ করেছেন, মনে হবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের আগেই তার এক ভবিষ্যৎচিত্র তাতে আশ্চর্য মায়াবলে ধরা পড়েছে। এমনকি বর্তমান বিশ্ব ও জাতীয় প্রেক্ষাপটেও এ উপন্যাস আমাদের সজীব অভিজ্ঞতার অন্তর্গত বলে মনে হবে।

আগেই বলেছি, *দি আগলি এশিয়ান* উপন্যাসের এ তরজমাটি প্রথম বেরিয়েছিল *প্রথম আলোর* ঈদসংখ্যা ২০০২-এ। তরজমার কাজ শুরু করার আগে অনুবাদক শিবব্রত বর্মনের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনায় বসেছি। আমরা বুঝে উঠতে চেয়েছি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শব্দপ্রয়োগের বিশেষ ধরন, শব্দ নিয়ে তাঁর শুচিবাই ও লেখকসুলভ মুদ্রাদোষ, তাঁর ক্রিয়াপদের ব্যবহার, তাঁর বাক্যসংস্থানের চরিত্র। আমাদের লক্ষ্য ছিল, এ অনুবাদে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষাভঙ্গি সাধ্যমতো অনুসরণ করা, যাতে তাঁর উপন্যাস-আবহ কিছু পরিমাণে হলেও পাঠকের মনে রচনা করা যায়। অনুবাদটি সম্পাদনার কাজও হয়েছে কয়েক তরফে। কথাশিল্পী শহীদুল জহিরের কথা এ ক্ষেত্রে আলাদাভাবে উল্লেখ করার মতো। নানা ব্যস্ততার মধ্য থেকে সময় বের করে এ কাজে তিনি আন্তরিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন কবি ব্রাত্য রাইসু। তবে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ধন্যবাদ দেওয়া-নেওয়ার নয়।

এবার চলুন, পাঠক, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নতুন ও অনাবিষ্কৃত এই ভুবনে আমরা যাত্রা শুরু করি।

পর্ব : ১

প্রথম অধ্যায়

১

রাত্রি নেবেছে, দক্ষিণ দিক থেকে শীতল ক্ষীণ হাওয়া বইতে শুরু করে। মার্কিন ভদ্রলোক যে সার্কিট হাউসে উঠেছেন, রহিম তার প্রাঙ্গণ পেরিয়ে দেখে সফেদ গেটের বাইরে স্ট্রিটল্যাম্প ঘিরে রেণুমিশ্রিত প্রজাপতি ফরফর করে উড়ে বেড়ায়।

রহিম লাজুক আবেগপ্রবণ যুবক। ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকলে তার হাত সিঁড়ির পালিশ করা রেলিং বেয়ে মসৃণভাবে গড়িয়ে যায়। দ্বিতীয় তলাতে উঠে সে বাঁয়ে ফেরে, কাঠের রেলিং ছুঁয়ে ছুঁয়ে করিডোর বেয়ে আলগোছে হেঁটে যায়। আবার বাঁয়ে ফিরে অতিথির ঘরের সামনে নিজেকে আবিষ্কার করে।

দরজায় কড়া নাড়ার আগে সে কান পাতে। ভেতরের স্নানঘর থেকে মুখে আঁজলাভরা পানি ছিটানোর আওয়াজ ভেসে আসে। সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে সাতটা তিন বাজে। তার বাবা মার্কিন ভদ্রলোককে ৭টায় তুলে নিতে বলেছেন। এবার সে দরজায় টোকা দিয়ে অপেক্ষা করে। উত্তর নেই। পানির খলবল শব্দ ছাপিয়ে কারো গুনগুন আওয়াজ ভেসে আসে—নিঃসন্দেহে মার্কিন ভদ্রলোকের গলা। সে আবার টোকা দেয়। এবার বেশ জোর পড়ায় তার আঙুল ব্যথা করে ওঠে।

ভেতর থেকে মার্কিন ভদ্রলোক এবার উচ্চৈঃস্বরে কিছু বলে, উচ্চারণ জড়ানো বলে রহিম তা বুঝতে পারে না। সে ঘুরে রেলিংয়ের কাছে গিয়ে নিচের পরিচ্ছন্ন, শীতার্ত ও কালচে সবুজ বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাগানের একপ্রান্তে হাস্নুহেনা গাছ। তার ফুলের গন্ধ নিতে নিতে সে ভাবে, মার্কিন ভদ্রলোক গত দুদিন ধরে এখানে আছে, সেও কি হাস্নুহেনার এ গন্ধ পেয়েছে? যদি পেয়ে থাকে, তার কি ভালো লেগেছে? হাস্নুহেনার গন্ধ রহিমের হৃদয়ের অন্তস্তলে কোথায় যেন নাড়া দিয়ে যায়, এ ফুল শুধু রাতের বেলা গোপনে গন্ধ ছড়ায়। রহিম কী এক বিচিত্র টান অনুভব করে, কখনো অস্ফুট বেদনা বোধ হয়, কখনো মনে হয় কোন অতীতের গহন থেকে উঠে আসা বিষাদে তার বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে ওঠে। সে ভাবে, কত কিছু তাকে তার অতীতে টেনে নিয়ে যায়। অতীতের কোনো সুনির্দিষ্ট স্মৃতিতে নয়, কেবল অতীতে। সে এখনো বিশে পড়েনি, তবু তার অতীত দূর দিকচক্রবালে ক্ষিপ্রবেগে অপসৃয়মাণ বলে তার বোধ হয়। হয়তো সেখানে তার কামনা-

বাসনার কিংবা স্মৃতিচারণের কিছু নেই। জীবন তার কাছে কুয়াশার ভেতর এক সুদীর্ঘ যাত্রা, যে কুয়াশার মধ্যে বহুকিছু অন্তর্লীন হয়ে আছে; দেখা যায় না, তবু যেন সে তাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। সে ভাবে, মার্কিন ভদ্রলোকের অতীত না জানি কেমন।

'ভেতরে এসো।'

রহিম ফিরে দাঁড়ায়। দরজা এখন ঈষৎ উন্মুক্ত। সে আলগোছে দরজা খুলে দেখতে পায় ধবধবে সাদা জামা হাতে মার্কিন ভদ্রলোক বিছানার পাশে দাঁড়ানো। ভদ্রলোক নগ্ন।

'এসো', মার্কিন ভদ্রলোক আবার বলে। রহিম সহসা দ্বিধাবোধ করে। তারপর যেন-বা নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রবেশ করে। নগ্ন মানুষ দেখতে সে অভ্যস্ত নয়। এ কারণে মুখের ঈষৎ রক্তিমাভা সে গোপন করতে পারে না। কিন্তু তার চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই।

'কিছু মনে করোনি আশা করি।' মার্কিন ভদ্রলোক প্রফুল্ল কণ্ঠে বলে পুনরায় স্নানঘরে চলে যায়। পরমুহূর্তে সে বেরিয়ে এলে দেখা যায় এবার সে বস্ত্র পরিহিত। হয়তো রহিমের মৃদু অস্বস্তি সে অনুমান করেছে।

'আশা করি কিছু মনে করো নাই। সংবাদপত্রের কিছু তরুণ কাল দেখা করতে এসেছিল। আমি ডাকিনি, ওরাই এসেছিল দেখা করতে। অন্তর্বাস পরে ছিলাম বলে ওরা মনঃক্ষুণ্ন হলো। এতে মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার কী আছে বুঝি না। বসো।'

রহিম আরামচেয়ারের দিকে এগিয়ে যায়, শিরদাঁড়া ঋজু করে সে তার অগ্রভাগে বসে। সে ভাবে তার কিছু বলা উচিত, কিন্তু বোঝে না কী বলবে। এ জন্য সে বলে, 'একটু দেরি হয়ে গেল বলে দুঃখিত।'

'দেরি করেছ বলে তো মনে হয় না।'

ভদ্রলোকের নগ্নতা রহিমের মুখে অস্পষ্ট রক্তিমাভা এনে দিয়েছিল। কিন্তু এবার সে ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে ওঠে। সে ভাবে, মার্কিন ভদ্রলোক তার বাম হাতের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, তার হাতে বাঁধা পুরনো ঘড়িটি ঠিকমতো সময় দেয় না। কিন্তু লোকটি সেদিকে তাকিয়ে নেই।

'আমাদের কতদূর যেতে হবে?'

'এই তো কয়েক গজ', রহিম সরবে উত্তর দেয়।

মার্কিন ভদ্রলোক এবার পোশাক পরে নেয়। সঙ্গে নেয় একটি সিগারেটের প্যাকেট।

'আমি তৈরি।'

ঘরের ভেতর বাতাস গুমট ও ভারী। বাইরে শীতল আমেজ, নিঃশব্দ, এখনো প্রায় অগোচরে হাওয়া দেয়। মার্কিন ভদ্রলোকের ঘাম ঝরতে থাকে। ঠাণ্ডা হাওয়া তার কপাল স্পর্শ করলে সে এদিক-সেদিক তাকায়, কোত্থেকে বাতাস আসছে যেন তা খোঁজার চেষ্টা করে।

গেটের বাইরে বেরিয়ে ভদ্রলোক সহসা তার দিকে দৃষ্টি দেয়। বলে, 'তোমার বয়স কত, রহিম?'

'উনিশ।'

'দেখলে আরো কম বলে মনে হয়।'

'সারা জীবন ধরে ধীরে বাড়ি আমরা। বিশে পড়লে আমাদের মনে হয় দশে পড়েছি, পঞ্চাশে লাগে ত্রিশ। বয়স্ক আর অভিজ্ঞ হয়ে ওঠার আগেই আমরা পরপারে পা রাখি।'

সে থামে, তারপর রহস্যময় কণ্ঠে বলে, 'অবশ্য আমাদের চেহারায় কিছু যায়-আসে না।' সে অন্ধকারে মৃদু হাসে। ভাবে, সে হয়তো চাতুর্যপূর্ণ কিছু বলে ফেলেছে। সে বুঝতে পারে তারা এখন অন্ধকারে বেরিয়ে এসেছে বলে তার পক্ষে এমন বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলা সম্ভব হচ্ছে।

খানিক পরে মার্কিন ভদ্রলোক বলে, 'আজ রাতে তোমাদের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে, লেখক-অধ্যাপক-শিল্পীদের সাথে।'

'ছেলেমেয়েরা কিছু নাচ-গানও করবে। বাবা আপনাকে', সে খানিকটা দ্বিধা করে, তারপর দ্রুত বলে, 'আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে ধারণা দিতে চান।'

'চমৎকার। তোমার কী মনে হয়?'

যুবক তার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলে, 'বাবা মাঝে-মধ্যেই মার্কিনিদের দাওয়াত করেন। কোনো মার্কিনি বাদ যান না।'

'তুমি সেটা পছন্দ করো না মনে হচ্ছে?'

তাদের দুজনের চারিধারে অন্ধকার, যুবক কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে। সে সুস্পষ্ট কোনো উত্তর দিতে চায়। কিন্তু সে টের পায় এ বিষয়ে তার কোনো মতামত নাই। নিরুত্তেজ কণ্ঠে সে বলে, 'পছন্দ না করার কী আছে?'

কিছুক্ষণ পর মৃদু গলায় সে আবার বলে, 'এই যে, আমরা এসে পড়েছি।' তারা ফ্ল্যাটবাড়ির একটি আধুনিক ব্লকের সামনে এসে

২

মেজবান আবদুল হক স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান। পুরু চশমা, বৃত্তাকার চেহারার মানুষ, দুটি পশ্চিমা দেশ থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট। বলা নিষ্প্রয়োজন, দূরবর্তী দেশগুলিতে বিদ্যালাভের বিজয়াভিযান শুরু করার আগে দেশে তিনি কলাবিভাগে প্রথম শ্রেণীতে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি তিনটি বই লিখেছেন, সেগুলি তাঁর ছাত্রাবস্থার পরিশ্রমের ফসল। দেশমাতৃকার বিচিত্র অর্থনৈতিক সমস্যাবলির ওপর তাঁর লেখা বিচ্ছিন্ন কিছু নিবন্ধও রয়েছে। এসব পুস্তক ও নিবন্ধাদির মাধ্যমে তিনি সরকারকে, তাঁর ভাষায়, 'কতিপয় আর্থিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা' অনুধাবন করাতে কখনো ব্যর্থ হননি, তিনি বলে থাকেন 'সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের বিকাশমান অর্থনীতির' সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে তাঁর বক্তব্যের ব্যাপারে সরকার কিংবা তাঁর ছাত্র কারোরই খুব একটা মাথাব্যথা লক্ষ করা যায় না। এ জন্য অবশ্য তাঁকেও খুব একটা পীড়িত বলে মনে হয় না। নিজেকে তিনি তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ বিবেচনা করেন, নিজ দেশে পরিসংখ্যানের অপর্যাপ্ততা বিষয়ে প্রায়শ তাঁকে তীব্র ভাষায় অভিযোগ করতে দেখা যায়। স্থানীয় অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর তত্ত্বসমূহ নির্মাণ করেছেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছে এখানে জন্মে তিনি অন্যরকম করতে পারেন না। তবে সুপ্রচুর পরিসংখ্যান উপাত্ত বিদ্যমান এমন দেশ নিয়ে কাজ করতে পারলে তিনি খুশি হতেন।

অর্থনৈতিক তত্ত্ব ছাড়া, যে বিষয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাঁর আগ্রহে ভাটা পড়েছিল, সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রতি তাঁর ছিল আসক্তি। মাঝে-মাঝে তিনি বাল্যকালের গান

গেয়ে ওঠেন, সেসব গানে শিশুতোষ ছড়ার সারল্য। তবে তাঁর সন্তানেরা তাঁর গানে বিরক্ত বোধ করে। তবু তিনি হৃদয় দিয়ে গান করেন। তিনি গাইলে প্রতিটি শব্দ গভীর তাৎপর্য লাভ করে। বিদেশীদের বোঝাতে গিয়ে বলেন, 'কেবল গান গাওয়ার সময়ই আমাদের ভেতরকার সত্যটি বেরিয়ে আসে।'

ছোট দ্রুত পদবিক্ষেপে দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আবদুল হক চেঁচিয়ে বলেন, 'আপনি এসেছেন, খুব প্রীত হয়েছি।' এরপর তাঁর হাত ধরে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে—যেন ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোনো কিছুতে জড়িয়ে গেছে এমনভাবে ঘরজুড়ে নিঃশব্দে বসে থাকা অপরাপর অতিথিদের উদ্দেশে ঘোষণা করেন, 'মি. জনসন, আমাদের সম্মানিত অতিথি। আমাদের দেশের ওপর তিনি একটি বই লিখতে যাচ্ছেন।'

'না, আসলে বই নয়', জনসন আপত্তি করে।

'বই-ই তো দাঁড়াবে', অবতারের মতো ঘোষণা দেন মেজবান। তারপর তিনি সহসা বলেন, 'আসুন, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

সব মিলিয়ে বারোজন হবে। জনা দুয়েক সরকারি কর্মকর্তা, একজন চিত্রশিল্পী, মেনিমুখো এক ব্যক্তি, যার নামটি আবার শিল্পীর সঙ্গে মিলে যায়, তবে মেজবান বলেন, 'নাম এক হলেও বানান ভিন্ন, মনে রাখবেন কিন্তু।' লোকটা ইতিহাস পড়ায়। তবে দু'জনের অভিন্ন নামের বিষয়টা মার্কিন ভদ্রলোক বুঝতে পারে না। 'বিশ্ববিদ্যালয় এখনো দেখেননি?' গভীর বিস্ময়ে আর্তনাদ করে ওঠেন মেজবান এবং জনসন মিনমিন করে দেশ ছাড়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখা সম্পর্কিত তার ইচ্ছের কথা বলে। এ ছাড়াও আছেন অ্যান্ডারসন নামে এক মার্কিন ভদ্রলোক, যিনি 'অ্যামেরিকান ফ্রেন্ডস অব দ্য ইস্ট'-এর কর্ণধার। 'দারুণ এক সংগঠন, আপনাকে কী বলব', উচ্ছ্বাস-গদগদ মেজবান তাঁকে আশ্বস্ত করেন, 'ভীষণ কাজের কাজ করছে এরা। আপনাদের মহান গ্রন্থগুলি অনুবাদ করছে, নৈশকালীন ক্লাস নিচ্ছে, কী নয়। আপনার হয়তো অজানা নয় এসব।' তাঁর পাশে কৃশকায় এক ব্যক্তি, ঝুলে পড়া থিকথিকে ভ্রূর নিচে এক জোড়া কোটরাগত চোখ। ব্রিটিশ নাগরিক, তাঁর দেশের স্থানীয় সাংস্কৃতিক কাউন্সিলের প্রধান। তিনি ডান হাত বাড়িয়ে দেন না। তাঁর ডান হাত নেই। তবে, জনসন ভাবে, সংস্কৃতিবান মানুষের হাত থাকার অত দরকারটাই-বা কী? তারপর তাঁর চোখ মেজবানের বাড়িয়ে ধরা হাত অনুসরণ করে।

'আর এই যে, এ হলো আমার ছেলে, তাকে তো চেনেন নিশ্চয়। আর এই আমার কন্যা আর তাদের বন্ধুবান্ধব।'

প্রথম চেয়ারটি গ্রহণ করে জনসন বসে পড়ে। ছাদের দিকে দৃষ্টি দেয়। একটা ফ্যান ঘুরছে। তার ঘায়ে সৃষ্ট বাতাসের ক্ষীণ সঞ্চালন ঘর্মাক্ত কপালে অনুভব করা যায়। সে ভেবে পায় না, কেন তার কাছে এ সন্ধ্যা ভালো লাগবে না বলে মনে হচ্ছে। নিঃসন্দেহে কোথাও একটা গড়বড় আছে, কিন্তু কী সেটা সে জানে না।

চারপাশে তাকানোর জন্য ঘাড় ঘোরাতেই সে দেখে ইতিহাসের অধ্যাপক—নাকি অধ্যাপক নন, চিত্রশিল্পী—তার দিকে চেয়ে আছে, শীর্ণ মুখমণ্ডলে উপচানো হাসি। প্রত্যুত্তরে জনসনও হাসতে চায়। না, এ নির্ঘাত ইতিহাসের অধ্যাপক না হয়ে যায় না।

'আপনি ইতিহাস পড়ান, তাই না?'

'ঠিক ধরেছেন', উত্তর করেন অধ্যাপক, মিষ্টি হাসিটি এখনো লেগে আছে।

জনসন সিদ্ধান্তে আসে, অধ্যাপকের সহাস্য মুখ তার পছন্দ হচ্ছে না। এ মাত্রাতিরিক্ত বন্ধুবৎসল মুখমণ্ডলের পশ্চাতে এক কুটিল ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে বলে তার সন্দেহ হয়,

কোনো বিদঘুটে ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে তাকে বাধ্য করার ষড়যন্ত্র। সে কেন এ কথা ভাবছে? এ জন্য দায়ী কি সেই অধ্যাপক যে একই প্লেনে করে তার সঙ্গে এসেছিল এবং ডোনাটিস্টদের বিষয়ে যার একটি তত্ত্ব ছিল? আচ্ছা, ডোনাটিস্ট যেন কারা? ও হ্যাঁ, একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়, চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে উত্তর আফ্রিকায় বসবাস করত।

নিউইয়র্ক থেকে সুদীর্ঘ যাত্রায় জনসন অতিশয় শ্রান্ত ছিল। তাছাড়া ট্যুরিস্ট ক্লাসের সিটগুলিও সংকীর্ণ। অধ্যাপকের বিহ্বল মুখমণ্ডলটি ছিল তার গা ঘেঁষে, আর যে মানসিক উত্তেজনায় সে ডোনাটিস্টদের নিয়ে তার দুরূহ জটিল তত্ত্ব বিবৃত করে যাচ্ছিল, তা ছিল যেন আদিঅন্তহীন।

সে কথা স্মরণ করে জনসন শিহরিত হয়।

পূর্ববৎ হাসার চেষ্টা করে সে বলে, 'আশা করি আপনি ডোনাটিস্টদের ব্যাপারে কিছু শোনাবেন না।'

অধ্যাপকের হাসি ম্লান হয় না, তবে তাকে ঈষৎ দোলাচলে পড়ে যাওয়া মানুষ বলে মনে হয়। হয়তো ডোনাটিস্টদের নাম-পরিচয় তিনি জানেন না। হয়তো এ দেশে ডোনাটিস্টদের ওপর প্লেনের সেই অধ্যাপকেরই একমাত্র এক্তিয়ার। কিন্তু জনসন কোনো ব্যাপারেই কোনো বক্তৃতা শুনতে রাজি নয়। সারাদিন খুব পরিশ্রম গেছে, তার ওপর গুমট গরম।

সহসা সে অন্যদিকে ফেরে। বসে থাকা কর্মকর্তাদের একজন তাকে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে, 'এ দেশে কি এই প্রথম, মি. জনসন?'

উত্তর দেওয়ার আগেই সে দেখে শিল্পী তার সামনে দাঁড়িয়ে। কর্মকর্তা সহসা বলে, 'হোসেন। ও চিত্রশিল্পী।'

চিত্রশিল্পী রয়ে-সয়ে অতিথির দিকে তাকায়। তারপর কাশে। 'আপনি আমার জীর্ণ স্টুডিও ঘুরে গেলে খুশি হব।'

কর্মকর্তা ঘোষণা করে, 'ও খুবই প্রতিভাবান।'

'যেতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু সময় পাব কি না বুঝতে পারছি না।'

'বেশি সময় লাগবে না', চিত্রশিল্পী অনুনয় করে।

'না', জনসন দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'মনে হচ্ছে না সম্ভব হবে।'

সহসা জনসন বুঝতে পারে সন্ধ্যাটা কেন অস্বস্তিকর ঠেকছে। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সে এ দেশ সফরে এসেছে। এই মেজবান এবং অধিকাংশ অতিথি সে সম্পর্কে হয় অবগত নয়, কিংবা ইচ্ছে করেই তারা তা এড়িয়ে যেতে চায়। মেজবান ভদ্রলোক যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মুগ্ধ, তা স্পষ্ট।

একজন মার্কিনি হিসেবে তাকে আপ্যায়িত করে যে মুগ্ধতা তিনি প্রকাশ করেছেন তাতে হয়তো খারাপ কিছু নেই। কিন্তু সে তো একজন মার্কিনি হিসেবে এসব আতিথেয়তা উপভোগ করার জন্য হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এখানে আসে নাই। চিত্রকর্ম দেখে বেড়ানো কিংবা বিদঘুটে সব বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ অভিমত বয়ে বেড়ানো মানুষজনের সঙ্গে দেখা করা তার উদ্দেশ্য নয়। তাকে মুগ্ধ করাই এদের মনোবাঞ্ছা বলে তার মনে হয়।

'হয়তো পরে কখনো', জনসন হাসি হাসি মুখ করে বলে, 'আমি নিশ্চিত আবার এখানে আসতে পারব।'

'খুব আফসোস হচ্ছে', হতাশ কণ্ঠে বলে শিল্পী।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। মেজবান স্পষ্টতই তৃপ্তি বোধ করেন, যে জন্য উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে কথা বলতে শোনা যায়, মাঝে-মাঝে তাঁর কর্ণবিদারী হাস্যরোল নির্গত হয়। এরপর কেউ একজন হস্তরেখা পাঠ বিষয়ে তাঁর ছেলের উৎসাহের কথা উল্লেখ করলে মেজবান হস্তরেখা বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন, যদিও ছেলের উৎসাহে পিতার একপ্রকার বিরক্তি নিঃসন্দেহে দৃশ্যমান ছিল। কিন্তু জনসন যে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এতদূর উড়ে এসেছে তা নিয়ে এখন পর্যন্ত কেউ টুঁ শব্দ করে না। তারা কি বিষয়টি নিয়ে আগ্রহী নয়? নাকি তারা ভাবছে, কথাটা তার পক্ষে কুরুচিপূর্ণ মনে হতে পারে, সে জন্য ব্যাপারটি নিয়ে তাদের মতামতে ইতরবিশেষ না হলেও এ স্থলে তা উথাপনযোগ্য মনে করছে না?

চিত্রশিল্পী প্রায় অজান্তে পুনরায় তার দিকে অগ্রসর হয়। সে কি আবার তাকে তার স্টুডিওতে নেওয়ার চেষ্টা করবে? সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে জনসন মৌমাছির চাষ বিষয়ে কথা বলছিল। শিল্পী খালি গ্লাস হাতে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। এক মুহূর্ত বিরতি।

এরপর জনসনের কানে মাইকেলেঞ্জেলোর নাম প্রবেশ করে। সহসা সে মাথা ঘোরায় না। একটু ধাতস্থ হয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'দুঃখিত; ঠিক ধরতে পারলাম না।'

'বলছিলাম', শিল্পী পুনরায় বলে, 'মাইকেলেঞ্জেলোর যেসব মহান ফ্রেস্কো—এই যেমন ধরুন কনভারশন অব সেইন্ট পল আর দি ক্রুসিফিকশন অব সেইন্ট পিটার—এসবের পর তার হয়েছিলটা কী?'

জনসন আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। মনে মনে বিড়বিড় করে বলে, এই রে, আবার শুরু। সে ফ্যানের দিকে তাকিয়ে তার ঘূর্ণায়মান পাখাগুলির গতি অনুসরণ করতে থাকে। ভাবে, এরা সবাই মিলে কি তার মাথা বিগড়ে দেবে! তারপর সে এরোপ্লেনে ডোনাটিস্টদের সম্পর্কে তত্ত্ব প্রদানকারী সেই অধ্যাপকের অনুকরণে চোখ পাকিয়ে সজোরে মাথা ঝাঁকাতে থাকে।

'না, জানি না তো তার কী হয়েছিল। হয়তো হার্নিয়া হয়েছিল, বা অন্যকিছু। হয়তো আর খাটাখাটনি করতে পারছিলেন না। চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে বড় বড় ফ্রেস্কো করার সামর্থ্য হয়তো তাঁর আর ছিল না, বুঝেছেন।'

সে ভাবে তার ঠাট্টায় কেউ ফিক করে হেসে উঠবে। এ জন্য সে অধ্যাপকের দিকে তাকায়, অধ্যাপকের মুখে কেমন এক মিষ্টি হাসি ফুটে ওঠে। হাসির দমকে কেঁপে উঠে সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। নিজে হার্নিয়ার ভুক্তভোগী মেজবান কান খাড়া করে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি হার্নিয়া শব্দটা উচ্চারণ করলেন, মি. জনসন?'

'আমার নিজস্ব তত্ত্ব, আর কী।'

'এ বিষয়ে যে কোনো তত্ত্বকে আমি স্বাগত জানাই। আপনাকে বলতে বাধা নেই, আমি নিজেও এ রোগের শিকার।'

এই সুযোগে জনসন মেজবানের কাছে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়ায় যেন সে চিকিৎসাশাস্ত্রের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারের খবরাখবর দেবে। রোগীর চোখে সহসা সপ্রশংস আশার আলো জ্বলে ওঠে।

এরপর মিনিট পনের এলোমেলো অসংলগ্ন আলাপ চলতে থাকে। সে আলাপে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মিতভাষী কর্মকর্তাও যোগ দেন, এতক্ষণ তিনি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত অদম্য ভক্ত হিসেবে মেজবানের ঘনঘন সোচ্চার ঘোষণা শুনছিলেন। ফাঁপা পাইপে টান দেওয়ার গুড়গুড় শব্দ ব্যতীত নিথর নৈঃশব্দ্যে সে ঘোষণা বারংবার বেজে উঠছিল।

জনসন পূর্ববৎ অস্থিরভাবে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখে। মেয়েদের মধ্যে একজন একটি ট্রেতে করে কোমল পানীয় নিয়ে আসে, সে এক গ্লাস কমলালেবুর রস তুলে নেয়। পিঠে চুলের লম্বা বিনুণি দুলিয়ে মেয়েটি হাঁটছিল। সে হাসি ছুঁড়ে দিলে জনসনও হাসি বিনিময় করে। মেয়েটি হাতেবোনা বর্ণিল কাপড়ের কারুকাজে ঢাকা ডিভানে আসীন ছাত্রদের এক ক্ষুদ্র দলের দিকে এগিয়ে গেলে জনসনের চোখও তাকে অনুসরণ করে। ওদের দলে যোগ দিতে পেরে মেয়েটির পিঠ ও চিকন গ্রীবা যেন-বা আশ্বস্ত হয়। সে হাতের বাকি পানীয় তাদের দিকে বাড়িয়ে ধরে। তারুণ্যের চিন্তার মুক্তিতে বিশ্বাসী মেজবান জনসনের দৃষ্টির গতিবিধি লক্ষ করে সোৎসাহে প্রস্তাব রাখেন, 'ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বললে পারেন। ওরা খুব খুশি হবে। ওরা আমেরিকানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।'

সে তাদের দিকে হেঁটে গেলে ছেলেরা ভদ্রতা করে উঠে দাঁড়ায় এবং তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসে। প্রত্যুত্তরে সেও হাসে। তাকে জায়গা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি ছেলে নেবে মেঝেতে বসে পড়ে। জনসন সেখানে বসে।

'এটার নাম কী', জনসন একটি বাদ্যযন্ত্রের দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করে।

মেয়েদের একজন ক্ষীণ লাজুক কণ্ঠে তাকে যন্ত্রটির ক্রিয়াকর্ম বুঝিয়ে দেয়।

মেজবানের লম্বাটে গম্ভীর চেহারার মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের দেশে এই প্রথম?'

'হ্যাঁ, একেবারে প্রথম।'

'কেমন লাগছে এ দেশ?'

নাবিকদের মতো কাটা চুল, পুরু চশমাপরা এক তরুণ আচম্বিতে বলে বসে, 'বাজে প্রশ্ন। খারাপ লাগলে তিনি বলবেন নাকি?'

জনসন মেয়েটিকে প্রশ্ন করে, 'তোমার দেশকে তুমি নিজে কীভাবে দেখো, বলো তো।'

'আমাদের জন্মই তো এখানে।'

'সেটাই তো সব নয়। এখানে জন্মে তুমি কি সন্তুষ্ট?'

খানিক বিরতির পর মেয়েটি জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, সন্তুষ্ট।'

'ফালতু', তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ছেলেটি বলে ওঠে।

মেয়েটি চকিতে তার দিকে ফেরে। 'ফালতু মানে কী, চুপ করো।' তারপর আবার মার্কিন ভদ্রলোকটির দিকে ফিরে মিনতির ভঙ্গিতে সে বলে, 'ওর কথায় কান দেবেন না। ও মানসিক পীড়ায় ভুগছে। হ্যাঁ, আমরা আমাদের দেশকে অবশ্যই ভালোবাসি। এত গরিব আর নিঃসহায় দেশ। এ জন্যই আমরা একে ভালোবাসি। জানেন তো, অসুস্থ সন্তানই মায়ের সবচেয়ে বেশি স্নেহ পায়। হয়তো নিজ দেশ থেকে বহু কিছু পান বলে আপনি আপনার দেশকে ভালোবাসেন। আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি এ দেশ আমাদের কিছুই দিতে পারে না বলে।'

'ছ্যাবলামির চূড়ান্ত', ছিদ্রান্বেষী ছেলেটি বলে।

মেয়েটি সচেতনভাবে ছেলেটিকে পাত্তা না দিয়ে বলে চলে, 'হ্যাঁ, এ ভালোবাসা হাস্যকর, স্বীকার করছি। খুব সচেতন ও কষ্টকর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এ ভালোবাসা পাওয়া যায় বলেই এটি এত হাস্যকর। এ দেশকে ভালোবাসতে ও এ দেশের জন্য গর্ববোধ করতে আমাদের কষ্ট করতে হয়।'

জনসন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার শরীরে সামান্য ঝাঁকুনি লক্ষ করা যায়। কিন্তু কিছু না বলে সে তড়িঘড়ি কোটের পকেটে ডান হাত ঢুকিয়ে কয়েকটি লাল রঙের ট্যাবলেটভরা ছোট শিশি বের করে আনে। অর্ধেক খালি হয়ে আসা কমলালেবুর রসের গ্লাসে একটি ট্যাবলেট ছেড়ে দিয়ে সে বিড়বিড় করে বলে, 'প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।'

ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, 'আপনার কি শরীর খারাপ?'

মার্কিন ভদ্রলোক জবাব দেওয়ার আগেই ছেলেটি বলে, 'বোকার হদ্দ। এসব ট্যাবলেট তুমিও চেনো। আমাদের পানি ব্যাকটেরিয়া, আরো কী সব হাবিজাবি জীবাণুতে ভর্তি। এই ট্যাবলেট সেসব জীবাণু মেরে ফেলে।'

আকস্মিক বিব্রতকর পরিস্থিতি চাপা দিতে মার্কিন ভদ্রলোক অট্টহাস্য করে ওঠে। মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বলে, 'তাই বলে তোমার দেশের মিষ্টি পানির প্রতি একে কোনো অশ্রদ্ধা বলে মনে কোরো না। আসলে কী, নিজের দেশে আমরা ক্ষতিকর অণুজীবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম-সবল একটি পাকস্থলী তৈরি করার অবকাশ পাইনি।'

'আমরা কিছু মনে করিনি', মেয়েটি বলে। নিজের দেশ নিয়ে বীরদর্পী ভাষণ দেওয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় মর্মাহত মেয়েটি দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'কিছু মনে করব কেন? এখানে অসুস্থ হয়ে এ দেশ সম্পর্কে আপনি বাজে ধারণা নিয়ে ফিরে যান, আমরা তা চাই না।'

'এই তো যুক্তিবাদী কথা।' ঈষৎ ভারমুক্ত হয়ে জনসন বলে ওঠে।

এতক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে থাকা অন্য ছাত্রটি মন্তব্য করে, 'বহু বছর আগে হেরোডোটাস জানিয়েছেন, পারস্যের রাজা ভ্রমণের সময় পরিষ্কার ফোটানো পানি পান করতেন। এই সেদিনও ভদ্রস্থ চীনারা না-ফোটানো পানি স্পর্শ করত না।'

কিছুক্ষণ পর জনসন মেজবানকে বলে, 'ছেলেমেয়েগুলি বেশ উজ্জ্বল।'

ইতিহাসের শিক্ষকের মুখে এখনো সে হাসিটি লেপ্টে আছে। তবে হয়তো এতক্ষণ অবধি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রাখার ফলে পেশিতে সৃষ্ট হাসিটি খানিক বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, তিনি বলেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েরা এ বয়সে উজ্জ্বলই থাকে। কিন্তু ১০ বছর পর এদের দিকে তাকালে আপনি চিনতেই পারবেন না।'

'কেন, কী হয় ওদের?' তার চোখ অধ্যাপকের মুখের ওপর কয়েক মুহূর্ত স্থির রেখে জনসন প্রশ্ন করে।

'মিইয়ে যায়', হাসিটি মুখে জিইয়ে রেখে অধ্যাপক উত্তর দেয়।

ছেলেমেয়েরা কিছু নাচ-গান করে। সে পরে জেনেছে, দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হয়েছিল। এরপর নৈশভোজ পরিবেশিত হয়। কোলের ওপর থালা রেখে সপ্রতিভভাবে স্বাদু অথচ গরম খাবার খেতে খেতে জনসন অনুভব করে গামলায় এটা-সেটা নিয়ে মেজবানের মেয়েটি ঘন ঘন তার কাছে আসছে। সে চকিতে মেয়েটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, মনে হয় মেয়েটি তাকে কিছু বলতে চায়। সে মেয়েটির দিকে চেয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে বলে, 'চমৎকার রান্না। তুমি খাচ্ছ না যে?'

'খাব', অস্ফুট স্বরে জবাব দিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে খানিকটা অসুস্থ মনে হয়।

জনসন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'অনুষ্ঠানটা ভালো লাগল।'

তার মন্তব্যে কান না দিয়ে মেয়েটি বলে, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি কি প্রফেসর আহসানের সঙ্গে দেখা করবেন?'

'তিনি কে?'

'বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ান। মার্কিনিরা তাকে পছন্দ করে না।'

জনসন হাসে। 'তাহলে আমি আর দেখা করব কেন?'

'তার অনেক কিছু বলার আছে, সে জন্য। আমরা তাকে পছন্দ করি।' তারপর ঈষৎ দ্বিধান্বিতভাবে সে বলে, 'তিনি ইতিমধ্যে তিনবার জেল খেটেছেন।'

'ভয়ঙ্কর লোক মনে হচ্ছে।'

'না, তিনি ভয়ঙ্কর নন। তাছাড়া তিনি সৎ মানুষ। এ কারণে তারা তাকে পছন্দ করে না।'

জনসন চকিতে মেয়েটির দিকে তাকায়। সে ভাবে, সৎ কিন্তু তিনবার জেল-খাটা এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তার সাক্ষাতের জন্য মেয়েটা এত উদ্গ্রীব কেন? এর কারণ কি এই যে মেয়েটা তাকে এমন কিছু বলতে চায় বয়সের স্বল্পতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে যা বলার উপায় তার জানা নেই?

'ঠিক আছে, তিনি যদি ওয়াদা করেন যে ডোনাটিস্টদের ব্যাপারে কিছু বলবেন না, তাহলে তার সঙ্গে দেখা করব।'

জনসন যাওয়ার সময় এবারও রহিম সঙ্গ নিল। রাত এখন গভীর নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে। পরিষ্কার আকাশে অজস্র নক্ষত্র জ্বলজ্বল করে। জনসন হাঁটতে হাঁটতে সদ্যপরিচিত লোকগুলির কথা ভাবে। তার মনে পড়ে তাদের সঙ্গে উদ্দেশ্যহীন আলাপচারিতার ফাঁকে একবারও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা ওঠেনি।

মেজবানের গগনবিদারী অট্টহাস্য তার মনে পড়ে। তার গমগম করা উৎফুল্ল কণ্ঠস্বরে মার্কিন ভদ্রলোককে খুশি করবার উদগ্র বাসনা, সদা মৃদু হাসিমাখা অধ্যাপক একবারও কোথাও কথা বলার সুযোগ পাননি, মাইকেলেঞ্জেলোকে নিয়ে চিত্রশিল্পীর কৌতূহল, কেতাদুরস্ত অপর মার্কিনি যার মুখে সেই স্বল্পবুদ্ধির মিশনারির মতো আত্মতৃপ্তি যে এক আদিম মানবের মুখে খ্রিষ্টনাম ফুটিয়েছে। মনে পড়ে বাক্যবিমুখ ব্রিটিশটির কথা, যে মনে করে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার একটি কথা কাউকে বলারই কোনো অপেক্ষা রাখে না, আর কথাটি হলো এই যে, যে যাই বলুক তার দেশকে কেউ টেক্কা দিতে পারবে না। জনসন সেই অস্থির মেয়েটির কথা ভাবে, যে মনে করে কেউ একজন তাকে এমন একটি কথা বুঝিয়ে বলবে যা সে নিজে বোঝাতে পারছে না। পুরো সন্ধ্যাটি তার কাছে কাহিনীসূত্রবিহীন এক পুতুলনাচ বলে মনে হয়।

সে ভাবে, হ্যাঁ, সেটি এমন এক পুতুলনাচ যা আয়োজন করা হয়েছে কেবল একটি মানুষকে খুশি করার জন্য। আর সেই মানুষ সে নিজে। কারণ সে একজন মার্কিনি।

সে নিজেকে প্রশ্ন করে, একটা দেশকে আসলে কীভাবে চেনা যায়? কোথায় দেশের শুরু?

দ্বিতীয় অধ্যায়

জানালায় লাগানো তারের জালের কারণে বনবন শব্দ করা রক্তপিপাসু মশা ভেতরে ঢুকতে পারে না, কিন্তু একই কারণে রাতের শীতল বাতাস প্রবেশ করতে না পারায় ঘরময় অসহ্য গরম আর গুমট ভাব সৃষ্টি করে।

শোবার আগে জনসন সিলিংফ্যান পুরোমাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু খানিক পরেই গতি কমাতে তাকে আবার উঠতে হয়। ফ্যান এমন কলজে কাঁপিয়ে ঘুরছে যে মনে হয় আংটা ছিঁড়ে মাথায় এসে পড়বে। রেগুলেটর নিয়ে কিছুক্ষণ কসরতের পর সে আবিষ্কার করে, চাকতিতে চার-রকমের গতি নির্দেশিত করা হলেও বাস্তবে গতি দুরকম : প্রথমটার ভীষণ জোর, অপরটা এত ধীর যে বাতাসই লাগে না। ধীরে দিলে ফ্যানের পাখা ঢিমে তালে ঘোরে, প্রতিবার পাক দিয়ে একটু থামে, তাতে ঘরের ভারী গরম বাতাসে কোনো তরঙ্গ জাগে না।

ধীরগতিতে ফ্যান চালানোই জনসন নিরাপদ মনে করে। খটর-খটর শব্দের পাগলপারা উৎপাত ও ঝড়ের তাণ্ডব শান্ত হতে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর একটু বাতাসের তৃষ্ণায় তার সংকীর্ণ সিঙ্গেল বেড টেনে ঘরের কেন্দ্রে ফ্যানের ঠিক নিচে এনে রাখে। ঘর্মাক্ত দেহের সর্বশেষ বস্ত্রটিও সে খুলে ফেলে, মুখে ও ঘাড়ে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দেয়, তারপর জ্বলন্ত সিগারেট হাতে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে।

শীঘ্র চেতনালুপ্তির স্তরে চলে গেলেও সে যেন তার কপাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে থাকা ঘামের শব্দ শুনতে পায়। ঘামের সে-সব ফোঁটা জমে বস্তুত সহস্র ঝরনাধারায় পরিণত হয়। কিন্তু সে স্থির থাকে। শরীর যেখানে শরীরের সঙ্গে লেগে আছে উত্তাপ সেখানে প্রবল, অথচ সে তাদের আলাদা করতে পারে না। সবকিছুই নিথর হয়ে গেছে। এর মধ্যে সে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়।

তারপর সহসা ধড়ফড় করে উঠে বসে বন্যপশুর মতো আর্তনাদ করে। খানিকক্ষণ হাঁসফাঁস করে।

দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার এক বিদঘুটে অনুভূতি তাকে বিশ্রীভাবে জাগিয়ে দিয়েছে। সে গনগনে এক লোহার খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে আছে বলে তার বোধ হতে থাকে।

তারপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে সে ওপরে ফ্যানের দিকে তাকায়। ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে এলে সে বোঝে উত্তপ্ত গুমট ঘরটিতে ফ্যান ঘোরা থেমে গেছে।

আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে সে বিস্ফারিত চোখে ঘন তমসার দিকে চেয়ে থাকে।

এখানে সে কী করতে এসেছে?

২

জনসনকে তার বস, ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা অপিনিয়ন-এর সম্পাদক, তথ্য উদ্‌ঘাটনের এক মিশনে এখানে পাঠিয়েছেন। তার বস এশিয়া ও আফ্রিকার সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করেন, মাঝে-মাঝে এসব এলাকায় তার সরকারের কর্মকাণ্ড ও নীতির তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করেন। এ দেশের আকস্মিক ঘটনাচক্রে তিনি ভীষণ বিচলিত। আসল ঘটনাটা কী তা জানতে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছেন। এখানে বাস্তবিক কী ঘটেছে, সে সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত সমর্থনের জন্য তাঁর তথ্যপ্রমাণ প্রয়োজন।

লালচুলো মধ্যবয়স্ক সম্পাদক অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী ও দৃঢ়প্রত্যয়ী। বিশ্বের দরবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ, এ কথা মেনে নিতে তিনি কসুর করেন না। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসের সবচাইতে গুরুতর এক পর্যায়ে এ নেতৃত্ব বহনের যোগ্যতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে কি না, এ ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ আছে। যুদ্ধের পর যখন পশ্চিমে পুরাতন পরাশক্তিগুলি শ্রান্তিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে, তাদের জখম সারাবার শক্তিও নিঃশেষিত, সমাজতন্ত্রের বিপদ থেকে নিঃসহায় পৃথিবীকে রক্ষা করার কেউ আর নেই, তখন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর এ নেতৃত্ব আপনা-আপনি বর্তেছে। অথচ এ জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের না আছে পূর্বেতিহাস, না অভিজ্ঞতা। মুক্ত বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র পরাশক্তি, তাতে আর সন্দেহ কী। কিন্তু অঢেল ইস্পাত ও মোটরগাড়ি তৈরি করা বা গম ফলানো আর নেতৃত্ব দেওয়া তো এক কথা নয়। বস বলেন, 'ব্রেইন ও উইলসন সত্ত্বেও কিংবা ফিলিপিনস ও ক্যারিবিয়ানে আমাদের আনন্দভ্রমণ সত্ত্বেও আমরা সব সময় পুরোদস্তুর সঙ্গবিচ্ছিন্ন থেকেছি। মাঝে মাঝে পকেটভর্তি ডলার নিয়ে অবকাশ যাপনে বিদেশে যাই, কিন্তু গিয়ে ফিরে এলেই যেন স্বস্তি। কাউকে আমাদের বলে দিতে হয়নি সে কীভাবে তার কার্যক্রম চালাবে বা নিজেকে রক্ষা করবে। কে যে কোন সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে, কার মনের পেছনে কী চিন্তা খেলা করছে, অবশ্যই সেসব বিষয়ে আমরা ভাবিনি।'

গত কয়েক বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে শুরু করেছে, সম্পাদক তা মানেন। তিনি এও মানেন, শত্রুর মোকাবিলা করার মতো শৌর্য তাঁর দেশের রয়েছে। কিন্তু শত্রু যে যুদ্ধ-সংঘাতের পথে না গিয়েও অগ্রসর হতে পারে এবং অস্ত্র তুলে নিলে মুক্ত বিশ্ব নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সভ্যতার এক প্রকার মৃত্যু ডেকে আনতে পারে, এ কথা জানার পরও কি আশ্বস্ত হয়ে বসে থাকা যায়? বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে আরো বেশি ধারণা, শত্রু যে এলাকায় ঢুকে পড়তে চায় সে এলাকা সম্পর্কে আরো বেশি জ্ঞান লাভ করতে পারলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, শত্রুকে তার নিজের খেলাতেই পরাস্ত করতে হবে। মার্কিনিদের আরো অনেক কিছু শিখে নিতে হবে, শিখতে হবে দ্রুত।

কোনো তথ্য বারবার যাচাই করে নেওয়ার বাতিক অপিনিয়ন-এর মতো একটি পত্রিকার সম্পাদককে পেয়ে বসবে সেটাই স্বাভাবিক, ঘটনা যত ছোট বা বড়ই হোক সেটিকে তিনি নিরন্তর পুনর্বিচার করেন, তার সদাউৎকর্ণ ভাব মিলিয়ে যায় না। এখনো বহু বেয়াড়া প্রশ্নের মনঃপূত জবাব তার পাওয়া হয়ে ওঠেনি। কী প্রকারে পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার ঘটানো চলে এবং সে সহায়তা কতটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা উচিত? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুসুলভ আচরণকে যারা এখনো সন্দেহের চোখে দেখে, তাদের কী করে কায়দা করা যাবে? তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলিয়েও কী করে সমাজতন্ত্রের গ্রাস থেকে রেহাই পেতে তাদের সহায়তা করা সম্ভব? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বর্তমানে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নেই নানা কৌশলে এমন বহু দেশকে ভবিষ্যতে দলে ভেড়ানো সম্ভব। এ জাতীয় কোনো দেশের সঙ্গে যখন তাদের প্রতিবেশী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেশের বিবাদ বাধলে কোনো পক্ষ না নিয়ে মিত্রদেশটিকে সন্তুষ্ট রাখার উপায় কী? যেসব দেশে আপাতত গণতন্ত্র চলছে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা বন্ধ হলে মুহূর্তে তা উবে যাবে, সেখানে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা যায় কীভাবে? এসব দেশে মার্কিনিদের আচরণ কেমন হবে? শান্‌-শওকত, ঠাট-বাট দেখালে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মনে ঈর্ষা জাগবে, এ কারণে কি তা পরিহার করা ভালো নাকি এই শান-শওকত দেখিয়েই তাদের মনে সমীহ জাগিয়ে রাখলে বেশি কাজ দেবে?

এশিয়া ও আফ্রিকার এসব দেশে কোন পক্ষকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদ দেওয়া উচিত, এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে জনসনের বস বর্তমানে ব্যতিব্যস্ত।

লৌহমানবদেরকে মদদ দেওয়া? কিন্তু দেখা যায়, এ জাতীয় মানুষজন প্রায়শই এক নম্বর বদমাশ, কুচক্রী ও স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। তারা যে শুধু জনগণের মনে ঘৃণার জন্ম দেয় তা-ই নয়, শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেই একটা বিরূপ মনোভাবের জন্ম দেয়।

তাহলে কি একটু-আধটু সমাজবাদী ভাবাদর্শের উদারপন্থী সমর্থন দেওয়া উচিত? কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সমাজতন্ত্রকে প্রতিরোধ করার মতো জোর তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

অভ্যন্তরীণ দলাদলি, ঝগড়া ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত লোভ-লালসার কারণে উপযুক্ত লোকটিকে খুঁজে বের করা প্রায়শ কঠিন হয়ে ওঠে। তখন দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদের মধ্যে থেকে এমন একজনকে মদদ দেওয়ার জন্য বেছে নিতে বাধ্য হয় যার অন্তত নিজ দেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশলটুকু রপ্ত আছে। কীভাবে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা হচ্ছে সে ব্যাপারে তখন চোখ-কান বন্ধ রাখতে হয়।

না, ভীষণ ভুল পথে যাওয়া হচ্ছে। বস বলেন, 'এসব মনোভাবের মধ্যে একটি জিনিস নেই, সেটা হলো মৌলিক নীতি।'

পুরনো ধাঁচের, হেলে-পড়া এক বিশাল ঘূর্ণিচেয়ারে বসে থাকা সম্পাদকের কণ্ঠস্বর জনসনের কানে বাজে। 'কেবল উপযোগিতাই আমাদের নীতির ভিত্তি হওয়া উচিত নয়, নীতিকে মানবিকও হতে হবে। বাস্তবতাকে আমরা অস্বীকার করব না বটে, কিন্তু বিশ্বের এসব উদ্ভট অংশে আমাদের কর্মকাণ্ড চলবে এক গভীর ন্যায়বিচারবোধের তাড়নায়। যখনই কোথাও কিছু বিগড়ে যায়, বুঝতে হবে আমরা বিবেকের নির্দেশিত পথ থেকে চ্যুত হয়েছি বলেই এমন হয়েছে।'

আরেকটি বিষয়ে সম্পাদকের অভিমত বেশ জোরালো। তিনি মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের যে বিষয়টি নির্দ্বিধায় মাথায় রাখা উচিত, তা হলো এশিয়া ও আফ্রিকার

জনগণের জাতীয়তাবোধ। 'জাতীয়তাবাদ কথাটির তারা যা-ই অর্থ বুঝুক না কেন, আমরা আর এ কথা অস্বীকার করতে পারব না যে, এসব দেশে জাতীয়তাবাদও তাদের নৈমিত্তিক সর্বনাশা মহামারীর মতো ছড়িয়ে গেছে।' তিনি বলেন, 'আমাদের এ কথাটা সাদা মনে মেনে নিতে হবে এবং জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত এই লোকগুলিকে সহযোগিতা করতে হবে। তাই আমাদের উচিত হবে জাতীয়তাবাদী পক্ষগুলির পেছনে সমর্থন জুগিয়ে যাওয়া, এ নীতি কোনো আশু ফল দিক বা না দিক। আমাদের প্রশাসনকে এ কথা বুঝতে হবে, আমাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এশিয়ানদের বোঝাতে হবে আমরা মানুষের মর্যাদা, মুক্তি ও ন্যায়বিচারের পক্ষের শক্তি।'

কিনারা ক্ষয়ে যাওয়া ঘূর্ণিচেয়ারে তার দিকে পাক খেয়ে জনসনের বস তাকে তাঁর সিদ্ধান্তটি জানান, 'তুমি বরং বেরিয়ে পড়ো, গিয়ে দেখে এসো ওখানে আসলে কী ঘটেছে।'

৩

যে দেশটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ও সরঞ্জাম ছিল যার শক্তির প্রধান উৎস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থ প্রদান বন্ধ করলে যার অর্থনীতি মলিন মুদ্রার মতো দুমড়ে যেত, সহসা সে দেশটি নিরপেক্ষ হয়ে যেতে শুরু করেছে এবং, ওয়াশিংটনে নৈরাশ্যবাদীদের কারো কারো আশঙ্কা, দেশটি সম্ভবত 'লাল' হয়ে গেছে। নানাভির নেতৃত্বাধীন সরকারি দল কোনো সংকট ও টানাপড়েন ছাড়াই গত এক দশকের বেশি সময় ধরে এ দেশের ক্ষমতায় থেকেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে এরাই ছিল মূল ভূমিকায়। কিন্তু সাম্প্রতিক নির্বাচনে কোনো পূর্বাভাস না দিয়ে আচম্বিতে পিপলস পার্টি নামে এক ক্ষুদ্র বিরোধী দলের কাছে তাদের ভরাডুবি হয়েছে। পিপলস পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আরো তিনটি ক্ষুদ্র দল, এরা 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' নামে একটি মোর্চা তৈরি করে। এদের সবার অভিন্ন দাবি, দেশকে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করতে হবে।

নিউইয়র্কে জনসনের বস তাকে বলেন, 'পুরো ব্যাপারটার মধ্যে রহস্যময় কিছু একটা আছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, পররাষ্ট্র দপ্তর অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। তারা কোনো সতর্কবাণী পায়নি। তারা শুধু একটু জানত যে অসন্তুষ্ট ভবঘুরে ও নিষ্কর্মাদের কিছু ক্ষুদ্র দল, যারা তাদের ভাষায় নিরপেক্ষতার নীতি প্রচার করছিল, এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, কিন্তু এদের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। শেষে এরা সর্বশক্তিমান অজেয় সরকারি দলকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এটি স্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। যে দেশটি আগে থেকে নিরপেক্ষ, তখন তা মেনে নেওয়া ছাড়া তোমার অন্য বিকল্প নেই; কিন্তু তোমার ঘনিষ্ঠ কোনো মিত্র যখন রাতারাতি সর্বনাশ ঘটিয়ে গিয়ে নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায় তখন দুশ্চিন্তার ব্যাপার ঘটে বটে। যাও, গিয়ে দেখো ওখানে ভুলটা কোথায় ঘটেছে, কেন আমাদের এক বিশ্বস্ত মিত্র মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমি অবশ্যই মনে করি না, ওরা লাল হয়ে যাচ্ছে, তবে এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে ওরা আমাদের দিকে ভিড়ছে না।' তারপর এ যুবকের দিকে তার শেষ নির্দেশ ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'আবেল, ওখানে আমাদের লোকজন তালগোল পাকিয়ে বসে আছে কি না গিয়ে খোঁজ নাও। যদি তা-ই হয়, কসম কেটে বলছি, এবার আমি হৈচৈ বাধিয়ে দেব।'

জনসন পরদিন প্লেন ধরে। এখানে এসে সবার আগে নানাভির ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার মাধ্যমে সে তার অনুসন্ধান শুরু করে। তার মনে হয়, যে মানুষটিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে বোঝার মধ্য দিয়ে এ অপ্রত্যাশিত ভরাডুবির তদন্ত হওয়া উচিত।

গত দু দিনে দুজনের সঙ্গে তার কথা হয়েছে, কিন্তু তথ্য বের করা গেছে সামান্যই। পতিত নায়কের বিরুদ্ধে তাদের কথা ফুরোয় না, প্রত্যেকে তার স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতির নানা ঘটনা শোনাতে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু নানাভি একজন জঘন্য প্রকৃতির মানুষ হলেও জনগণ কেন নিরপেক্ষতার নীতি বেছে নিল, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর সে পায় না।

নানাভির সৌম্য চেহারা, রিমলেস চশমা, মুখে চার্চিলের মতো ঝুলে থাকা পুরু সিগার। চতুর ও ঝানু রাজনীতিক হিসেবে তার খ্যাতি বহু পুরাতন। এখন প্রকাশ পাচ্ছে, তিনি না চতুর না ঝানু রাজনীতিবিদ। তার সম্পর্কে এ প্রবাদ জন্ম নেয় সম্ভবত ব্রিটিশ আমলে তার মন্ত্রিত্ব লাভের কারণে। ব্রিটিশ শাসকেরা এ দেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রায় দু দশক আগে স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মন্ত্রী বানিয়েছিল তাকে। মন্ত্রী হিসেবে তার অভিজ্ঞতা অবশ্য পূর্ব থেকে তৈরি করে দেওয়া কিছু কাগজপত্রে স্বাক্ষর করার বেশি কিছু দাঁড়ায়নি, কোথাও কোনো কর্তৃত্ব ফলানোর সুযোগ তার ছিল না। কোথাও কল্পনাশক্তি খাটাতে হয়নি, কোনো দায়দায়িত্ব বহন করতে হয়নি। ব্রিটিশ শাসনামলের গোধূলি লগ্নে এ দেশ শাসনে কোনো পরিকল্পনার প্রয়োজন শাসকদের হয়ে থাকলেও তাতে তার সাহায্য চাওয়া হয়নি। সন্ধ্যাগুলি তিনি ব্রিটিশ ক্লাবে কাটাতেন। নেটিভদের মধ্যে খুব কম লোকেরই সে ক্লাবে প্রবেশাধিকার ছিল। সেখানে তিনি নিয়মিত দু গ্লাস সোডামিশ্রিত হুইস্কি খেতেন, বুদ্ধিদীপ্ত আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতেন, কথায় কথায় শেক্সপিয়ার, মিল্টন ও কিটস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আত্মপ্রসাদ পেতেন। পাখি শিকার তার খুব পছন্দ ছিল (কিন্তু বড় পশু শিকারে ছিল ভয়), পাখি আসার মৌসুমে আগেই সব ঠিকঠাক করে রাখা পাখি-শিকার অভিযানে প্রায় প্রতি সপ্তাহে তিনি বেরিয়ে পড়তেন। তিনি কয়েকটি রেসের ঘোড়া কিনে রেখেছিলেন (একবার একটি সুদর্শন ঘোড়া দৌড়ে সব ঘোড়ার পেছনে পড়ে থাকায় তার সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয় এবং তিনি নাটকীয়ভাবে সেই ঘোড়াটিকে হত্যা করেন, জকিকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চিরকালের জন্য চলে যেতে হয়), লন্ডনের সেভিল রো থেকে জামাকাপড় বানিয়ে আনতেন, ছেলেমেয়েদের পাঠিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলিতে, সে দেশে তিনি চমৎকার পাথর এবং কাঠের তৈরি ষোড়শ শতাব্দীর পুরাতন একটি বাড়ির মালিক, ওই বাড়িতে মাঝে মাঝে অবকাশ কাটিয়ে আসতে তাঁর খুব ভালো লাগত।

দেশ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁকে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু এমন পরিশীলন, ইংরেজি সাহিত্যের ওপর এত অগাধ পাণ্ডিত্য এবং তাঁর সন্দেহাতীত ব্যক্তিগত সততা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা অনুধাবনে তিনি ব্যর্থ হলেন, তা হলো, এ দেশ এখন স্বাধীন, এ দেশের নিয়তি এখন থেকে তার ও তার সহকর্মীদের হাতে ন্যস্ত, হাজার হাজার মাইল দূরস্থিত কোনো স্থান থেকে আর নির্দেশনা ছুটে আসবে না। দেশের ভবিষ্যৎ বিষয়ে অতীতকালে তাঁর যতটুকু আগ্রহ বিদ্যমান ছিল, তার চাইতে বেশি আগ্রহ এবারও তাঁর মধ্যে জন্ম নেয়নি। নেতা নিজ দেশ সম্পর্কে অনাসক্ত থাকলে, তার চারপাশে এমন সব লোকজন ভিড় করে, যাদের একমাত্র আসক্তি ব্যক্তিস্বার্থে। নানাভি শীঘ্র এসব স্বার্থান্বেষী পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। আগের মতোই

ক্লাবের পেছনে সান্ধ্যকাল ব্যয় অব্যাহত থাকে, কিন্তু এখন যেন আগের আনন্দ আর নেই। 'সেই পরিবেশটাই তো হারিয়ে গেছে', স্মৃতিকাতর হয়ে তিনি বলেন।

নিঃসন্দেহে ভুল লোককে এ দেশ শাসনের ভার দেওয়া হয়েছিল, জনসন নিজেকে বলে। নানাভি জাতীয়তাবাদী নন, কয়েক শতাব্দী পর যে দেশের মানুষ স্বাধীন হয়েছে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। তাঁকে তাঁর সেই ষোড়শ শতাব্দীর ইংলিশ গৃহটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেওয়াই বিদায়ী ব্রিটিশদের পক্ষে যথার্থ হতো।

কিন্তু আমার অবাক লাগছে, জনসন ভাবে, এমনকি আমাদের লোকজনও তাঁকে সত্যিকার উপযুক্ত মানুষ বিবেচনা করেছে। আর এ স্থলে আমাদের সেই পুরনো তত্ত্বে ফিরে যেতে হচ্ছে, আমার বস যা ঘুরে-ফিরে উচ্চারণ করতেন : পরের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যেসব লোকজনকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে তাদের জেল্লা যতই চোখ ধাঁধাক না কেন, এশিয়ার কোনো স্বাধীন দেশের পক্ষে এসব অতীত-নিদর্শন বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। একটি নতুন দেশ, যার সামনে অনেক সংস্কারের কাজ পড়ে আছে, যাকে বহুকিছু তৈরি করে নিতে হবে, সে দেশে এসব লোক কোনো উপকারে আসে না। অপিনিয়ন পত্রিকাটি আগাগোড়া যে কথা প্রচার করে আসছে এখন নানাভি ও নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে তা ফলে যাওয়ার চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল।

তবু সবকিছু নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাকে অন্তত একবার এই বুড়ো লোকটার সঙ্গে দেখা করতে হবে, জনসন নিজেকে বলে। এখন সবাই তার ওপর দোষ চাপাচ্ছে, কিন্তু হয়তো তার বিরুদ্ধে যা কিছু বলা হচ্ছে, তার সবই সত্য নয়। তবু ধাঁধা থেকে যায়। এ রহস্যের কিনারা করতে হলে তার মুখোমুখি হতে হবে, হয়তো তখন পাওয়া যাবে এক ঘনিষ্ঠ মিত্রের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পেছনে নিহিত ধাঁধার উত্তরের প্রথম চাবিকাঠি।

রাত্রির শীতলতার খানিকটা হয়তো জনসনের কক্ষে প্রবেশ করে থাকবে, এখন সে আর ঘামে না। বিছানার ঠাণ্ডা অংশের দিকে সে সরে যায় এবং সহসা ঘুমিয়ে পড়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিপাটি ছিমছাম ক্লাবের প্রশস্ত বারান্দায় একাকী বসে থেকে জনসন ভাবে—এই সেই প্রাচ্য, যাকে ছেড়ে যেতে কারো প্রাণ কাঁদে, আর কেউ পালিয়ে বাঁচে। বসে বসে সে স্যামুয়েল কনডনের স্নানঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করে। বিকেল গড়িয়ে গেছে, ক্লাবে লোকজন খুব একটা নেই। শহরের সামাজিক জীবনযাত্রা এখনো শুরু হয়নি। তবে লনের বাইরে বেয়ারাদের টেবিল ও বেতের চেয়ার পাততে দেখে জনসনের মনে হয়, নিত্যকার নাটকের মঞ্চসজ্জা চলছে। নিকটে গাছের শাখায় ঝুলে থাকে বিশাল রঙিন কাচের বেলুন, সূর্য ডুবলে সেগুলিতে আলো জ্বলে উঠবে। বেশ খানিক দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ গাঢ় সবুজ লন, তার শেষ মাথায় পাশাপাশি ইটরঙা বেশ কয়েকটি টেনিস কোর্ট চোখে পড়ে। দুটি কোর্টে খেলা চলছে। মাঝে মাঝে সাদা পোশাক পরিহিত খেলোয়াড়দের সাড়াশব্দ শোনা যায়। এ ছাড়া চারদিক শুনশান, বাতাসও স্থির।

'মি. জনসন?'

ঈষৎ বিস্মিতভাবে জনসন ঘুরে তাকায়। রঙচঙা দেশী পোশাক পরিহিত বছর পঁয়ত্রিশের এক ভদ্রমহিলা তার পাশে দাঁড়িয়ে, মুখে স্মিত হাসি।

উঠে দাঁড়িয়ে জনসন বলে, 'হ্যাঁ, আমি জনসন।'

'আমি মিসেস ক্রিম। স্যাম না আসা পর্যন্ত আপনাকে সঙ্গ দিতে পারি? কাউকে একা বসে থাকতে দেখতে আমার ভালো লাগে না। বারের ভেতর দিয়ে পাগলের মতো বাথরুমের দিকে ছুটে যাচ্ছিল স্যাম। ওখানে ওর সঙ্গে দেখা। কাউকে বসিয়ে রাখা ওর পছন্দ নয়।'

'শুধু আমার জন্য ওর এমন তাড়াহুড়ো করার দরকার ছিল না। অপেক্ষা করতে আমার খারাপ লাগে না।'

'না, না, ও আমাকে সঙ্গ দিতে পাঠায়নি। কথা বলারই সময় ছিল না ওর। শুধু বলল, আপনি অপেক্ষা করছেন বলে তার এমন তাড়া। তখন ভাবলাম, দেখা করি।'

'আপনার সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ।'

'আসলে আমিও আমার এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি', চেয়ারে বসে পড়ে বলেন মিসেস ক্রিম। 'শো-রুমে তাকে পেলাম না। এখনো আসেনি মনে হয়।'

'কোনো পানীয় নেবেন? দুঃখিত, আপনার নামটি বুঝতে পারিনি।'

'মিসেস ক্রিম। যেরকম গ্রিম, সামনে শুধু 'কে' বসিয়ে নিন', প্রশস্ত ঢলে পড়া হাসি মেখে বলে ভদ্রমহিলা। জনসন লক্ষ করে ভদ্রমহিলা উৎকট রঙের লিপস্টিক গাঢ় করে ঠোঁটে মেখেছে, চোখে ভারি শেড। বসে থেকে মহিলা বলে, 'আসলে নামটা ছিল করিম, কিন্তু স্বরবর্ণ আমার একদম পছন্দ নয়। আপনি আমাকে ডল ডাকতে পারেন। এটাই আমার অন্য নাম, মানে ডাকনাম।'

'আমার ডাকনাম আবেল', মিনমিন করে বলে জনসন। এরপর কী বলা যায়, ভাবে সে। ভদ্রমহিলা নিজে থেকেই জানায় জনসনের ব্যাপারে সে অবগত। সে বলে, 'দেশটা খুব ছোট, জানেন তো। আমি এও জানি, এ দেশে কী ঘটেছে আপনি তা জানতে এসেছেন। এখানে খুব বাজে পরিস্থিতি, তাই না?'

'হতে পারে, আমি ঠিক জানি না।'

'আপনি আলবৎ জানেন। নইলে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসতেন না—এখানে তো জঘন্য আবহাওয়া, কী গরম আর গুমট। তাছাড়া, আমি ভালো করেই জানি পরিস্থিতি খুব খারাপ।'

ভদ্রমহিলার নাসারন্ধ্র সহসা ফুলে ওঠে। মুখের ক্রুদ্ধ ভাব গোপন করতে সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরায়। তারপর ঈষৎ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'তাহলে আপনি মনে করেন পরিস্থিতি আসলেই খারাপ। দেখুন, সম্ভবত আমার দেশত্যাগের সময় হয়ে এসেছে।'

জনসন অবাক হয়ে মহিলাকে খুঁটিয়ে দেখে। মুখের চারিধারে গভীর রেখা।

'কিন্তু আপনি তো এখানকার মানুষ, তাই না?'

'হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যবশত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কিছু গ্রাম্য গবেট সর্বত্র তাণ্ডব শুরু করে দেশের বারোটা বাজিয়ে দিলেও আমি এখানে পড়ে থাকব। আমি তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যাব।'

ক্ষণিক নীরবতার পর জনসন জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাবেন?'

'বিলেতে। না, ওরা ভয়ঙ্কর মধ্যবিত্তমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। হয়তো আপনাদের দেশে যাব। আপনাদের বিশাল খোলামেলা দেশে আমার জন্য একটু জায়গা নিশ্চয় জুটে যাবে। দেখি স্যামের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব।'

স্যামুয়েল কনডনের নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টত তার কিছু একটা মনে পড়ে এবং তার নাসারন্ধ্র আবার প্রসারিত হয়। সে বলে, 'স্যামকে কবে থেকে বলছি, তোমাদের একটু নজর রাখা উচিত। তা মেয়েদের কথায় কান দেয় নাকি কেউ?'

স্যামুয়েল কনডন প্রত্যাবর্তন করে। তাকে সতেজ ও শীতল দেখায়। গলার কাছে শার্টের বোতাম খোলা। লম্বা কিন্তু স্থূলকায় দেহ, তবে তার মধ্যে কেমন শান্ত একটা ভাব। বসিয়ে রাখার জন্য জনসনের কাছে ক্ষমা চায় সে। বলে, টেনিসের সর্বশেষ সেটটা লম্বা হয়ে যাওয়ায় এ বিলম্ব। তারপর মিসেস ক্রিমের দিকে ফিরে চোখের কোণে মৃদু হাসি ঝুলিয়ে জানতে চায়, 'কেমন আছ ডল?'

প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে ভদ্রমহিলা জনসনের দিকে তাকায়, 'ওকে জিজ্ঞেস করো, সাবধান করে দিয়েছি কি না?'

'হ্যাঁ, সাবধান করেছিলে, ডল। তোমার আসমানি বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে।'

তারপর এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টেনে স্যামুয়েল একটি ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসু চোখে ভদ্রমহিলার দিকে তাকায়, 'তুমি কী খাবে, ডল?'

মহিলা সহসা উঠে দাঁড়িয়ে নিম্নকণ্ঠে বলে, 'না, ডল এখন কিছু খাবে না। ও এখন চলে যাবে।' তারপর ঈষৎ পরিহাসপূর্ণ হাসি হেসে কণ্ঠে ক্ষীণ কায়দা মিশিয়ে বলে, 'তোমরা এখন নিশ্চয় বেসবল নিয়ে আলাপ করবে না, তাই না? অন্তত এই ভদ্রলোক নিশ্চয় নয়।' জনসনকে দেখিয়ে সে আরো বলে, 'পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে এখনো যে রহস্যের জবাব মেলেনি তিনি এখানে এসেছেন সেটি উদ্ধার করতে।'

২

পালিশ করা শক্ত মেঝেতে আত্মসচেতন তরুণীর মতো সরু হিলের খটখট শব্দ তুলে মিসেস ক্রিম তাদের রেখে চলে গেলে স্যামুয়েল কনডন তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর মাথা ঝাঁকায়।

'আপনি কী নেবেন?' জনসনের দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করে।

'মার্টিনি।'

দুটো মার্টিনির অর্ডার নিয়ে বেয়ারা চলে গেলে কনডন আবার বলে, 'মনে হচ্ছে আমাদের সবাইকে পথে বসানোর জন্য আপনার তদন্তের সব প্রস্তুতি সারা হয়ে আছে।'

জনসন সংক্ষিপ্ত হাসি হাসে, যেন হাসিটি নিঃসৃত হতে দেয়নি বলে সেটি মুখের ভেতরেই ধ্বনিত হয়।

'ওখানে দেশে রোমহর্ষক কিছু হেডলাইন ছাপা হয়েছে', সে বলে। 'সবাই ধরে নিয়েছে, বহু বছর ধরে আমাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র এ দেশটিতে চরম বিপর্যয়কর কিছু একটা ঘটে গেছে। স্বভাবতই ওরা এক প্রকার স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে।' জনসন ভাবে, ওরা যদি এখন এই মার্কিন কূটনীতিককে দেখতে পেত। ধুন্ধুমার টেনিস খেলার পর এই স্নানসিক্ত, ঝরঝরে হয়ে আসা এবং এখন মখমলের মতো মসৃণ লনের প্রান্তে আরামদায়ক চেয়ারে নিশ্চিন্তে বসে থাকা এই লোকটিকে দেখতে পেলে ওদের বিস্ময়ের মাত্রা হয়তো কমত।

'হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক।' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে কনডন। তারপর টেনিস কোর্ট থেকে ফিরতে থাকা এক দম্পতির উদ্দেশে হাত নাড়ে। দ্রুত রাত নাবছে।

'আজ সকালে নানাভির সঙ্গে দেখা করেছি', পানীয় এসে পড়ার পর জনসন বলে।

'কী বলল?'

'তেমন কিছু না। মনোবল অটুট আছে বলে মনে হলো। লম্বা সময়ের জন্য বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। বললেন, অবশেষে এসব বিরক্তিকর দায়দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে তিনি খুশি। তবে একবার হলেও তাঁর এই ভারমুক্তির প্রফুল্ল ভাবটা খসে পড়েছিল। বললেন, তাঁর দেশের সর্বনাশ না এখান থেকে শুরু হয়ে যায়। তবে তৎক্ষণাৎ মৃদু হেসে আমার পিঠ চাপড়ে দেন, যেন সান্ত্বনা আমারই দরকার। সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের এখানেই ইতি।'

'হয়তো সংবাদপত্রের লোকজনের প্রতি এখন তার আগ্রহ কমে গেছে।'

জনসন সরাসরি কূটনীতিকের দিকে তাকায়। 'আমার জানা দরকার, আসলে কী হয়েছিল। কেন তিনি নির্বাচনে হেরে গেলেন?'

'কারণটা সোজা। যখন কিছু করা দরকার ছিল, তখন তিনি কিছুই করেননি। নিজের বিপুল জনপ্রিয়তায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন। কিন্তু অপরপক্ষ চুপচাপ বসে থাকেনি। ওরা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ ছিল তাও নয় : পসারহীন আইনজীবী, ক্ষুদে দোকানদার, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক—এসব লোক। তারা ব্যানার আর লাউডস্পিকার নিয়ে দেশের আনাচে-কানাচে গেছে, গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দিয়েছে, তারা কাঁদলে গরিবেরাও কেঁদেছে, তারা হাসলে হেসেছে। বুড়ো নানাভি ঘুম ভেঙে দেখেন দেরি হয়ে গেছে। তখন তিনি প্রশাসন ও পুলিশকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি তাতে আরো খারাপ হয়েছে।'

'এই সব?'

'হ্যাঁ।' কনডন চতুর্দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেয়, আশেপাশে কেউ নেই। তারপর চোখ পিটপিট করে বলে, 'শেষের দিকে আমরা তাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। আমার মনে হয়, তার দিন আসলেই শেষ।'

জনসন অনুভব করে, কূটনীতিকের ওপর সে যেন ঈষৎ ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। ঘটনা বর্ণনায় তার এই লঘুমনস্কতা, কেমন নিশ্চিন্ত ভাব পরিস্থিতির গুরুত্বের সঙ্গে মানানসই নয়। কনডন হয়তো জনসনের মনোভাব বুঝতে পারে। সে অনুতপ্ত কণ্ঠস্বরে বলে, 'স্বীকার করছি আমাদেরও খানিকটা ভুল হয়ে গেছে। নানাভি চোখ-কান বন্ধ রাখলেও, আমাদের খোঁজখবর রাখা উচিত ছিল।'

ভীষণ শক্ত মুখে তাকিয়ে থেকে জনসন বলে, 'মি. কনডন, আমার মনে হয়, এখানকার পরিস্থিতি খুবই গুরুতর। পুরো ব্যাপারটা আমাকে তলিয়ে দেখতে হবে।'

'অবশ্যই', বিরক্তিকর ভঙ্গিতে চোখ পিটপিট করে বলে কূটনীতিক। 'কিন্তু তার আগে একটা কথা বলি। কিছু কিছু খবর থাকে সাংবাদিকদের ডেস্কে পৌঁছে দেওয়ার আগে যেটিকে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় চেপে রাখতে হয়। পরিস্থিতি আসলে ততটা খারাপ নয়।'

কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা শোনার জন্য জনসন খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে। কিন্তু কিছু শুনতে না পেরে সে প্রশ্ন করে, 'মানে?'

মার্কিন দূতাবাসের পদস্থ রাজনৈতিক কর্মকর্তা স্যামুয়েল কনডন এবার কেমন এক ষড়যন্ত্র পাকানোর পরিবেশ তৈরি করে। সম্মুখে নুয়ে পড়ে ফিসফিস করে সে বলে, 'মনে রাখবেন, এটা শুধু আপনার আর আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ এটা এখনো টপ সিক্রেট। আপনি কি জানেন, নতুন সরকারের প্রধান কে হতে যাচ্ছেন?'

'আমি তো জানি আবদুল কাদের, ইউনাইটেড ফ্রন্টের নেতা।'

'হ্যাঁ, তিনিই। এবং তিনি নানাভির পুরনো নীতি পরিবর্তন করছেন না। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার খাতিরে তিনি নানাভির দলের যারা কোনো রকমে নির্বাচনে জিতেছে তাদের সঙ্গে এবং আরেকটি ছোট দলের সঙ্গে জোট বাঁধবেন। তারপর তিনি সোজা তার পূর্বসূরির জুতাটি পরবেন।'

জনসনের চেহারায় ফুটে ওঠা গভীর বিস্ময় তৃপ্তিভরে তাকিয়ে দেখতে দেখতে কনডনের চোখের ঔজ্জ্বল্য তাঁর পুরো চেহারায় ছড়িয়ে পড়ে।

'এটা কী করে সম্ভব?'

'হ্যাঁ, এমনটাই ঘটবে। অপেক্ষা করুন, দেখুন নতুন মন্ত্রিসভার নীতি ঘোষণা কী দাঁড়ায়। আরেকটা মার্টিনি চলবে?'

'ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে নেব।'

স্যামুয়েল কনডন সহমর্মিতার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে ও স্থানীয়দের মতো করতালি বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকে।

ধীরে ধীরে ক্লাবের সদস্যরা আসতে শুরু করে। রাস্তার রঙিন বেলুনগুলি জ্বালানো হয়ে গেছে, ক্লাবভবনে মাথার ওপর একটি তীব্র সার্চলাইট জ্বলছে। তার আলোয় বিশাল লনের অর্ধেক অংশ আলোকিত হয়ে ওঠে, ক্রমশ কালো হয়ে আসা সন্ধ্যায় ঘাসের ওপর রূপালি সবুজ রঙের আভা। বাইরের টেবিলগুলির শেড দেওয়া বাতি থেকে তুষারশুভ্র ঢাকনার কাপড়ের ওপর ক্ষুদে উজ্জ্বল সাদা আলোর বৃত্ত পড়েছে। টেবিলগুলির দক্ষিণে বৃত্তাকার, ভ্রাম্যমাণ কাঠের ড্যান্সফ্লোর বসানো। বোঝা যায়, এরা ভাবছে আজ বৃষ্টি হবে না।

'মানছি এটা সত্যি একটি সংবাদ', জনসন বলে। 'কিন্তু আবদুল কাদেরের মতি পরিবর্তনের কারণ কী?'

কনডনের মনে হয়, জনসনের এ প্রশ্নের পেছনে অন্য এক প্রশ্নের ইঙ্গিত লুকানো আছে। প্রথমটায় জবাবে সে বলতে চেয়েছিল, আবদুল কাদেরের মন পরিবর্তনের পেছনে মার্কিন দূতাবাসের কোনো হাত নেই, কিন্তু সে এ কথা বলবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। একটি বড় রুমাল বের করে সে নাক ঝাড়ে। 'মনে হচ্ছে সর্দি ধরবে', সে ঘোষণা করে। তারপর বলে, 'তিনি তার মন পাল্টাননি। নিজের আদর্শে তিনি এখনো অটল। অবশ্য আপনি তো জানেন নিরপেক্ষতার আদর্শের ফাঁদে তিনি কী করে জড়িয়ে গেছেন, জানেন না কি?'

এ কথা তার জানা ছিল না, কিছুটা বিরক্তিভরে জনসন জানায়। কনডনের সেদিকে খেয়াল নেই। সে পূর্ববৎ বারান্দার দূরতম প্রান্তে উদিত হওয়া নতুন কিছু লোকের উদ্দেশে হাত নাড়ে এবং ধীরস্থিরভাবে বলে, 'আবদুল কাদের মনে করেন, নানাভির সঙ্গে লড়াই করা তার ক্ষুদে দলের একার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তিনি ভুঁইফোড় তিনটি নতুন দলের সঙ্গে হাত মেলান। তারা আপসরফায় পৌঁছে ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠন করে, আবদুল কাদের হন তার নেতা। জোটের অপর দলগুলি তাদের কট্টর সমাজবাদী কর্মসূচির সুর অনেক নাবিয়ে আনে, বিনিময়ে আবদুল কাদের তাদের একটি দাবি গ্রহণ করেন, নিরপেক্ষতা। আবদুল কাদেরের দিক থেকে এটা ছিল স্রেফ এক নির্বাচনী কৌশল। নিরপেক্ষতার নীতিতে কোনোকালে তাঁর আস্থা ছিল না।' কনডন কণ্ঠস্বর চড়িয়ে ঘোষণা করে, 'উপযুক্ত লোক। আমি মনে করি বাস্তবতার মাটিতে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তিনি ভালো করে জানেন, আমাদেরকে এ দেশের কতটা দরকার। তিনি এও জানেন, তাঁর নির্বাচনী সহকর্মীদের সঙ্গে অন্ধকার অচেনা পথে যাওয়ার চেয়ে পরিচিত পথে পা বাড়ানোই নিরাপদ।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে জনসন জিজ্ঞেস করে, 'আর যারা এই মাথামুণ্ডু স্লোগানের পেছনে ভোট দিল, তাদের কী হবে? তাদেরকে তো নিরপেক্ষতাবাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তাই না?'

তাদের কথা কেউ শুনছে না নিশ্চিত হওয়ার জন্য স্যামুয়েল কনডন পুনরায় চারদিকে তাকায়, এ ক্লাবে সম্ভবত যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তারপর খানিক বিস্ময়ের কণ্ঠে

বলে, 'কীসের প্রতিশ্রুতি? ভোট পাওয়ার জন্য প্রার্থীরা যা ইচ্ছা ওয়াদা করে। নানাভির যারা ডান-হাত বাঁ-হাত তারা তো আর গ্রামের চাষা-ভুষা নয়, তাদের তো চেহারাই দেখতে পাওয়া যায় না, কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করে অঢেল সম্পত্তির মালিক, ঝকমকে গাড়ি হাঁকায়, গ্রামের পানাপুকুরের পূতিগন্ধে তাদের বিরক্তি, মফস্বলের নোংরা পথ-ঘাট, ম্যালেরিয়া আর মাকড়সায় তাদের আতঙ্ক। কাজেই ইউনাইটেড পার্টির লোকজন গ্রামের লোকজনকে কী-না-কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেটা কোনো বিষয় নয়।'

'তার মানে ভোটারদের ভোট চাওয়াতেই এটা সীমাবদ্ধ?'

'আলবৎ।'

কথাটা জনসন মেনে নিয়েছে মনে হয় না। তার ভাব লক্ষ করে কনডন প্রথমবারের মতো গম্ভীর কণ্ঠে বলে, 'আপনাকে আগে এ দেশটার চালচরিত্র বুঝতে হবে, মি. জনসন। এখানে আশি ভাগ লোকের বসবাস গ্রামে। তারা লেখাপড়া জানে না। পাশের গ্রামে কী হচ্ছে তারই খবর রাখে না। যে কেউ তাদের কাছে গিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করতে পারে।'

'কিন্তু নানাভির বিরোধী পক্ষ কেন এই স্লোগানটিই বেছে নেবে? তারা যদি যা ইচ্ছা তাই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। তাহলে অন্য কিছু তারা শোনাল না কেন?'

'আমি কিন্তু বলিনি ক্ষুদ্র দলগুলি এ স্লোগানে বিশ্বাস করে না। কিন্তু তারা এক জিনিস আর ভোটাররা আরেক। যাই হোক, এসব ক্ষুদে দল নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, এগুলির হাতেগোনা নেতাফেতারা সব অসন্তুষ্ট আর রোমান্টিক ধরনের। আমি বলছি, দেশটা খারাপ না, এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। এখানকার লোকজন ধর্মপ্রাণ, সমাজতন্ত্রের তোয়াক্কা এরা করে না। যারা সত্যি-সত্যি করতে পারত, তারাও সরকারি চাকরিতে ঢুকে পড়েছে, সরকারি চাকরি এরা আবার খুব পছন্দ করে। তারপর আছে ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিদের একটা ক্ষুদে, বর্ধিষ্ণু গোষ্ঠী, তারা কোনো সমস্যা পাকাবে না। কাজেই যদি মূল নেতা ঠিক থাকে, তো সব ঠিক।'

'ছাত্র আর শিক্ষকদের কী অবস্থা? আহসান না কী যেন নামের এক শিক্ষকের কথা শুনলাম। কিছু ছাত্র নাকি তার প্রতিটি কথা বেদবাক্য হিসেবে গ্রহণ করে।'

কনডন স্বর নিচু করে বলে, 'গোটা কয়েক গোঁয়ার পুলিশই তার ব্যবস্থা করতে পারবে।'

জনসন অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসে, 'তার মানে সবকিছু ঠিকই আছে?'

'সব ঠিক আছে। এখানে আমরা খুবই অনুকূল অবস্থায় আছি। পরিস্থিতি এমনকি আরো ভালো হবে, কারণ এখন আরো বুদ্ধিমান একজনকে দেশের শাসক হিসেবে আমরা পাচ্ছি, তার ওপর লোকটা আবার জাতীয়তাবাদী। আপনি এ নিয়ে বাজি ধরতে পারেন।'

জনসন উত্তর দেয় না। হয়তো এখনই তার বাজি ধরার ইচ্ছে হয় না।

কনডন আবার নাক ঝাড়ে, তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

'ও, একটা কথা। নানাভির খুশি থাকার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি লন্ডনে যাচ্ছেন রাষ্ট্রদূত হিসেবে।'

'আপনার লোকজনই কি এ ব্যবস্থা করেছে?'

পৃথুল কূটনীতিক ঈষৎ বিব্রত হওয়ার ভঙ্গি করে। 'আপনি তো জানেন এ ক্ষেত্রে কী হয়। সত্যিকারের বন্ধুকে তো আর পথে ফেলে দিতে পারেন না, তাই না?' তারপর

জোরালো স্বরে সে বলে, 'সত্যি খুব ভালো লোক, জানেন। ওখানে তার দিন কাটবে খুব সুখে, বুড়োদের আধো-অন্ধকার ক্লাবে ঠাট্টা-তামাশা আর শেক্সপিয়ার নিয়ে আলোচনা করে সময় কাটবে, আর কী চাই।' ক্লান্ত পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমুদে হাসি মেখে সে বলে, 'এসব বলে আপনাকে হতাশ করে থাকলে দুঃখিত, আপনাকে বলার মতো কোনো মজার কথাও অবশ্য নেই। এখন যেতে হয়। আপনাকে লিফট দিতে পারি?'

বাইরে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছে জনসন। সে বলে, 'না, ধন্যবাদ। পানীয়ের জন্য ধন্যবাদ।'

প্রশস্ত কিন্তু নিচু সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালে বিপন্ন কোনো নারীকণ্ঠের এক ক্ষীণ আর্তনাদে জনসন কেমন হতচকিত হয়ে পড়ে। তারপর ক্ষিপ্রবেগে ধেয়ে আসা জুতোর হিলের তীক্ষ্ণ শব্দ। কয়েক মুহূর্তে নারীকণ্ঠের এই আর্তনাদ বোধগম্য একটি শব্দে পরিণত হয় : তার নিজের নাম। স্বরবর্ণ অপছন্দকারিণী, বিদেশগমনেচ্ছু ভদ্রমহিলাটি তাকে ডাকছে।

'স্যাম কোথায়?' তার কাছে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে মেয়েলোকটি।

'চলে গেছেন।'

ভদ্রমহিলাকে হতাশ দেখায়। 'খুব জরুরি একটা কথা বলতে এসেছিলাম তাকে।'

'কিন্তু তিনি যে চলে গেলেন', জনসন পুনর্বার বলে।

'আমি এমন একটা কথা জেনেছি, শুনলে তিনি লাফিয়ে উঠতেন।'

'কোনো সুসংবাদ?'

খবরটা যাই হোক না কেন, মেয়েলোকটি তা গোপনীয় বিবেচনা করছে এবং কোনো সাংবাদিককে তা বলা সমীচীন হবে কি না সেটি নিয়ে ঈষৎ দ্বিধান্বিত। ভেতরের দ্বন্দ্বের ছাপ পড়েছে তার চেহারায়। সহসা সে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তার চেহারায় ভার নেবে যাওয়ার ছাপ।

সে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে, 'সুসংবাদই বটে। আবদুল কাদের আমাদের পক্ষে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

জনসন ভ্রূ-কুঞ্চিত করে, 'তাই নাকি?'

সহসা চলে যাওয়ার জন্য মিসেস ক্রিম ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। সদ্যলব্ধ খবরটা হয়তো তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে সে দ্রুত বলে, 'এখনই এ খবর পাঠিয়ে দেবেন না যেন।'

'আমি আপনার সম্মতির জন্য অপেক্ষা করব', জনসন শান্ত কণ্ঠে তাকে আশ্বস্ত করে।

চতুর্থ অধ্যায়

১

নতুন প্রধানমন্ত্রী আবদুল কাদের আঁটোসাঁটো গড়নের মাঝারি উচ্চতাবিশিষ্ট মানুষ, মসৃণ, প্রশস্ত কপাল। পুরু সুস্পষ্ট ঠোঁট যেন অনর্গল কথা বলার উপযোগী করেই বানানো, সেই ঠোঁটের কিনারায় গভীর রেখা। ঘন ভ্রূর মাঝখানের স্থানটুকুতে খাড়া তিনটি রেখা যেন সার্বক্ষণিক এক অসুখী মানুষের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে রেখেছে। সবার আগে চোখে পড়ে তার অস্থির, বিস্ফারিত, টলটলে একজোড়া চোখ। সেগুলি এক মুহূর্তে গভীর জলের মাছের মতো স্থির, পরমুহূর্তে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় এদিক-সেদিক, ওপর-নিচ ছোটাছুটি করে। তারপর সহসা তারা নিথর হয়ে যেন মৃত পশুর চোখের মতো দ্যুতিহীন হয়ে পড়ে।

দেশের সবচেয়ে জনবহুল এলাকার এক ক্ষুদ্র গৃহস্থ পরিবারের সন্তান আবদুল কাদের। এখানে জমির মালিকানা নিয়ে অনবরত টানাটানি এবং অন্তহীন দুর্দশা মানুষজনকে নির্দয় ও ধূর্ত করে তুলেছে। এই নির্দয়তা ও ধূর্ত ভাব কিয়ৎপরিমাণে প্রধানমন্ত্রীর মধ্যেও লক্ষ করা যায়। তার চেহারায় যে অসুখী মানুষের ছাপ সেটি নিজের পল্লী এলাকার মানুষজনের মধ্যে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলাফল। এখানে কে আর নিশ্চিন্ত নির্ভার চেহারা নিয়ে ঘোরাফেরা করার সাহস দেখায়, যুবক বয়সেই সবাই সব আনন্দ-উচ্ছ্বাস বিসর্জন দিতে শিখে নেয়।

আবদুল কাদের পেশায় আইনজীবী। কিন্তু এলাকার লোকজন মামলা-মোকদ্দমায় সর্বক্ষণ ডুবে থাকলেও কাদের কোনোদিন আসর জমাতে পারেনি। ক্রমবর্ধিষ্ণু ও আয়ের সঙ্গতিহীন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে জমির মালিকানা অনবরত ভাগ হয়ে যেতে যেতে নিজের জন্য যেটুকু হাতের পাঁচ রাখা সম্ভব হয়েছে, তা থেকে দুর্দিনে কাদেরের হাতে কিছু আসত। এর ফলে স্থানীয় রাজনীতিতে তার প্রবেশ সুগম হয়। শাসনামলের শেষ দিকে ব্রিটিশরা তখন সবেমাত্র রাজনীতি করার অনুমতি দিয়েছে। সে রাজনীতি করে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব হতো না। তবু এটুকুতেই কাদেরের নিজ দেশের মানুষজনের চালচরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করার যৎসামান্য অভিজ্ঞতা হয়।

দেশ স্বাধীনতা পাওয়ার পর বৃহৎ পরিসরের রাজনীতিতে নাবার চেষ্টা করে সে, কিন্তু লক্ষ করে গুরুত্বপূর্ণ সব পদ অপ্রবেশ্য হয়ে আছে। এমন সব লোক এসব পদ আগে থেকে অধিকার করে রেখেছে, যারা হয় তার চেয়ে অগাধ সম্পদের মালিক, নতুবা স্বাধীনতার আগেই

উচ্চস্থানীয় রাজনৈতিক চক্রাদিতে নাম লিখিয়েছে। নানাভির প্রশাসনে সে চাকরির চেষ্টা করে, কিন্তু আদালতে কোনো খালি স্থান ছিল না।

কালক্রমে একটি ক্ষুদ্র বিরোধী দল গড়ে ওঠে, তাতে যোগ দেয় তার মতো লোকজন, যারা নানাভির টেবিল থেকে একটি রুটির টুকরাও কুড়িয়ে পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করেছে। কাদের তৎক্ষণাৎ সে দলে যোগ দেয়। সে লক্ষ করে দলটি মূলত অসহিষ্ণু ও অসন্তুষ্ট মানুষে পূর্ণ, তারা নানাভির প্রাসাদে তাদের ব্যর্থ অভিসারের কথা কখনো উল্লেখ করে না বটে, তবে জোটবদ্ধ হওয়ার পর তাদের বিশ্বাস জন্মায়, এ যূথবদ্ধ প্রচেষ্টা তাদের সেই অবস্থানে আসীন হতে সহায়তা করবে, যেখান থেকে তারা, যাকে বলে, জাতিগঠনের কাজে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে। কাজেই সহসা তারা নানাভি ও তার সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। সদ্যস্বাধীন কোনো দেশে আর যা হোক শাসক দলকে সমালোচনা করার উপলক্ষের অভাব ঘটতে দেখা যায় না। কোনো সরকার যদি স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি শুরু নাও করে থাকে, তাদের দোষারোপ করার জন্য দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতার শতাব্দীপ্রাচীন সমস্যাগুলি তো রয়েই গেছে। কাজেই খাদ্যঘাটতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, হাসপাতাল ও স্কুলস্বল্পতা প্রভৃতি অভিযোগে বিরোধী দল সুতীব্র শোরগোল তোলে। বিশেষত স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি নিয়ে তারা দুর্বার বেগে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। তবে সংসদে এসব অভিযোগ সবিস্তারে পেশ করে যাওয়ার সময় তাদের দলীয় সদস্যদের কণ্ঠের স্বরগ্রামে কোনো হেরফের না হলেও শীঘ্রই এ এমন এক নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয় যে, তাদের যে কেউ তার নিজের বক্তৃতার পালা না আসা পর্যন্ত গভীরতম ঘুম ঘুমিয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে তার গলাবাজি শুরু করতে পারে। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ নানাভি প্রথমটায় এরূপ আক্রমণকে গুরুত্ব দিতেন। ধৈর্য ধরে তাদের বক্তৃতা শোনার সময় একটি আমুদে ও সহিষ্ণু ধরনের হাসি তাঁর মুখমণ্ডলে খেলা করত, বক্তার কণ্ঠ কখনো অতিরিক্ত কর্কশ হয়ে উঠলে তাঁর মুখে ক্ষীণ কুঞ্চন দেখা দিত। সন্ধ্যায় সামনে হুইস্কির গেলাস রেখে কখনো-সখনো তিনি বলতেন, একটি বিরোধী দলের উত্থান ঘটছে দেখে তিনি সন্তুষ্ট, কারণ বিরোধী দল ছাড়া কোনো গণতন্ত্র সম্ভব নয়। আবার কখনো সংসদে সরকারি বেঞ্চের পেশকৃত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিরোধী দলের ভয়ঙ্করতম অভিযোগও মুহূর্তে অসার প্রতিপন্ন করে দিলে তাদের কথা ভেবে তাঁর আফসোসও জেগে থাকবে। এসব তথ্য-উপাত্তের প্রতি নানাভির ছিল অগাধ আস্থা, যে কর্মকতারা সেগুলি তৈরি করতেন তাদের মনে তথ্যের স্ববিরোধ দেখা দেওয়ার কোনো শঙ্কা জেগে উঠত না। কেননা, এসব তথাকথিত পরিসংখ্যানজাত উপাত্ত যে কক্ষে জন্ম নেয়, সেটিতে প্রবেশের চাবিটি একমাত্র তাদেরই দখলে। কাজেই ধীরে ধীরে বিরোধী দল এক তামাশার খোরাকে পরিণত হতে থাকে। এমনকি বিরোধী দলের কেউ কেউ নিজেদের বক্তব্য নিজেরাই আর বিশ্বাস করত না। সরকারি বেঞ্চে আতঙ্ক ধরিয়ে দেওয়ার বদলে তাদের নিজেদের মন বরং হতাশায় পূর্ণ হয়ে উঠত। স্বভাবতই নানাভির ক্ষমতার ভিত পূর্ববৎ অটল থাকে।

এই পরিণামহীন নিরুদ্দেশ গোষ্ঠীর ভেতর একজন লোকই ছিল ব্যতিক্রম, সে আবদুল কাদের, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। সে পার্লামেন্টে কথা বলত সামান্যই। যখন দাঁড়াত, মনে হতো বুঝেশুনে বক্তব্য দিচ্ছে। কথা বলত নিরাবেগ ভঙ্গিতে। কিন্তু তাতে প্রত্যয় প্রকাশ পেত, তার ভাষা ছিল সংযমী। তার গতিশীল মুখমণ্ডল যত ধরনের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলায় দক্ষ ছিল, তার কোনোটাই ভাষণের সময় প্রয়োগ করত না সে। ক্ষুদ্র গ্রুপের অন্য সদস্যদের সঙ্গে বসে থাকলেও তাদের ভেতর তাকে আলাদা করে চেনা যেত। সংসদের সব অধিবেশনে সে অংশ নিত, নিঃশব্দে শিখে নিত সংসদীয় ব্যবস্থা ও সরকার পরিচালনার যাবতীয় খুঁটিনাটি।

সংসদভবনের গ্রন্থাগারে রাখা বইপত্র ও রাজনৈতিক পত্রপত্রিকা পাঠ করে সে এমনকি আন্তর্জাতিক রাজনীতির রহস্যময় গোলকধাঁধায় বিচরণে প্রয়াসী হয়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে কিছু কিছু করে ধারণা নিতে থাকে। নানাভির শহুরেপনা ও কেতাদুরস্ত ভাব দেখে তার মনে গোপন হিংসা জন্ম নিত, কিন্তু কিছুদিন তার কথাবার্তা শুনে ও আচার-আচরণ লক্ষ করে সে বুঝতে পারে দেশের নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে এগুলি কোনো জরুরি গুণাবলি নয়। নানাভির কথা বলার ভঙ্গি আকর্ষণীয়, কিন্তু সে ভঙ্গি তার দেশের জনগণের ভঙ্গি নয়; তার আচার-ব্যবহার বিশুদ্ধ, কিন্তু সেসব আমজনতার কাছে অপরিচিত। আবদুল কাদের সাব্যস্ত করে, নানাভি না ঈর্ষার যোগ্য, না আদর্শ হিসেবে গণ্য।

খিলানবিশিষ্ট অধিবেশনকক্ষের শীতলতার মধ্যে বসে থেকে আবদুল কাদের এক সুবিশাল স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এমনকি তার দল তাকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করারও আগে সে দিব্যচোখে এমন একটি দিনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, যে দিন সে সংসদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছে। নিজ দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার (তার সহকর্মীরা সবাই আত্মবিশ্বাসহীন ও হতাশ হয়ে পড়ায় এবং সে একাই শুধু প্রত্যয় টিকিয়ে রাখায় সেটা সম্ভবপর হয়) সঙ্গে সঙ্গে সে নতুন নির্বাচনের দাবি তোলে। সেদিন সেসব আবেগ ঢেলে দিয়ে বক্তৃতা করে গণতন্ত্র বিষয়ে বিশ্বের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা কে কী বলেছে, সেসব উদ্ধৃতি দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ নিত্যদিন তোলা হয়, তার কোনোটির কথাই সে তোলে না। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাটের অভাবের কথা তুলে সে সমালোচনা শুরু করে না। সে এমন এক অভিযোগ তোলে, যার কথা কেউ এর আগে শোনেনি।

'উপনিবেশবাদ', সে ঘোষণা করে, 'এক শয়তানের দেহের শয়তানি আত্মার মতো অপসৃত হয়েছে, পেছনে ফেলে গেছে দুর্গন্ধময় হাড়গোড়। এ লাশ মাটিচাপা না দিয়ে আমাদের সরকারের হর্তাকর্তারা এর মধ্যে সুগন্ধি মেখেছে, একে বসিয়েছে পূজার বেদিমূলে। কিন্তু এ লাশ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং এ লাশের গহ্বরে আমাদের দেশের কেঁচো-কৃমিরা তাদের শকুনের মতো ক্ষুধার খাদ্য উপাচার খুঁজে পাচ্ছে। এ লাশ মাটির নিচে পুঁতে ফেলে এবং যারা এর পূজা করছে তাদের অপসারণ করেই কেবল আমরা আমাদের এ দেশকে রক্ষা করতে পারব।' কাদের বলে, ঔপনিবেশিক শাসকদের বিদায়ী উপহার হিসেবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই ধোঁকাবাজির গণতন্ত্রকে চিরস্থায়িত্ব দেওয়ার পাপ স্খলন করার অন্য কোনো পথ নেই। 'আমাদের আত্মা তমসালিপ্ত হয়ে গেছে', সে বলে, 'বিদায় নেওয়া বড় লাটের অপচ্ছায়ার অদৃশ্য হাত আরো নিশ্চিন্তে, আরো আরো নির্দয়ভাবে আমাদের শ্বাসরোধ করে রেখেছে। কারণ এসব হাত এখন আমাদেরই নিজেদের লোকজনের হাত, এরা আমাদেরই কারো ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে, এ জন্য তাদের শত্রু বলে চেনা যাচ্ছে না।' নাটকীয় এক ভঙ্গি করে আবদুল কাদের বলে, 'আসুন, দেশের প্রতিটি ঘরে মুক্তির নির্মল প্রাণোচ্ছল বাতাস বইয়ে দিই। এ বাতাস আমাদের দিগন্তজোড়া ধানক্ষেত, নদী-নালা, সমভূমির ওপর দিয়ে বয়ে যাক। আসুন জেগে উঠে আমরা মুক্তির স্বাদ নিই, এর আনন্দ এবং এমনকি এর ঝুঁকির সঙ্গে পরিচিত হই।'

অধিবেশনকক্ষে সেদিন সাড়া পড়ে যায়। এমনকি আবদুল কাদেরের বক্তৃতা ভালো করে শোনার জন্য নানাভি ঝুঁকে পড়ে কান খাড়া করেন। সরকার পক্ষ তার বাগ্মিতার ভূয়সী প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত না হলেও নতুন নির্বাচনের দাবি তারা হেসে উড়িয়ে দেয়। তারা বুঝতে পারে, এ দাবি নিছক বাগাড়ম্বর নয়।

পুরো দু বছর তারা এ দাবি নাকচ করে গেছে। তারপর যখন ব্যাপারটা ঠাট্টা হিসেবে বেশি হয়ে যায় তখন একদিন তারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। তারা বলে, কত ধানে কত চাল সেটা বিরোধী দলকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তারা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। এবং এ প্রকারে নিজেদের পরিণতির পথ তারা নিজেরাই তৈরি করে।

২

মন্ত্রীসভা শপথ নেওয়ার দু দিন পর জনসনের কাছে বার্তা আসে, প্রধানমন্ত্রী আবদুল কাদের তার সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য দেখা করতে চান। সাক্ষাৎকারের জন্য অদ্ভুত সময় নির্ধারণ করা হয়েছে, রাত ১টা। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে যেতে যেতে জনসন ভাবে, গিয়ে এমন কর্মক্লান্ত একজন মানুষকে পাবেনা তো যার সাংবাদিকের ধকল সহ্য করার মতো ধৈর্য নেই। পরে মনমরা চেহারার সচিব তাকে নিয়ে বসায় ক্ষুদ্র আধো অন্ধকার এক স্টাডিরুমে। প্রধানমন্ত্রী এখনো কয়েকজন অতিথির সঙ্গে কথা বলছেন, তবে খুব একটা দেরি করবেন না কিংবা এ জাতীয়ই কী একটা মিনমিন করে বলেছিল সচিব। অপেক্ষায় বসে থেকে জনসন অনুভব করে দু দিন আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য সে যতটা উদগ্রীব ছিল, এখন আর তা নয়। সরকারের নীতি ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া গেছে, দেশ আবার আগের রাস্তায় ফিরে এসেছে। এমনকি, মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে এ দেশ আদৌ কখনো পথচ্যুত হয়েছিল কিনা, কয়েকদিন ধরে এত শঙ্কা, এত গুজবের পর অনেকেই হতাশ হয়েছে।

জনসন হয়তো ঈষৎ তন্দ্রাবোধ করেছিল, একটি কণ্ঠস্বর শুনে সে জেগে ওঠে। হাত বাড়িয়ে ধরে প্রধানমন্ত্রী তার সম্মুখে দাঁড়ানো। করমর্দনের পর প্রধানমন্ত্রী চকিতে ডেস্ক ঘুরে গিয়ে তার গভীর নকশাখচিত চেয়ারটিতে বসেন। ডেস্কের ওপর রাখা কিছু স্টেশনারি জিনিস ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কথা বলার জায়গা তৈরি করে নেন যেন, তারপর জনসনের দিকে তাকান, তার ছলছল করা চোখ, মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিহীন।

জনসন তার পত্রিকার নীতি বর্ণনা করার সময় প্রধানমন্ত্রী বসে তা শুনতে থাকেন, মাঝে মাঝে অনুমোদন অথবা দ্বিমত প্রকাশ করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন। কয়েক মুহূর্ত পর তার মনে হয় যথেষ্ট শুনেছেন। অতিথিকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'ভালো।'

ঈষৎ দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর জনসন খামোখা সশব্দে হেসে উঠে বলে, 'আপনাদের এখানকার নির্বাচনের ফলাফল শুনে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়েছি, জনাব প্রধানমন্ত্রী।'

আবদুল কাদেরের চোখে ক্ষীণ কম্পন দেখা দেয়। মনের ভেতরে তিনি দ্বিধায় ভোগেন, এই মার্কিন ভদ্রলোককে বলবেন কিনা ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠনের পরমুহূর্তেই তিনি গোপনে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে আশ্বস্ত করেছিলেন, দলের দিক থেকে নিরপেক্ষতাবাদ আসলে সুবিধা আদায়ের কৌশল মাত্র, দল ক্ষমতায় যাওয়া মাত্র এ নীতি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। হয়তো এ কথাটা ওয়াশিংটনের কান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়নি, সেসময় তাকে আর কে-ই বা চিনত, নানাভির সুবৃহৎ ও বিশ্বস্ত দলটির আড়ালে এক ক্ষুদ্র তাৎপর্যহীন গোষ্ঠীর নেতা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তার এ আশ্বাস তখন বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার কথা ছিল না। কারণ নির্বাচনী প্রচারণা তুঙ্গে উঠেছে, মতপার্থক্য দূরে সরিয়ে রেখে যেসব দল মোর্চা গঠন করেছে, তাদের প্রধান দাবি হয়ে উঠেছে নিরপেক্ষতাবাদ। শেষে প্রধানমন্ত্রী অতিথিকে এ কথা না বলার সিদ্ধান্ত নেন। চেয়ারে নড়েচড়ে বসতেই তার মুখের চারদিকের গভীর রেখাগুলি ঢিলে হয়ে পড়ে।

সম্মুখের দেওয়ালের দিকে শান্ত চোখে চেয়ে থেকে তিনি বলেন, 'আমি আপনাদের দেশের বন্ধু, আশা করি আপনি সেটা জেনে থাকবেন। আমাদের দু দেশের মধ্যে যতটা সম্ভব ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আমি চাই। আমাদের একে অন্যকে প্রয়োজন। কিন্তু আপনাদেরকেই আমাদের প্রয়োজন বেশি। আপনারা না থাকলে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব, কিন্তু আমাদের ছাড়াও আপনাদের দিব্যি চলে যাবে।'

'আপনাদের ছাড়াও আমাদের চলতে পারাটা অত নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারছি না, জনাব প্রধানমন্ত্রী।' প্রসন্ন হাসি ফুটিয়ে জনসন বলে।

আবদুল কাদের কয়েক মুহূর্ত ভাবে, পরে অপ্রয়োজনীয় মনে করে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করে না। তারপর গম্ভীর হয়ে উঠে বলে, 'যা হোক, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। আমি যেটা দেখতে চাই তা হলো, আমাদের সহযোগিতার পেছনে গভীর কল্পনাশক্তি ও যুক্তির আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। একটু গুছিয়ে নেওয়ার পরই আমি আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতার পুরো ব্যাপারটি পুনরায় পর্যালোচনা করার প্রস্তাব দেব।'

জনসনের ভ্রূ ঈষৎ প্রসারিত হয়। 'আপনি কি বলতে চান, এসবে ভীষণ ভুল কিছু করা হচ্ছে?'

উন্মুক্ত ফরাসি জানালার দিকে মুখ ফেরান প্রধানমন্ত্রী। বাইরে থেকে কোনো নৈশ ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। কয়েক মুহূর্ত ভাবনায় ডুবে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর পেছনের দেওয়ালে বিশাল ঘড়ির কাঁটা জোরালো টিক-টিক শব্দ করে জানিয়ে দিতে থাকে সেটিতে তেল কম পড়েছে।

'না, আমি সাহায্য-সহযোগিতা অপচয়ের কথা বলছি না', আচম্বিতে বলেন প্রধানমন্ত্রী। 'অপচয় তো হয়ই, সেগুলি দূর করতে হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি বলছি অন্য কথা। আমি ভাবছি এসব সাহায্যের উদ্দেশ্য বদল হওয়া দরকার কিনা।'

প্রধানমন্ত্রী থেমে জনসনের দিকে তাকিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন কথাটার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসন সচেতন কিনা। তারপর আবার বলে চলেন, 'প্রথমে দেখা যাক, আপনারা কেন আমাদের সাহায্য দেন। আমি তো বলব, এর মূল উদ্দেশ্য, আপনারা এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে চান, যাতে তারা সমাজতন্ত্রের খপ্পরে না পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আপনাদের এ সাহায্য কি তাদের জীবনযাত্রার এতটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম, যেখান থেকে তারা সমাজতন্ত্র প্রতিরোধ করার মতো যথেষ্ট শক্তিমত্তা দেখাতে পারবে? আমার মতে সেটা সম্ভব নয়।'

'এক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে আমিও একমত। আমরা চাই আপনাদের অর্থনৈতিক সংগ্রামে সহযোগিতা করতে। কিন্তু শুধু এ সাহায্যই তো আর জাদুমন্ত্রের কাজ করবে না।'

প্রধানমন্ত্রী কয়েকবার সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন। 'তাহলে এক্ষেত্রে আমরা একমত হলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাঝে মাঝে বিপন্ন অবস্থায় পড়লেও সমাজতন্ত্র কিন্তু দ্রুত বিস্তারলাভ করছে।' এক মুহূর্তে থেমে চোখজোড়াকে বিষণ্ন হয়ে ওঠার সুযোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। 'বিদঘুটে এক পরিস্থিতি, খুবই বিদঘুটে। খুব রয়ে-সয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর অবকাশ আমরা পাচ্ছি না, আপনারাও একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সাহায্য দিতে সক্ষম। সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র ও দূত ক্ষুধা এ দেশে আছে, আমাদের তারা কোনো সময় দেবে না।'

'তাহলে এর বিকল্প কী?'

প্রধানমন্ত্রী সহসা জবাব দেন না। তার মনে যে বিকল্পের কথাই থাক না কেন, তিনি যেন তা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নেন। তারপর বলেন, 'এর সঠিক উত্তর আমার জানা আছে কিনা জানি

না। তবে এর একটা সমাধান হতে পারে, যেসব বিষয় সমাজতন্ত্রকে উৎসাহিত করে, সেগুলি পরিহার করা।'

জনসনকে এবারও অপেক্ষা করতে হয়।

'আপনাকে বরং বুঝিয়ে বলি', অবশেষে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি শিল্পায়নের গতি যতটা সম্ভব কমিয়ে দেওয়া উচিত আমাদের। আমার মনে হয়, আপনাদের সাহায্য কল-কারখানার পেছনেই বেশি ব্যয় করা হচ্ছে।'

জনসনের মুখে স্পষ্ট বিস্ময়ের ছাপ। প্রধানমন্ত্রী তা লক্ষ করে উঁচু গলায় বলেন, 'আমাকে এও বলতে হচ্ছে যে, এ কথা আপনাদের কয়েকজন নেতার মাথাতেও এসেছে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের সাহস তাদের নেই। তাছাড়া, কাজটা আসলে আমাদেরই করণীয়। আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে।' তীক্ষ্ণ চোখে অতিথিকে দেখে নেন তিনি, 'আমি সত্যিই মনে করি, আমাদের থেমে পড়তে হবে। এ মুহূর্তে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে এ দেশকে শিল্পায়িত করার সব পরিকল্পনা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। শিল্পায়ন ঠিকমতো সফল না হলে অস্থিরতা আর হতাশাই শুধু তৈরি হবে। আমাদের সমাজ-কাঠামো ভেঙে পড়বে, এমন সব সংকট দেখা দেবে, যা আমাদের শত্রুদের শক্তিশালী করবে। এই শত্রু তো আসলে শিল্পায়নের কারণে সৃষ্ট বস্তিতেই প্রথম জন্ম নিয়েছে। আপনারা নিজেদের সংগঠিত করার সময় পেয়েছেন কিন্তু আমাদের হাতে সে সময় নেই। আমি কী বলতে চাই, বুঝতে পারছেন?'

জনসন মাথা নাড়ে।

প্রধানমন্ত্রী বলে চলেন, 'শিল্পায়ন আমাদের দরকার সন্দেহ নেই। কিন্তু তা করতে হবে কেবল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে এলে, এবং আজ হোক, কাল হোক, সেটা যে হবেই, আমি নিশ্চিত। সেটা হতেই হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজতন্ত্রীদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে কিংবা তারা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের গ্রামাঞ্চলের মানুষজনকে সুখী-সন্তুষ্ট রাখার পেছনেই সব মনোযোগ দিতে হবে। প্রথাগত পদ্ধতিতে পর্যাপ্ত অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে তাদের সাহায্য করতে হবে। তাদের পরিচ্ছন্ন-স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রা উপহার দিতে হবে। যে গ্রামে তারা আজন্ম বসবাস করে আসছে, সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ হতে দেওয়া চলবে না। বন্যা ও খরা মোকাবিলায় নদীতে বাঁধ দিতে হবে, কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনে সে বাঁধ ব্যবহার করা যাবে না। শুধু আমার দেশে নয়, এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও এটাই ঘটা উচিত। এভাবেই এসব দেশে আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা যুক্তিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।'

জনসন মাথা নাড়ে, কিন্তু সম্মতির না অসম্মতির ভঙ্গিতে বোঝা যায় না। সে যে নাড়া খেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ভেতরে ভেতরে তার মনে হয়, প্রধানমন্ত্রীর যুক্তি ঈষৎ সরল। তিনি ঠাট্টা করছেন না তো? প্রশ্নই আসে না।

অবশেষে জনসন বলে, 'খুব মজার চিন্তা। কিন্তু এশিয়ার অনেক নেতা শুধু পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র ও পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করে তাদের জনগণকে গ্রামে আটকে রাখতে রাজি হবে কি না আমার সন্দেহ আছে। তারা বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠার চিন্তায় বিভোর বলেই মনে হয়। আমি বলতে চাই, আমরা এ কাজে তাদের ঠিক উৎসাহিত না করলেও সহযোগিতা করছি। আমার তো মনে হয় পরিস্থিতি ইতিমধ্যে নাগালের বাইরে চলে গেছে। তাছাড়া এসব দেশ কোনো না কোনোভাবে কলকব্জা জোগাড় করে ফেলবে। পশ্চিমে আমরা না হলে এমন আরো অনেকে আছে, যারা খুশি মনে তাদের কাছে যন্ত্রপাতি বিক্রি করবে। আমরা সবাই যদি না বলি, সেক্ষেত্রে এ সুযোগ লুফে নেওয়ার জন্য লাল শিবির বসে আছে। সেটা আরো খারাপ হবে, তাই না?'

প্রধানমন্ত্রী শুষ্ক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন, 'হতে পারে, হতে তো পারেই।'

জনসনের মনে হয়, সে প্রধানমন্ত্রীকে অসন্তুষ্ট করে ফেলেছে। খানিক বিরতি দিয়ে সে বলে, 'আপনাদের এখানকার উঠতি শিল্পপতি গোষ্ঠীর কী হবে? তারপর সেসব বুদ্ধিজীবী, যারা দ্রুত শিল্পায়নের চিন্তায় মোহিত? তাছাড়া একটি আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে চাকরি খুঁজে পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে প্রতিবছর যেসব ছেলেমেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হচ্ছে, তাদের কী হবে?'

প্রধানমন্ত্রী কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকেন। তারপর শান্ত স্বরে প্রশ্ন করেন, 'তারা সংখ্যায় আর কত? হাতেগোনা।' মাথা নেড়ে প্রত্যয়ী ভঙ্গিতে তিনি বলে চলেন, 'যদি আমরা দেখি যে পথে এসে দাঁড়িয়েছি সেটা বিশৃঙ্খলায় গিয়ে ঠেকেছে, সেক্ষেত্রে আমাদের ধীরে চলার নীতি বেছে নিতেই হবে। আমাদের জনসংখ্যার বিরাট অংশ কৃষকদের ওপরই আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। অল্পেই তাদের সন্তুষ্ট করা যায়। কিন্তু ফটক খুলে দিলে কাউকেই সন্তুষ্ট করা যাবে না।'

এতক্ষণ কথা বলার সময় আবদুল কাদের খুব একটা নড়াচড়া করেননি। এবার সহসা ডেস্কের পেছন থেকে হাত বের করে তিনি জনসনের দিকে আঙুল তাক করে বলেন, 'না, জনগণকে সামনে ঠেলে দিয়ে পেছনে টেনে রাখা যায় না। তা সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে তা হয় না।'

খানিক দ্বিধা করে জনসন বলে, 'কিছু মনে করবেন না, জনাব প্রধানমন্ত্রী, আপনি যার কথা বলছেন, খুব স্বল্প সময়ের জন্য হলেও সেটা একটা স্থবির সমাজ হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'না, স্থবির সমাজের কথা বলছি না। আমি বলছি এমন এক সমাজের কথা যেখানে খাদ্যের অভাব, কাপড়ের অভাব হবে না; জনগণ সন্তুষ্ট থাকবে; বিশ্বের সঙ্গে তাদের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে।'

অতিথির মুখে অনিশ্চিত হাসি ফুটে ওঠে। তার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা শুধু অবাস্তবই নয়, কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীলও। কিন্তু কেন নিজের যুক্তি শক্তিশালী মনে হচ্ছে তার কাছে?

খুকখুক শব্দ শুনে জনসন ফিরে তাকিয়ে দেখে প্রধানমন্ত্রী অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাসছেন।

'আমি জানি', রাজনীতিবিদ বলেন, 'বলা যত সহজ, কাজটা করা তত সহজ নয়।' তারপর এক সময় হাসি মিলিয়ে গিয়ে তার মুখে সৌম্যভাব ফিরে এলে এবার তিনি ঈষৎ তিক্ত ভঙ্গিতে বলেন, 'আমি জানি, খুব যুক্তিপূর্ণ হলেও এটা করা সম্ভব নয়। আর বর্তমান পথ কেবল সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। তবু এ পথেই যেতে হবে।'

কিছুক্ষণ পর তিনি যেন পরিস্থিতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। বলেন, 'পুরো পথটি পার করা যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব নাও হয়, তবু আমরা কিছু অন্তত করতেই পারি। আমরা শিল্পায়নের স্থলে কৃষির ওপর জোর দিতে পারি। কৃষকরা আমাদের দেশের মেরুদণ্ড। আমাদের পূর্ণ মনোনিবেশ তাদের প্রাপ্য।'

জনসন নির্ভার বোধ করে, কারণ বাস্তবতার সীমার অনেক বাইরে চলে যাওয়া একটি পরিকল্পনা এবার যেন যুক্তির চৌহদ্দিতে প্রত্যাবর্তন করেছে।

সাক্ষাৎকার প্রদান ছাড়াও অপরাপর দায়দায়িত্বের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নবোধক চোখে জনসনের দিকে তাকান।

'আরেকটা প্রশ্ন', জনসন বলে, 'লক্ষ করলাম ইউনাইটেড ফ্রন্টের দুই ক্ষুদ্রতর শরিক দল এখনো মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়নি। তাদের জন্য মনে হয় কোনো আসন বরাদ্দ করা হয়নি এবং এ কারণে তারা ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন।'

প্রধানমন্ত্রীর মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়। 'আমি তো বলিনি তাদের কোনো আসন দেওয়া হবে না। কিন্তু আমি মনে করি আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগে তাদেরকে তাদের নির্বাচনের সময়কার দাবি-দাওয়াগুলি ভুলে যেতে হবে। তারা এখনই আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন চায়। এ মন্ত্রীসভাকে তো কার্যকর হতে হবে, কিন্তু এক মন-মানসিকতা, এক কণ্ঠস্বর ও অভিন্ন লক্ষ্য ছাড়া এ মন্ত্রীসভা কী করে কাজ করবে?'

'আপনার কী মনে হয়, তারা এসব দাবি ত্যাগ করবে?'

'সম্ভবত। আমরা তা-ই আশা করি। একটি দল সে কথা বিবেচনাও করছে। ওই দলের নেতৃবৃন্দ শেষে সাব্যস্ত করবে, জ্বালাময়ী স্লোগান কপচে বেড়ানোর চেয়ে মন্ত্রী সভার একটি আসন অনেক মূল্যবান। তাছাড়া নির্বাচন তো হয়েই গেছে, আরেকটি নির্বাচন এখন বহুদূরের ব্যাপার, এ সময় স্লোগান দিয়ে কী হবে? একটা নতুন দেশে জনগণ কোনো দাবি পূরণের পথ চেয়ে বসে থাকে না।'

প্রধানমন্ত্রী কয়েক মুহূর্ত থামেন, তারপর স্পষ্টত নির্বাচনের ফলাফল আগাম বুঝে উঠতে না পেরে সে সময় ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠনের প্রসঙ্গে বলে ওঠেন, 'ভুল তো মানুষেরই হয়। কিন্তু সে ভুল বয়ে বেড়ানোর প্রয়োজন কী?' আচম্বিতে উঠে দাঁড়ান প্রধানমন্ত্রী, 'আমার মনে হয় আমাকে এখন যেতে হবে। যা হোক, একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ রাখবেন না : আপনার দেশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অটুট।'

'না, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, স্যার।'

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে জনসন লক্ষ করে তখনো কিছু দর্শনার্থী বসে আছে, কেউ কেউ ঝিমায়। তার মনে হয় বাকি দুটো দলের আত্মসমর্পণের বার্তা নিয়ে আসা দূতরাও হয়তো এদের মাঝেই বসে ঝিমাচ্ছে।

ট্যাক্সির কাছে পৌঁছে সে ঘড়ি দেখে—রাত সোয়া দুটা। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দেখে, রাত্রির শীতল তাজা বাতাস বুক ভরে টেনে নেয়। তখন সে সহসা তার ভেতর ক্ষীণ একটি হতাশার রেশ টের পায়। অত্যন্ত দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ সমাজতন্ত্রবিরোধী এই প্রধানমন্ত্রী কি তাকে হতাশ করেছেন? সেটা একটা কারণ হতেই পারে; কিন্তু সে এও মানে, এ জন্য হতাশ হওয়ার কোনো মানে নেই। এমনকি প্রধানমন্ত্রী যদি এমন নির্দয়ভাবে তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হয়েও থাকেন, তার কাছে তা তিনি প্রকাশ করতে যাবেন কেন? প্রধানমন্ত্রী তো মনে করেন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কৌশলগত কারণেই দেওয়া হয়, এ জন্য দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তা ভঙ্গ করা যেতে পারে। না, এ হতাশার কোনো অর্থ নেই। তবু জনসন মনে না করে পারে না, কোনো প্রতিশ্রুতির প্রতিই এ প্রধানমন্ত্রীর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এমন একজনের ওপর কি আস্থা রাখা চলে?

না, এ শুধুই কষ্টকল্পনা—জনসন নিজেকে প্রবোধ দিয়ে অপেক্ষমাণ উৎসুক চালকের দিকে চেয়ে হেসে গাড়িতে ওঠে। তাছাড়া স্বীকার করতেই হবে যতই নীতিগর্হিত হোক না কেন প্রধানমন্ত্রী এরকম করে ভালোই করেছেন, তার দেশ আমাদের পক্ষে থেকে গেছে।

তখন তার মনে পড়ে তার বসের কথা, যিনি পুরোদস্তুর বিশ্বাস করেন, রাজনীতি ও আদর্শের সহাবস্থান সম্ভব। তারপর ট্যাক্সি কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সে নিজেকে বলে—না, আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। সে পিছনে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ মুছে সশব্দে বলে, 'আজ রাতে খুব ঘুম পাচ্ছে।'

ট্যাক্সিচালক এক্সেলেটর চেপে ধরে।

পঞ্চম অধ্যায়

১

'অ্যামেরিকান ফ্রেন্ডস অব দ্য ইস্ট'-এর স্থানীয় প্রতিনিধি উইলিয়াম অ্যান্ডারসনের গুছিয়ে কাজ করার স্বভাব। ঠাণ্ডা মাথায় লক্ষ্য স্থির করেন তিনি, বহু কাজ এক সঙ্গে করতে গিয়ে যাতে তালগোল না পাকিয়ে যায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এ ছাড়া তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজনই লোক বরাদ্দ পাওয়ায় তাঁর বিশেষ উপায়ান্তর নেই, তাঁর উচ্চাভিলাষী বহু পরিকল্পনা এ কারণে দেরাজবন্ধ হয়ে আছে। এ নিয়ে হেড অফিসে বহুবার অভিযোগ দাখিল করেছেন, কিন্তু নর্থ ড্যাকোটার জেমসটাউন-নিবাসী সৌম্যদর্শন সদালাপী এক সচিবের বাইরে তাঁর কর্মচারীর আর একটিও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেনি। অবশ্য ঝিমানোর ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজি শেখা এবং নিত্য শুকিয়ে আসা ঠোঁট ভেজাতে কোকাকোলা পান করার লোভে ফাই-ফরমাশ খাটার চাকরিতে ঢুকেছে যে ছেলেটা, তাকেও নিশ্চয়ই কর্মচারী হিসেবে গণনায় নেওয়া চলে না। অ্যান্ডারসনের স্ত্রী রুথের ইচ্ছা ছিল এটা-ওটা সাহায্য করে, কিন্তু তিন সন্তান সামলাতে তা আর হয়ে ওঠে না। রুথের অনুযোগ, স্থানীয় আয়ার পাড়াবেড়ানি বাতিক আছে, গৃহকর্ত্রী অন্যমনস্ক হতেই ছোট শিশুটিকে নিয়ে হাওয়া হয়। শিশুদের একদম দৃষ্টির আড়াল করে থাকতে পারে না রুথ।

অ্যান্ডারসনের মধ্যে স্বভাবসুলভ সৌজন্যবোধ ও সদাশয় মনোভাব বিদ্যমান, এ জন্য মানুষজনের সঙ্গে অনায়াসে মিশতে পারেন। তবে তাঁর কাজের কারণে সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হওয়া বিশেষ কিছু লোককে ভালো না লাগায় সময় সময় অসহায় বোধ করেন। অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাব প্রকাশ না করার ব্যাপারেও তিনি সদা সতর্কতা অবলম্বন করেন।

তিন ধরনের মানুষ তাঁর অপছন্দ। কিছুকাল প্রাচ্যে কাটানোর পর এখন তাঁর মনে হয়, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যে কোনো দেশে এ তিন পদের মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে। বস্তুত এরা বিদেশী শাসনের প্রত্যক্ষ ফসল।

প্রথম জাতের মানুষজন হলো পশ্চিমা মনমানসিকতা-গ্রহণকারী নেটিভ, সৌভাগ্যবশত সংখ্যায় এরা নগণ্য। নিজের চারপাশের প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা এমন এক খোলসের মধ্যে বসবাস করে, যার বহিরঙ্গের সঙ্গে যে কোনো পশ্চিমা সমাজের সাদৃশ্য বেশি। দেশের মাটির সঙ্গে তাদের শেকড়ের সংযোগ তারা নিজেরাই কেটে দেয়, নতুবা বিশেষ যত্নে ফোটানো আমদানিকৃত ফুলে এ শেকড় আড়াল করে রাখে। সে মহলে তাদের নিজস্ব প্রাচীন সংস্কৃতি ও

ঐতিহ্যের সাক্ষ্যবহনকারী কোনো বস্তু আদৌ পাওয়া গেলে তা দেখে মনে হবে, বিশ্ব চষে ফেরা কোনো পশ্চিমা লোকের ঘরের শো-কেসে রাখা শোভাবর্ধনকারী দুর্লভ বিদেশী বস্তু যেন।

একদা যা কিছু তাদের নিজস্ব ছিল, তা পরিত্যাগ করে এসব লোক অপর এক সংস্কৃতি, অন্য এক জীবনপ্রণালী গ্রহণ করেছে। নিজেদের অতীত মুছে ফেলা বা অচেনা জীবন বেছে নেওয়ার কারণে এদের যে বিশেষ সন্তাপ জাগে তা নয়, বরং কী এক জোয়ারের স্রোতে ভেসে যেতে পেরে এরা যেন সুখীই। তবু অ্যান্ডারসনের চোখে এরা এক মেরুদণ্ডহীন ও শোচনীয় পরিহাসের বস্তু। তাদের মধ্যে অ্যান্ডারসন এমন এক সকরুণ পরাজয়বাদী মানসিকতা আবিষ্কার করেন, শত্রুর বিউগলের প্রথম সুর কানে আসতেই যে মন আত্মসমর্পণ করে। তাদের ওপর ক্রোধ জাগ্রত হলে অ্যান্ডারসন তাদের জীবনযাত্রা বর্ণনা করার ভিন্ন একটি উপায় বের করেন। এরা হলো মাচায় বানানো ঘরের বাসিন্দা, যে মাটি থেকে তারা ওপরে উঠেছে, সেই মাটিতে নাবতে তাদের ভয়। এই বর্ণনা তার মনে এক নির্মম কিন্তু যথার্থ ভাবনার উদ্রেক করে : বানরেরা বৃক্ষ থেকে মাটিতে নেবে মানুষে পরিণত হয়েছে। আর এর বিপরীত কাজটি করে এরা ফিরে গেছে আদিমতায়।

এ জাতটি অবশ্য এক প্রজন্মে নয়, বহু প্রজন্মে সৃষ্টি হয়েছে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে যখন প্রথম সংস্পর্শ ঘটে, সেই থেকে এর শুরু। প্রথমে তারা উপনিবেশী শাসকদের ভাষার দরকারি অংশগুলি শেখে, গায়ে চাপায় তাদের এটা-সেটা বস্ত্র , টুকিটাকি আসবাব ঘরে ঢোকায়। তারপর যত সময় যায় এরা তত অনুধাবন করে, তাদের টিকে থাকা নির্ভর করছে প্রভুর জীবনযাত্রা পরিপূর্ণভাবে অনুকরণ করার ওপর, তখন তাদের সম্পূর্ণ ভাষা, তাদের ওয়্যারড্রোব, তাদের শৌখিনতা এমনকি তাদের স্বপ্নগুলিও ঠিক যেন উপনিবেশী শাসকদের মতো হয়ে যায়।

এ ভেক পরিবর্তনে তাদের সাহায্য করে শাসকদের সুদক্ষ বেনিয়ারা। তারা দেখে, যেসব জিনিস উপনিবেশ শাসকদের জীবনযাত্রা অনায়াস, উৎকৃষ্ট কিংবা ভিন্নধর্মী করেছে তার সব কিছু তারা পেতে পারে মাত্র তারা যদি এর দাম দিতে পারে : দম আটকানো কড়া মাড় দেয়া শার্টের কলার থেকে শুরু করে জৌলুশের বাহন রোলস রয়েস কিংবা মাথার লম্বা হ্যাট থেকে শুরু করে তাদের রাজকীয় তৃষ্ণানিবারক পানীয় পর্যন্ত সবকিছু। এমনকি পশ্চিমের সমস্ত প্রজ্ঞা বহনকারী গ্রন্থসমূহও।

এরা কেবল একটি বস্তু চাইতে পারে না : মুক্তি। অ্যান্ডারসনের মতে, দীর্ঘকাল এ জরুরি বস্তুটি না পেয়ে এরা শেষ পর্যন্ত সেসব আদর্শ গ্রহণের ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছে, যেসব আদর্শ তিনি এখানে প্রচার করতে এসেছেন। নিঃসন্দেহে এরাই এ দেশের এলিট শ্রেণী। দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগণ পথের দিশা পেতে এদের দিকেই উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু তা দেওয়ার ক্ষমতা এদের থাকে না। নিজেদের খোলসে বদ্ধ থেকে এরা দেশের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন এক অলীক ও প্রাণস্পন্দনহীন জীবন যাপন করে। মৃত আত্মায় এরা পশ্চিমের বাইরের রূপটিই দেখতে পায় শুধু, যেসব আদর্শ পশ্চিমকে অত্যাশ্চর্য গতি এনে দিয়েছে, তা আর দেখে না। অ্যান্ডারসন জানেন, এদের বাইরের হাবভাবে অধিকাংশ মার্কিনিই ধোঁকা খায়; তারা ভাবে, এরা নিরাপদই হবে হয়তো। কিন্তু এরা যে প্রকৃতপক্ষে ভয়ঙ্কর, এ ব্যাপারে অ্যান্ডারসন নিঃসন্দেহ। এসব অতি চমৎকার দম দেওয়া পুতুলে কিছুটা ভাঁড়ামির ভাব থাকলে কত চেনা চেনা মনে হয় এদের, মনে হয় এদের বশ করা কতই না সহজ। কিন্তু বস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবাদর্শ প্রচারে এখানে এরাই সবচেয়ে বড় বাধা। যার আত্মা নেই, সে অন্যের ভালো-মন্দের পরিচয় কী পাবে! আরো খারাপ যেটা, এ দেশে কারো যেন এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। একদিন আহসান নামে এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কথা বলেছিলেন অ্যান্ডারসন। লোকটাকে তিনি

উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী ও জাতীয়তাবাদী গণ্য করতেন। কিন্তু ওই শিক্ষক জবাবে বলেছিলেন, 'ইতিহাসে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এমনটাই হয়েছে। প্রথমে ভাঁড়ের মতো অনুকরণ, তারপর দেখবেন সেখান থেকেই একটি নতুন সংস্কৃতি পুষ্পিত হচ্ছে। সে অর্থে এদের নিয়ে আমার কোনো উদ্বেগ নেই।' অ্যান্ডারসন এদের মধ্য থেকে কিছু পুষ্পিত হওয়ার দৃশ্য কল্পনা করতে ব্যর্থ হন।

দ্বিতীয় যে ধরনের লোক অ্যান্ডারসনের অপছন্দ, তারা পশ্চিমের চেয়েও উৎকৃষ্ট মনে করে নিজেদের, এরা যেন বুঝে ফেলেছে পশ্চিমের বাইরেটা যতই জেল্লাদার হোক, অন্তরে তা ফাঁপা। এ যেন এমন এক কাঠামো, যার কোনো আঁটসাঁট বাঁধুনি নেই, এ জন্য একদিন না একদিন তা ভোগবাদিতার সর্বগ্রাসী বানের টানে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। এ ধাঁচের লোকেরা সেই নিয়তিনির্ধারিত দিনটির জন্য নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকে যেদিন তারা বিজয়ীর বেশে আবির্ভূত হবে এবং যা কিছু অধ্যাত্মবাদকে পরিপুষ্ট করে তার পতাকা উচ্চে তুলে ধরবে। তারা মনে করে, কেবল প্রাচ্যই এ অধ্যাত্মবাদের ধারক। এ মনোভাবের উৎস অ্যান্ডারসনের জানা নেই, তবে তাঁর সন্দেহ, এও পশ্চিমেরই সৃষ্টি। হয়তো এর ইতিহাস সেই শিল্পবিপ্লবের সময়কার, যখন এ বিপ্লবের কারণে প্রাথমিক অবস্থায় সৃষ্ট নৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা পশ্চিমের অনেককে ভীষণ চিন্তিত ও বিহ্বল করে তুলেছিল। পরিণাম-শঙ্কায় তারা পুরনো সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়া রোধের একটা সুরাহা সন্ধান করতে থাকে এবং প্রাচ্যে খুঁজে পায় আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। তারা মনে করে, এ মূল্যবোধ গ্রহণ করলেই হয়তো তাদের নিস্তার। এদিকে প্রাচ্যে যারা অধীনতার কারণে নিঃস্ব বোধ করে, পশ্চিমের যন্ত্রসভ্যতার সুফল-ভোগকারীদের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব অনুভব করে, তারা এ চিন্তাকে স্বাগতম জানায়। আরেকটি কারণে অ্যান্ডারসন শ্রেষ্ঠত্বের গর্বধারী এ গোষ্ঠীকে ঘৃণা করেন, সুযোগ পেলে এরা পশ্চিমা ভোগবাদী সমাজের সব সুযোগ-সুবিধা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

তৃতীয় ধরনের গোষ্ঠীটিকে অ্যান্ডারসন অপছন্দ করার চেয়ে বরং করুণাই করেন। এদের যৌবনকাল পেরিয়ে গেছে, জীবনের একটা বড় সময় এদের চলে গেছে বিদেশী শাসকদের সেবায়। কেবল একটি জিনিসই তারা শিখেছে, বিনাপ্রশ্নে প্রভুর নির্দেশ পালন। এরা কোনোদিন কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না, সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করে। পবিত্রতম যে বস্তুটিকে তারা ভয় পেতে শিখেছে, তা হলো শাসকের শৌর্য। বস্তুটিকে তারা এতই ভয় করে যে, দাসত্বের শর্তে এ শৌর্যের ছায়াতলে নিত্যনির্ভরতা সন্ধান করে। অ্যান্ডারসন জানেন, সদ্যস্বাধীন এ দেশটিতে আজ যারা প্রশাসন চালাচ্ছে, তারা মূলত এই তৃতীয় ধাঁচের লোক। শীঘ্র তিনি লক্ষ করেন, পশ্চিমের বিভিন্ন জাতিসত্তা এদের চোখে আলাদা না হলেও মার্কিনিদের তারা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। একজন মার্কিনির যে কোনো উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার অফিসে অনায়াসে ঢুকে পড়তে বাধা নেই, ঢুকলেই তৎক্ষণাৎ মনোযোগ, সম্মান ও সবধরনের সহযোগিতা তার জন্য বরাদ্দ হয়। তার দাবি বা প্রস্তাবের যথার্থতা কারো কাছে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। অ্যান্ডারসন অনুভব করেন, এ মনোভাবের কারণে তার কাজকর্ম বেশ সহজ হয়ে এসেছে এবং এ কারণেই তার মিশনের ধার ক্ষয়ে গেছে। আপনি একটা বাড়ি চান, মি. অ্যান্ডারসন? এখানে তো এখন ভীষণ গৃহায়ণ সমস্যা, কিন্তু আপনার জন্য কী করা যায়, আমরা দেখব। পরদিন সুদৃশ্য কোনো বাংলো প্রস্তুত। বই ছাপতে সমস্যা হচ্ছে? ও হ্যাঁ, আসলে সবগুলি প্রেসে কাজের চাপ। তবে হয়তো এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করা সম্ভব। সরকারের নিজস্ব প্রিন্টিং প্রেস তার কাজের জন্য বরাদ্দ হয়ে গেল। অ্যান্ডারসনের মনে পড়ে, একটি নির্দিষ্ট বই পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানের কাছে। প্রস্তাবটি সরাসরি জানানোর আগে বিস্তর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন তিনি। বইটি খোলামেলা রুশবিরোধী বলে তাঁর সন্দেহ ছিল

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ প্রস্তাব গ্রহণ করবে কিনা। শেষে কথাটা পাড়তেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বললেন, এর জন্য এত বড় গৌরচন্দ্রিকায় তিনি বিস্মিত হয়েছেন, এ তো সামান্য ব্যাপার। তিনি বলেন, দেখুন এটা করা কোনো কঠিন কাজই না। সত্যি বলতে কী, প্রস্তাবটা আমার মনে ধরেছে। বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের অধিকাংশ পরিচালকই যে বইটি পছন্দ করবে এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। বইটি পাঠ্যসূচিতে স্থান পেল। বারো জন পরিচালকের মধ্যে মাত্র দু জন মৃদু আপত্তি তুলে বলেছিল, এ জাতীয় বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি ঢুকে পড়বে।

এখানে আসার এক মাসের মাথায় অ্যান্ডারসন বস্টনে তাঁর বসকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, 'এরা চমৎকার মানুষ, অতিশয় সদাশয় ও সহায়ক। তাছাড়া তারা আমাদের মার্কিনিদের খুবই পছন্দ করে।' পরে এ কথা লেখার জন্য তার অনুতাপ হয়। কেননা এরপর এ দেশে তার সব সাফল্য তার বসের চোখে ম্লান হয়ে পড়ে এবং তহবিল ও কর্মচারীসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে তার ঘন ঘন তাগাদা এড়িয়ে যাওয়া হয়।

২

জনসন বলে, 'এমন দাস-মনোবৃত্তির কারো সম্পর্কে শ্রদ্ধা রাখা কঠিনই বটে। তবে আমি নিশ্চিত এতে করে এখানে আপনার কাজ হাসিল হয়।'

উত্তর না দিয়ে অ্যান্ডারসন ধীরে সুস্থে একটি সিগারেট ধরান। তারপর বলেন, 'স্বীকার করছি, এখানে আমার কাজটা সহজ। আমি অঢেল সহযোগিতা পাই। কিন্তু আমি জানি না এতে আমি তুষ্ট কিনা।'

'হয়তো কাজটা আরেকটু কঠিন হলে আপনার ভালো লাগত।'

'না, তা নয়। যেসব লোকের সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হয়, তাদের আমার অবাস্তব মনে হয়। গ্রামের সাধারণ মানুষজনের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে পারলে হয়তো ভালো লাগত। কিন্তু মুশকিল হলো, তাদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। ভাষার সমস্যার কথা বলছি না, যে কেউ যে কোনো ভাষা শিখে নিতে পারে। আসলে ওরা তো অন্য এক যুগে, অন্য এক জগতে বাস করে।'

'এ দেশে এ বিষয়ে কিছু করার নেই, তাই না?' সান্ত্বনার সুরে বলে জনসন।

'আমি জানি', অ্যান্ডারসন বলেন, তারপর মাথা নাড়েন। 'না, আমার মনে হচ্ছে, আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারিনি। দেখুন, আমাদের দেশ এখানে প্রচুর অর্থ ঢালে। সেটার পরিমাণ কত, সে অর্থ কীভাবে ব্যয় হয়—সে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি এও চাই না, এরা আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুক, কিংবা আমাদের পরাশক্তি মানুক। আমি শুধু চাই আমাদের ভেতরের সত্তাটা এরা কিছুটা হলেও বুঝুক, অন্তর দিয়ে অনুধাবন করুক।'

জনসন ঈষৎ বিস্মিত চোখে তাকে দেখে। সহসা সে টের পায়, অ্যান্ডারসনের এ মাংসল পরিপাটি মসৃণ মুখমণ্ডল ও চশমাঢাকা চোখের পেছনে মিশনারির এক সর্বস্বত্যাগী প্রেরণা কাজ করছে। অ্যান্ডারসনের সংগঠনের কী কাজ, এর তহবিল কীভাবে কাদের কাছ থেকে আসে সে সম্পর্কে জনসন খানিকটা অবগত। এ সংগঠনের এক ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একদা তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু কখনোই তার মনে হয়নি, এ সংগঠনে কর্মরত লোকজনের কেউ কেউ কেবল চৌকস ও চতুর কর্মচারী হওয়ার সীমানা ডিঙিয়ে যেতে পারে। নিঃসন্দেহে এ সংগঠনের অনেকে একটি আদর্শের পেছনে জীবন উৎসর্গ করেছে। স্যামুয়েল কনডনের কথা ভাবে সে,

একজন সফল, চোখ-কান খোলা কূটনীতিক, সেও মনেপ্রাণে কাজ করে, যে দেশে তার চাকরি, সদাসর্বদা সে দেশের নানা দুরূহ জটিলতা ও অন্তঃপ্রবাহ বোঝার চেষ্টা করে। তবু তার কাজে যান্ত্রিকতা রয়েছে, যেখানেই তার কর্মস্থল হোক, নির্দিষ্ট ছক মেনে চলতে হয় তাকে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়ার সময় সে তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মকৌশল সঙ্গে বয়ে নিয়ে যায়, হয়তো কোনো দেশই তার কাছে পৃথক গুরুত্ব বহন করে না। কোনো দেশে হয়তো বেশি কর্মদক্ষতা দেখাতে হয়, কোথাও কম। কিন্তু এত যে পরিসংখ্যান তার জমছে, কোনো মিশন তবু তার নেই, কোনো দেশ তার অন্তর স্পর্শ করে না, কোথাও কোনো জেদ তাকে চেপে ধরেনি। এদিকে অ্যান্ডারসন যেন এ যুগের মিশনারি, রাজনৈতিক মিশনারি। নিজ দেশ থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন পশ্চাৎপদ মানুষজনকে ধর্মান্তরিত করতে নয়, এক নতুন রাজনৈতিক ধারণায় দীক্ষিত করতে—সেই ধারণার নাম গণতন্ত্র। সম্পূর্ণ নতুন একটি শ্রেণী যেন এই অ্যান্ডরসনদের।

এতক্ষণ নিশ্চুপ বসেছিলেন অ্যান্ডারসনের স্ত্রী রুথ। এবার তিনি বলেন, 'টেডকে নিয়ে সমস্যা হলো। ও যেখানেই যায়, সেখানেই লোকজনকে ভালোবাসার চেষ্টা করে। কিন্তু এখানে কাউকে পছন্দ করাই ওর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।'

স্ত্রী যেন তার যন্ত্রণার মর্মস্থলে আঘাত করেছে, অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অ্যান্ডারসন, 'কী করে পছন্দ করি? মাঝে মাঝে তো মনে হয় এরা আমাকে অসুস্থ করে ফেলবে। আমি বলছি, এদের যে কাউকে যে কোনো সময় কিনে ফেলা যায়। কখনো একটা রেফ্রিজারেটর কিংবা একটা টেপরেকর্ডার বা এমনকি ভাগ্নেকে স্টেটসে পাঠানোর কথাতেও কাজ হয়ে যায়।'

এমন বিক্ষোভে রুথকে ঈষৎ বিচলিত মনে হয়। জনসনের দিকে ফিরে সে বলে, 'পছন্দ করুক না করুক, ও কিন্তু এদের জন্য জান দিয়ে খাটে। এদের জন্য অনেক করেছে ও, এখন ওর যা দরকার তা হলো ছুটি।'

অ্যান্ডারসন সহসা মৃদু হাসেন, 'হ্যাঁ, আমি বিরতি দিলেই পারি।'

কয়েক মুহূর্ত তিনজন নীরব থাকে।

নিজের কাজের উদ্দেশ্য বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারে না জনসন।

'বেশ কিছুদিন ধরে এখানে একটা অনিশ্চয়তার ভাব লক্ষ করেছেন?' সে জিজ্ঞেস করে।

'কই, না তো। আমি তো মনে করি না এ দেশ নিরপেক্ষতাবাদী হয়ে উঠবে।'

'আবদুল কাদেরের সঙ্গে ওর ভালো জানাশোনা।' রুথ জানায়।

'সংসদে যখন সামান্য এক সদস্য ছিল সে অবস্থা থেকে আমি তাকে জানি। ওর চিন্তা ও মনোভাব আমার জানা। হয়তো এ কারণে আমি মনে করি না, এখান থেকে আমাদের পাততাড়ি গোটাতে হবে। তবে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর হঠাৎ একটা ব্যাপার বুঝতে পারি। আমরা যা-ই করি না কেন, এশীয় দেশগুলিতে আমাদের অবস্থান আসলে বালির বাঁধ, এক মুহূর্তে আমরা ধসে পড়তে পারি। এতকাল ভাবতাম কোনো লক্ষ্যে তীর ছুড়ছি; এখন দেখছি লক্ষ্য নেই, তীর বিঁধছে হাওয়ায়।'

'ওর আসলে ছুটি দরকার।' আবার বলে রুথ, স্বামীর ভাবগতিকে তাকে ঈষৎ চিন্তিত মনে হয় যেন-বা।

জনসনের মনে পড়ে যায় স্যামুয়েল কনডন তাকে কী বলেছিল, 'তুমি কি জানো এ নির্বাচন ছেলেখেলার মতো হয়েছে। জনগণের প্রকৃত মতামত এতে প্রতিফলিত হয়নি।'

অ্যান্ডারসন বলেন, 'জনগণ বলতে আসলে কী বোঝায়, তা আমার মাথায় ঢোকে না।' কয়েক মুহূর্ত গভীর চিন্তায় ডুবে যান তিনি। তারপর আচম্বিতে বলে ওঠেন, 'আসলে কী জানো, আমার মনে হয় আবদুল কাদের তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকলেই ভালো হতো।'

জনসন ভ্রূ-কুঞ্চিত করে, 'সেটা করার কোনো কারণ নেই। নিরপেক্ষতাবাদে কখনোই তার বিশ্বাস ছিল না।'

'ওখানেই তো সমস্যা। আমার মনে হচ্ছে, যে দেশ আমাদের দেখতে হচ্ছে তার মুখে একটা মুখোশ পরানো। নানাভির সময় আমরা এই নষ্ট চেহারা দেখেছি। আবদুল কাদেরের আমলেও তা-ই দেখে যাব। এতে আমাদের কোনো ফায়দা নেই।'

জনসনের ভ্রূ পূর্ববৎ কুঞ্চিত হয়। 'এখন আমরা আবদুল কাদেরকে আমাদের মিত্র পেয়েছি। আমরা মনে করি সবকিছু ঠিকঠাক আছে। মুখোশের আড়ালের আসল চেহারাটা দেখার চেষ্টা আমাদের না করাই শ্রেয়।'

'সেই আসল চেহারাটা কেমন মনে হয় আপনার?'

'জানি না, এ কারণেই ওতে আমার ভয়। দেখলেই হয়তো ভালো হতো। চেহারাটা কুৎসিত হলে কিছু একটা বন্দোবস্ত করা যেত। কেউ শত্রু হলেও সশরীরে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে আমি ভয় পাই না।'

'এ সূত্রে একজনের কথা মনে পড়ল', জনসন বলে। 'আপনি কি আহসান নামে কাউকে চেনেন।'

অ্যান্ডারসনের চোখে ক্ষীণ ছায়া পড়ে। 'চিনি। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই কয়েক মাস হয়ে গেল।'

রুথ হেসে বলে, 'স্টেটস সফরের আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেওয়ার পর থেকে টেড ওর সঙ্গে আর দেখা করেনি।'

অ্যান্ডারসন ঈষৎ লাল হয়ে ওঠেন। 'আসল কথা কী, দেখা করার সময় পাই না।'

'আপনি হয়তো এমন কারো পাল্লায় পড়েছেন, যাকে কেনা সম্ভব নয়।' ঠাট্টার সুরে বলে জনসন। 'লোকটি হয়তো সৎ।'

পরিহাসের হাসি হাসতে গিয়ে মুখ বেঁকে যায় অ্যান্ডাসনের। 'সৎ? আরে এর ব্যাপারে তো আশাই ছেড়ে দিয়েছি। এখন যা করা সম্ভব তা হলো একে কোথাও আটকে রাখা, যাতে কাউকে সে আর বিপথগামী করতে না পারে। ভেবেছে, ওকে কেনার চেষ্টা করেছি। আমি কাউকে কিনতে চাই না। আমি শুধু চেয়েছি, লোকটি স্বচক্ষে দেখে আসুক আমাদের দেশটি কেমন। ব্যস, এটুকুই তো।'

'লোকটি যা শুনিয়ে দিয়েছে তাতে টেডের গায়ে ছ্যাঁকা পড়েছে। বলেছে, সে জানে আমাদের দেশের লোককে তার ভালো লাগবে। তাতে ওর আগ্রহ নেই। তার এ দেশে আমরা কী করছি, এ নিয়েই তার আগ্রহ।'

'লোকটি একেবারে গেছে', অ্যান্ডারসন আবার বলেন, 'তুমি জানতে চেয়েছ কেন কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে, অন্যেরা মেলাচ্ছে না, কেন আমাদের পক্ষের লোকজন মাঝে মাঝে পক্ষত্যাগ করে। তাকে দিয়ে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাবে না।'

জনসন হতাশ হয়। এ দেশ ছাড়ার আগে আহসানের সঙ্গে দেখা করে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে। এত দূর দেশ থেকে এখানে আসা তার সার্থকই মনে হচ্ছিল। ইতিমধ্যে বহুজনের সঙ্গে দেখা করেছে সে। কিন্তু মতের অমিল হয় এমন কারো সঙ্গে এখনো তার সাক্ষাৎ হয়নি। গত কয়েক দিনে সে যা দেখেছে, তা যদি কোনো মুখোশ হয়েও থাকে, সে মুখোশ ছেদ করার চেষ্টা সে করেনি।

আহসানের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলে সে। অবশ্য অ্যান্ডারসনকে এ ব্যাপারে কিছু বলে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১

লাল পর্দা সরিয়ে গোলগাল স্বাস্থ্যের ছোটখাটো ভদ্রলোক জনসনের দিকে তাকান। প্রসারিত চোখে ক্ষীণ হাসির রেশ মেখে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'মি. জনসন? ভেতরে আসুন।'

প্রায় ফাঁকা কিন্তু পরিচ্ছন্ন একটি কক্ষে বসে তাঁরা সহজ ভঙ্গিতে একে অপরের দিকে তাকান। তারপর জনসন বলে, 'আপনার সম্পর্কে অনেক শুনেছি। ভাবলাম, দেখা করে যাই।'

সোজা হয়ে বসলে কোনোমতে গালিচা পর্যন্ত পা ছোঁয় আহসান সাহেবের। আমুদে হাসি হেসে তিনি বলেন, 'আপনি দেখা করতে এসেছেন, খুব খুশি হয়েছি। কোনো আমেরিকান দেখা করতে এলে আমার স্বাধীনতার বিষয়টি প্রতিবার নবায়ন হয়। এ জন্য এরা আসা বন্ধ করলে ঘাবড়ে যাই।'

'ও, তাই নাকি?' বিস্মিত চোখে বলে জনসন।

'হ্যাঁ, আমার কাছে তো এরা একেকটা অরণ্যের মুক্তবিহঙ্গ। পাখি যখন অনায়াসে যায়-আসে, কিচিরমিচির করে, আমি টের পাই, আশপাশে বিপজ্জনক জন্তুজানোয়ার নেই। মাসখানেক হয়ে গেল কোনো আমেরিকান আমার সঙ্গে দেখা করেননি।'

জনসন একটি সিগারেট জ্বালিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে, 'আমেরিকানরা আপনার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করল কেন?'

'সে কথা কি আর আমি জানি', বলতে গিয়ে চোখ পিটপিট করে আহসানের। তারপর যেন এক অনুমানের সঙ্গে ঠোক্কর খান। 'হয়তো আমার ব্যাপারে তাদের বিরক্তি এসে থাকবে। একই কথা বারবার বলে যাওয়ার এক অসীম ক্ষমতা আছে আমার। আপনারা সভ্য দেশের মানুষ। সভ্য লোকের অল্পেই বিরক্তি ধরে।'

'কিংবা এমনও তো হতে পারে, ওরা আপনার বক্তব্য অপছন্দ করে।'

'ওহ্, তাহলে আমার সম্পর্কে ওরা আপনাকে সবই বলে দিয়েছে দেখছি।'

যে রসিকতার সুরে তারা আলাপ শুরু করেছিল, তা যেন বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না : জনসন নিজেই তার অবসান ঘটায়। প্রথমে সে তার সাপ্তাহিক পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা

করে, তারপর সরাসরি আহসানের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি জানি না আপনি আসলে কী, তবে কেউ কেউ আপনাকে কমিউনিস্ট মনে করে। হয়তো আপনি কট্টর কোনো জাতীয়তাবাদী ছাড়া কিছু নন। হতে পারে আমাদের লোকজন আপনাকে ভুল বুঝেছে, তারপর নিজেদের ভুল শুধরে না নিয়ে উল্টো আপনার ক্ষোভের ভুল অর্থ করে যাচ্ছে। এমন হলে মোটেও অবাক হব না। আমি আপনাকে যা মনে করি আপনি যদি তাই হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের মধ্যে একটি খোলামেলা আলাপ হওয়া প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যদি এ দেশের উপকারী মিত্র হতে হয়, তাহলে তাকে আপনাদের মতো লোকদের বুঝতে হবে। যা হোক, আমি খোলা মনে আপনার কাছে এসেছি।'

'সোজাসুজি কথা। আমি বুঝি, মার্কিনিদের ভুল বোঝা হলে তারা কেন রেগে যায়।' প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন আহসান। 'তাহলে জানতে চান, আপনি যা মনে করেন আমি আসলে তাই কিনা? সত্যি বলতে কি আমি একজন জাতীয়তাবাদী। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি এবং এ দেশে সত্যিকারের স্বাধীনতা চাই। কথাটির মানে, এ দেশকে বিদেশী হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে।'

'বলে যান।'

'আমি এ তত্ত্ব ভালো করেই জানি, আজকের দিনে কোনো ক্ষুদ্র পশ্চাৎপদ দেশ সত্যিকার অর্থে স্বাধীন থাকতে পারে না। বিশ্বপরিস্থিতি তা হতে দেয় না। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি আমি মানি না।'

'আমি বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে', জনসন সাবধানী কণ্ঠে বলে। 'কিন্তু বিশ্বজুড়ে একটি বড় লড়াই চলছে। আপনার-আমার চিন্তা যদি অভিন্ন হয়, তাহলে আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করছি না কেন?'

'আমাদের জাতীয় সমস্যা এমন পাহাড়প্রমাণ যে অন্যদিকে নজর দেওয়ার সময় ও সামর্থ্য কিছুই আমাদের নেই। আপনাদের যদি কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যা থেকে থাকে, আপনারা সেটি আমাদের দেশে টেনে না এনে অন্য কোথাও গিয়ে নিষ্পত্তি করুন না কেন।'

'আপনার জাতীয়তাবাদ আসলে একপ্রকার নিঃসঙ্গতাবাদ। আপনি কি একে বাস্তবসম্মত মনে করেন?'

'আমাদের ভিন্ন কোনো উপায় নেই।'

'তাহলে বলতে হয়, আপনি একজন ভাববাদী। এমন এক ভাববাদী যিনি আন্তর্জাতিক বিপদ-আপদ থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে চান। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আপনার ধারণা আরেকটু বুঝিয়ে বলুন দেখি আমাকে।'

'যেমন আপনার মর্জি।' আহসান শান্তভাবে বলেন, 'আপনার ও আমার দেশের মধ্যে সহযোগিতার ব্যাপারে আমার জাতীয়তাবাদ আপত্তি তুলবে আরেকটি কারণে। এ সহযোগিতার পেছনে যে উদ্দেশ্য, সেটির ব্যাপারে আমার গভীর আপত্তি আছে। কেননা, আমাদের সাহায্য করা এর উদ্দেশ্য নয়, এর মূল উদ্দেশ্য সমাজতন্ত্র প্রতিরোধ করা।'

'এই তো ব্যাপারটি খোলাসা হচ্ছে।' জনসন প্রসন্নভাবে ঘোষণা করে, 'আপনি তাহলে সমাজতন্ত্রকে প্রতিরোধের প্রয়োজন বোধ করেন না?'

'এটি আমাদের কাছে মূল সমস্যা নয়। আমাদের দেশ খুব গরিব। আপনাদের ভয় ও সংকটের কারণে আমরা কোণঠাসা হয়ে থাকতে পারি না।'

শিক্ষককে সরাসরি একটি প্রশ্ন করে বসবে কিনা মনে মনে দ্বিধায় ভুগছিল জনসন। খামোখা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে থাকার কোনো মানে হয় না।

'একটি কথা খোলাখুলি বলুন তো', হঠাৎ সে দৃঢ়ভাবে বলে ওঠে। 'আপনি কি কমিউনিস্ট? যদি তা হন, সে ক্ষেত্রে এ সাক্ষাৎকার দীর্ঘ করে লাভ নেই। কমিউনিস্টদের সব যুক্তিতর্ক আমার মুখস্থ।'

আহসান সহসা হাসিতে ফেটে পড়েন, তিনি খুব আমোদ পেয়েছেন, 'আমি জানতাম এ প্রশ্ন আসবে। মার্কিনিরা আমাকে সব সময় এ প্রশ্ন করে যাচ্ছে।'

'তাদের কী বলেন?'

'বলি, আমি কমিউনিস্ট নই। তবে সেই সঙ্গে আরেকটি কথাও বলি। বলি যে, দুনিয়াকে সাদা ও কালোয় চট করে ভাগ করে ফেলার পক্ষপাতী আমি নই। এ জন্য সমাজতন্ত্র বিষয়ে পড়াশোনা করতে আমার আপত্তি নেই। আমি খুঁজে দেখার চেষ্টা করি সেখানে পশ্চাৎপদ দেশের উপকৃত হওয়ার মতো কিছু আছে কিনা। আমি সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক তত্ত্বের ব্যাপারে অবশ্যই আগ্রহী।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা নেবে আসে। সহসা জনসনের চেহারায় যেন আশাভঙ্গের চিহ্ন ফুটে ওঠে। বস্তুত সে ভেবেছিল, আহসান হয়তো এমন এক জেদি জাতীয়তাবাদী হয়ে থাকবেন, যিনি পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে কাজ করার ক্ষেত্রে জড়তা ও কল্পনাশক্তিহীনতার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এক বিপজ্জনক মতাদর্শ বিবেচনায় সমাজতন্ত্রকেও প্রত্যাখ্যান করেন। সে যে ভুল ভেবেছিল, সেটি এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে।

'আপনাকে একটি কথা বলি', অবশেষে সে বলে, 'আপনাদের দেশকে যতটুকু দেখেছি তাতে আমার সন্দেহ নেই, আপনাদের জনগণ সমাজতন্ত্রকে ঘৃণা করে। তাছাড়া এরা খুব ধার্মিক। সমাজতন্ত্রকে ঘৃণা করার এও একটি কারণ।'

আহসান জনসনের কথাগুলি নিয়ে ভাবেন বলে মনে হয়। তারপর তার চোখে এক খলহাসি ফুটে ওঠে, 'সম্ভবত এ নিয়ে সামান্য বিতর্কে আমরা না জড়িয়ে পারব না, তাই না?' উত্তরের অপেক্ষা না করে এর পর তিনি গম্ভীর মুখে বলে যান, 'ঘৃণার কথা তুললেন। আপনার সঙ্গে আমি একমত, আমাদের একটি অংশ আপনাদের মতোই সমাজতন্ত্রকে অপছন্দ করে। কিন্তু এরা কারা? যদি এরা গরিব লোকজন হয়ে থাকে, তাহলে আমি জানতে চাই, সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে এরা জানল কী করে? তারা কি এমন কোনো প্রক্রিয়ায় এসব শিখেছে, যে প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রকে ঘৃণা না করে উপায় থাকে না, নাকি তাদের নিজের মতো চিন্তা করার অবকাশ দেওয়া হয়েছে? যদি বলেন, এরা এখানকার শিক্ষিত সমাজ, তাহলে প্রশ্ন করব, তাদের এ জাতীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কারণ কী? তারা কি আপন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নাকি এর পেছনে জনগণের মঙ্গলের স্বার্থ নিহিত? আপনি বললেন, আমাদের জনগণ ধর্মপ্রাণ। আমি অস্বীকার করছি না। দেখছি, এতে আপনারা আশ্বস্ত বোধ করছেন। তবে আমি মনে করি, ধর্মপরায়ণতার বদলে তাদের অজ্ঞতার ওপর ভরসা করাই আপনাদের জন্য নিরাপদ হবে। কারণ ঈশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করা তো আর কমিউনিস্টদের মূল লক্ষ্য নয়। তাছাড়া আপনাদের জানা থাকার কথা, যে ক্ষুধার্ত মানুষটি তার নিজের ও পরিবারের ক্ষুধার অন্ন জোগাতে পারে না, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সে সবচেয়ে সোচ্চার বিদ্রোহী, যদি সে ঈশ্বর-বিদ্রোহী না হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে অদৃশ্য কারো বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু ঈশ্বর যে তার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণও নন, সেটি সে প্রতিবার ধর্মান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়।'

জনসনের মধ্যে অস্থির ভাব দেখা দেওয়ায় আহসান থেমে ঈষৎ কৌতুকের চোখে সেদিকে তাকায়। 'আমার কথা কি আপনার ভালো লাগছে না?'

জনসন তার বিরক্ত ভাব নিয়ন্ত্রণ করে বলে, 'না, না, তা নয়। দেখুন, আমি এসব জানি। আমি জানি, ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে সমাজতন্ত্রকে আকর্ষণীয় তত্ত্ব বলে মনে হয়। কিন্তু আমি আপনার কাছে জানতে চাই, এ ক্ষুধা জয় করার জন্য আপনার ও আমার দেশ কীভাবে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারে। আমার মনে হয়, এসব নিয়ে আলোচনা করাই শ্রেয়, কারণ যতদূর দেখছি, দু দেশের বর্তমান এই সহযোগিতা বন্ধ হবে মনে করার কোনো কারণ নেই। এ জন্যই আপনাদের জনগণের মানসিকতার কথা বলেছি। তাই বলে বলছি না, এ সহযোগিতার সম্পর্কে কোনোদিন ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে না, বলছি না আমাদের এখানকার লোকজন সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু এও দেখতে হবে, শুধু আমাদের লোকজন আপনাদের বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই যাতে এ সম্পর্কে ছেদ না পড়ে। এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানাতে পারেন কি না দেখা যাক।'

আহসান মৃদু হাসার উপক্রম করেন। কিন্তু হাসিটি বিদ্‌ঘুটে শোনাতে পারে সাব্যস্ত করে আর হাসেন না। যতটা পারা যায় গাম্ভীর্য বজায় রেখে তিনি বলেন, 'দয়া করে আমার এ কথাটি বিশ্বাস করুন, আমাদের দু দেশের মধ্যে কোনো সহযোগিতা সম্ভব নয়। আমাদের এখানে কেউ কেউ আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে বটে, তবে সেটি করছে পুরোপুরি নিজের গরজে। কিন্তু আপনি গোটা দেশের কথা বললে এ সহযোগিতা অসম্ভব। সম্পূর্ণ অসম দুটি দেশের মধ্যে সহযোগিতা হয় না। আমাদের মাঝখানে অপার সাগর। আপনি এখন আমাদের দেশ ঘুরে দেখছেন, নিজের চোখেই দেখবেন আমার কথা ঠিক কি না।'

জনসন ঈষৎ কৃত্রিম হাসি হাসে। 'আমি তো মনে করি আমাদের ও বিশেষত আপনার মতো লোকদের মধ্যে এ সহযোগিতা সম্ভব নয়।'

কিন্তু আহসান যেন এ মন্তব্য শুনতে পান না, গভীর অভিনিবেশে তিনি যেন নিজের চিন্তাকে গুছিয়ে নেন। তিনি বলেন, 'সহযোগিতা কীসের জন্য? এখানে সামান্য অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে ব্যস্ত লাখ লাখ মানুষের কাছে আপনাদের অর্থনৈতিক মতাদর্শের কানাকড়ি অর্থও নেই। এদের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য সহযোগিতা? আমাদের মানুষজনের একটিই ভয় : খেতে না পেয়ে মৃত্যু। আপনাকে বলি, এক দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র আমাদের আলাদা করে রেখেছে। আপনারা চান আমাদের সামন্তবাদীদের দু-একজনকে পুঁজিবাদী বানাতে। কিন্তু আমাদের হতদরিদ্র লোকজনের দুর্দশা আরো না বাড়িয়ে তা কি আদৌ করা সম্ভব? তাদের নিয়ে তো আপনাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আপনারা শুধু চান এমন একটি শ্রেণী তৈরি করতে যারা আপনাদের বুঝতে পারবে, সমর্থন করবে। যারা আপনাদের মতাদর্শে বিশ্বাস করে তাদের হাত শক্তিশালী করাই আপনাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তারপর আমরা আপনাদের কোনো ক্ষতি না করে থাকলেও আমরা আপনাদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করি, আমাদের যা নেই তা রক্ষা করার জন্য জীবন বিসর্জন দিই।'

জনসন কয়েক মুহূর্ত কথা বলে না। আহসানের সঙ্গে আলোচনা চালানোর অর্থহীনতা বিষয়ে সে যেন অবশেষে নিশ্চিত হয়েছে, এ জন্য সে আলোচনার ইতি টানার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কী এক অজ্ঞাত কারণে সে কথা চালিয়ে যায়, 'একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিত, মি. আহসান। আপনি যাই বলুন না কেন, এমনকি আপনাদের হতদরিদ্রদের

স্বার্থের সঙ্গে আমাদের স্বার্থের কিছু মিল আছে। মানবজাতিকে সমাজতন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে তারা আমাদের মতোই উদ্‌গ্রীব।'

অস্থিরভাবে মাথা নেড়ে এক প্রকার ফিসফিস করে আহসান বলেন, 'আপনাকে তাহলে আরেকটি কথা বলি। শুধু যে স্বার্থের মিল নেই তা-ই নয়, এদের দৃষ্টিভঙ্গিই আপনাদের চেয়ে আলাদা। আপনাদের কাছে সমাজতন্ত্র ভয়ঙ্কর কিছু। কিন্তু আমাদের জনগণ কেন সমাজতন্ত্রকে ভয় পাবে, বলুন? সমাজতন্ত্র এলে কি এরা তাদের সম্পদ হারাবে? নাকি তারা ভয় পাবে আপনারা সমাজতন্ত্রকে নিষ্ঠুর হিসেবে তুলে ধরছেন বলে, ভিন্নমতাবলম্বীদের তারা উৎখাত করে বলে? এখানকার একেবারে অজ্ঞতম লোকটিও জানে, পশ্চিমও মানুষ খুন করেছে, নিজ দেশে না করলেও উপনিবেশগুলিতে করেছে এবং তা করেছে উপনিবেশিতরা স্বাধীনতা চেয়েছে বলে। একদিন এরা এ শতাব্দীতে ব্রিটিশ, ফরাসি ও পর্তুগিজদের হাতে নিহতদের সংখ্যা যোগ করলে দেখতে পাবে কমিউনিস্টদের হাতে নিহতদের চেয়েও সে সংখ্যাটি বড়। আপনারা বলবেন, পশ্চিম তার সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করেছে, সেই জায়গাটি নিয়েছে কমিউনিস্টরা। আপনাদের থেকে একটি জায়গায় কিন্তু কমিউনিস্টরা এগিয়ে আছে। তারা কখনো এখানে আসেনি, এ জন্য তাদের নিষ্ঠুরতা যদি সত্যি থেকেও থাকে এ ব্যাপারে আমাদের লোকজনের কোনো পূর্বাভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া তাদের নিষ্ঠুরতার কারণ এদের কাছে বোধগম্য হবে। কিন্তু এদের ওপর আপনাদের নৃশংসতার কারণ ব্যাখ্যা করুন তো দেখি। আপনি কি রেড ইন্ডিয়ান কিংবা তাসমানিয়ার আদিম মানবদের ওপর নৃশংসতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন? আপনি কি বলতে পারবেন জাপানিরা যখন আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন তাদের ওপর সেই নির্মম বোমা কেন আপনারা ফেললেন? তাছাড়া আপনারা সবাই যদি আজ সাধু সেজে থাকেন, এখানকার লোকজনের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটানোর প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী?'

জনসনের চোখে অন্ধকার মেঘ ঘনিয়ে আসে। আহসান সেদিকে চেয়ে প্রসন্ন হাসি হাসার চেষ্টা করে। 'আপনি রেগে গেছেন।'

জনসন এ মন্তব্য এড়িয়ে গিয়ে বলে, 'হাঙ্গেরি ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশের বেলায় কী বলবেন?'

'কী বলব? আপনি কি মনে করেন আপনাদের বদলে রাশিয়া তাদের দখল করায় আমাদের দেশের লোকেরা আপনাদের বা পশ্চিম ইউরোপীয়দের মতো উদ্বেগ বোধ করবে? তাছাড়া এ কাজ করার পেছনে রাশিয়ার হয়তো শক্ত যুক্তি থাকতে পারে। যদি সে যুক্তি না থেকে থাকে, তাহলে তারাই দুষ্ট নেকড়ে। কিন্তু আমাকে বোঝান, রাশিয়ার আচরণের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কী সম্পর্ক?'

জনসন নিশ্চুপ। আহসানের রাজনৈতিক দুর্বলতা যতই তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, ততই এ আলাপ থেকে সে বিচ্ছিন্ন বোধ করছে। ক্ষীণ হেসে সে বলে, 'আপনার কথা শুনলে তো যে কারো মনে হবে আমরাই সেই দুষ্ট নেকড়ে। এমনকি আপনাদের এ দেশকে সহযোগিতা করার পেছনে আমাদের এক জঘন্য উদ্দেশ্য আছে।'

আহসান মাথা নাড়ে। 'না, আমি বলছি না এ দেশে প্রবেশ করা প্রতিটি ডলারের গায়ে কোনো না কোনো খারাপ উদ্দেশ্য মেখে রাখা হয়। আপনাদের অনেকেই মহান আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে অর্থ পাঠান। কিন্তু এ সাহায্যে কী হয়? আমাদের দারিদ্র্যের বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে পানির একটি বিন্দু। তাও গ্রহণযোগ্য হতো, যদি না আপনাদের নেতৃবৃন্দ

আমাদেরকে বশ করার এবং আমাদের উপকারে আসে না আমাদের দিয়ে তেমন কাজ করানোর ক্ষেত্রে এ সাহায্য ব্যবহার করতেন।'

'যেমন?'

'যেমন আপনারা আমাদের ক্ষুদ্র বাজেটের সত্তর শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করতে বাধ্য করেন। নানাভি বলতেন, দেশকে সবার আগে যতদিন না বাইরের সমাজতান্ত্রিক হুমকির হাত থেকে সুরক্ষিত করা যাচ্ছে, ততদিন আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাত দেওয়া যাবে না। নতুন সরকারও একই কথা বলছে।'

'আমি বুঝতে পারছি না, এখানে আমাদের ভূমিকাটি কী। আপনি বরং বলতে পারেন, সৌভাগ্যবশত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কিছু লোক আপনাদের আছে', জনসন বলে।

উত্তরে আহসান বলেন, 'হ্যাঁ, আর সব বিষয়ে চরম অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই একটি বিষয়ে তাদের এমন দূরদৃষ্টি সত্যি বিস্ময়কর। কিন্তু শুধু দূরদৃষ্টির কথা বলছেন কেন, শত্রুর প্রতিরক্ষা-শক্তির সঙ্গে নিজেদের প্রতিরক্ষা-শক্তির দ্রুত তুলনা করার বিস্ময়কর সামর্থ্য দেখা যায় এদের মধ্যে। এ জন্য তারা আপনাদের কাছে সামরিক সহায়তা চায়। আপনারাও দিতে কার্পণ্য করেন না। আপনারা এ ব্যাপারে এত সুবিবেচক যে, আমাদের দেশ এক সামরিক চৌকিতে পরিণত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে মনে হয়, আপনাদের প্রশংসার পাত্র এসব দূরদর্শী বুদ্ধিমান লোকগুলি দেশের মূল্যবান অর্থ ভালো কাজে ব্যয়ের চেষ্টা কখনো করে থাকলেও তাতে আপনাদের উৎসাহ লাভে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের এ ব্যর্থতার কারণ আমি জানি।'

'তাই নাকি?' জনসন তার শুকনো হাসি চেপে রাখতে ব্যর্থ হয়, 'বলুন দেখি, কী কারণ।'

'লক্ষ করুন, সামরিক খাতে আমাদের নিজেদের ব্যয়ের পরিমাণ যত নগণ্যই হোক, কিন্তু সেটি ব্যয় তো। সবচেয়ে জরুরি হলো এ ব্যয়ের মনস্তাত্ত্বিক মূল্য। এর ফলে আমাদের মনে এ অনুভূতি সঞ্চারিত হবে যে, লড়াইয়ের যোগ্য এক শত্রু আমাদের সামনে হাজির আছে। যেহেতু একা সেই শত্রুকে কাবু করা সম্ভব নয়, তাই আপনাদের ওপর ভরসা করতে হয়।' আহসান কয়েক মুহূর্ত থেমে অতিথির দিকে তাকায়। তারপর শান্ত স্বরে বলেন, 'আমি জানি বীভৎস এক যুদ্ধে আপনারা অবতীর্ণ, পাছে কমিউনিস্টদের হাতে পড়ে এ জন্য বিশ্বের প্রতিটি ইঞ্চি দখলের জন্য লড়াই করতে হচ্ছে আপনাদের, শেষে এ যুদ্ধের অর্থই হারিয়ে ফেলেছেন আপনারা। আপনাদের চোখে কমিউনিস্টরা হয়ে দাঁড়িয়েছে এ দেশের রেড ইন্ডিয়ান। তাদেরকে আপনাদের খুঁজে বের করতে হবে, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করতে হবে। এখানে কেউ কখনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করলে আপনারা এ দেশে দক্ষযজ্ঞ শুরু করে দেবেন। এখানে আপনারা কল্পিত রাশানদের বিরুদ্ধে জীবনপণ যুদ্ধ করবেন, কারণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আপনাদের কাছে সম্মানের ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে, কিন্তু আপনারা ঘুণাক্ষরেও একবার স্বীকার করবেন না, রাশানদের মন্ত্রণা ছাড়াই আমরা নিজেরা নিজেদের দেশে এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আপনাদের কী ধারণা, বলশেভিকরা আকাশ থেকে পড়েছে?'

জনসন মাথা নেড়ে ভগ্নহৃদয়ে বলে, 'বড় আশা নিয়ে আপনার এখানে এসেছিলাম, ভেবেছি মুক্তবুদ্ধির জাতীয়তাবাদী এক এশীয়ের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হব। কিন্তু এতক্ষণ যা বললেন, তা আমি বিনে পয়সায় বিতরণ হওয়া মস্কোর যে কোনো প্যাম্ফলেটে পড়ে নিতে পারতাম।'

'ওয়াশিংটনের প্যাম্ফলেটের বক্তব্য পুনরাবৃত্তি না করার কারণে যদি আপনি কোনো এশীয়ের বক্তব্যকে গুরুত্ব না দেন, তাহলে আমার শেষ প্রশ্ন : আপনারা আমাদের কী শোনাতে চান? আপনাদের আদর্শ কী? আপনাদের কোনো প্যাম্ফলেটে এ জরুরি প্রশ্নের কোনো জবাব কখনো থাকে না। মনে রাখবেন, আপনি এমন এক এশীয়ের সঙ্গে কথা বলছেন, যে ক্ষুধার্ত, যার ছেলেমেয়েরা না খেয়ে আছে। তাদের আপনারা কোন স্বর্গ গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবেন? আপনারা শুধু একটি কথাই শোনাতে পারেন, আপনারা বলবেন, এই যে ক্ষুধার্ত এশীয় ভাইয়েরা, ভরপেট খাওয়াই দুনিয়ায় সবকিছু নয়, এর চেয়েও বড় বড় ব্যাপার আছে, লালবাহিনী তোমাদের দখল করে নিলে সেগুলি তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে। আপনারা এদের কিছুকাল পর্যন্ত ভাঁওতা দিয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, এরা বুঝতে পারবে আপনাদের আদর্শে এদের পেট ভরবে না। যান, গিয়ে একটি আদর্শ খুঁজে বের করুন, কথা দিচ্ছি, আমরা সবাই আপনাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়াব, এমনকি আমাদের এ জন্য ঘুষও সাধতে হবে না, নিয়ন্ত্রণ করারও দরকার পড়বে না। তা না করা পর্যন্ত নানাভি কিংবা আবদুল কাদেরের মতো লোকদের ক্ষমতায় বসিয়ে যাওয়া ছাড়া আপনাদের আর বিকল্প থাকবে না। এ শুধু খুব সরল-সোজা কথাই নয়, অতি বাস্তব কথাও। কারণ আমাদের সবার জন্য একটি ভদ্রজনোচিত জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত করা আপনাদের সাধ্যেরও অতীত, ইচ্ছা থাকলেও আপনারা তা পারবেন না।'

'আপনি হয়তো এ বিভ্রমে ভুগছেন যে, আপনার সরকার আমাদের হাতের পুতুল।'

'না, স্বীকার করতে আপত্তি করব না যে, আপনাদের হয়তো কষ্ট করতে হয়নি, এরা হয়তো নিজ গরজে আপনাদের দরজায় গিয়ে কড়া নেড়েছে। আবার সবক্ষেত্রে যে এ রকম হয়েছে, তা হয়তো নয়। তাছাড়া দেখা দরকার আপনাদের সঙ্গে মতে মেলে না এমন সরকারকে আপনারা উদ্বাহু হয়ে স্বাগতম জানান কি না।'

'নিঃসন্দেহে এমন সরকারকে আমরা স্বাগত জানাব না এবং সে কথা মুখ ফুটে বলে দিতেও দ্বিধা করব না।'

'আপনারা কীভাবে সেটি বলছেন, তার ওপরেই সব নির্ভর করছে। হয়তো বন্দুক নিয়ে এসে বললেন, তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না, কাজেই বিদায় হও।'

'সত্যি বলছি মি. আহসান, এসব কথা শুনে শুনে আমার মাথা ধরে যাচ্ছে।'

'আপনার কি মনে হয় না, আপনাদের কথাও অন্যদের মাথা ধরিয়ে দিতে পারে?'

জনসনকে এখন যতটা না ক্রুদ্ধ, তার চেয়ে বেশি বিমর্ষ দেখায়। সে আরেকবার মাথা নেড়ে বলে, 'আচ্ছা, আমাদের মধ্যে ভালো কিছুই কি আপনি পান না? যদি না পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে দেখে রাগ নয়, করুণা জন্মাবে।'

হয়তো এ বিমর্ষ ভাবের কারণেই আহসান ঈষৎ বিগলিত হাসি হাসেন, 'মার্কিনিরা চমৎকার জাতি, তাদের সাফল্য বিস্ময়কর, এ কথা অস্বীকার করার কেউ নেই। কিন্তু তবু বাইরের লোক আপনাদের অপছন্দ করে। কেন? তার কারণ কি আপনাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করার প্রবণতা? কোনো জাতি অন্যদের চেয়ে খুব বেশি এগিয়ে গেলে সে জাতির অধিকাংশ লোকের মনে যে শ্রেষ্ঠত্বের মানসিকতা তৈরি হয়, অতীতে রোমান কিংবা মোঘলদের বেলায় যেমন হয়েছে সেরকম কিছু? নাকি এর কারণ আপনাদের প্রতি অন্যদের ঈর্ষা? এটি কি এ কারণে যে, একটি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব মানতে কারো না বাধলেও, ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানতে সবার বাধে? নাকি অতীতের মতো সর্বদা

শক্তিধর দেশকে অন্যদের ব্যাপারে নাক গলাতে হয় এবং কোনো দেশই তার নিজের ব্যাপারে অন্য কারো হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না? নাকি আপনাদের ব্যবস্থাতেই কোথাও কোনো ক্রটি আছে, যার কারণে আপনারা অন্যদের উত্যক্ত করেন? হতে পারে, সবগুলি কারণের মধ্যেই কিছু কিছু সত্যতা আছে। তবে আমার মতে কোথাও যদি আপনারা অজনপ্রিয় হয়ে ওঠেন, তাহলে বুঝতে হবে তার সবচেয়ে বড় কারণ আপনারা জোর করে সেখানে ঢুকেছেন। আপনাদের দেশ ও ব্যবস্থাকে বাঁচাতে আপনারা এমন মরিয়া হয়ে আপনাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ বিস্তার করতে থাকেন যে, পথিমধ্যে কাকে মাড়িয়ে গেলেন, কে কোথায় ছিটকে পড়ল তোয়াক্কা থাকে না। আপনাদের সমর্থনহীনতার আরেকটি কারণ আছে। আপনাদের ভয় ও বাতিক আপনাদের অপ্রকৃতস্থ করে তুলেছে। সবচেয়ে প্রাণঘাতী ও বিধ্বংসী অস্ত্র বোঝাই করে আপনাদের উড়োজাহাজ আর ডুবোজাহাজ জলে অন্তরীক্ষে অহর্নিশ ছুটে বেড়াচ্ছে। জনগণ প্রকৃতিস্থ লোকদের পছন্দ করে।'

জনসন অকস্মাৎ তার শান্ত ভাব হারিয়ে ফেলে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'আপনি কি বুঝতে পারছেন না, আমরা নিজেদের রক্ষার যথাসাধ্য ব্যবস্থা না করলে ওরা আমাদের ধ্বংস করে দেবে?'

আহসান তৎক্ষণাৎ জবাব দেন না। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকার পর তিনি বলেন, 'সেটি আমি পুরোপুরি বুঝি, আপনাদের জন্য তাই মাঝে মাঝে করুণাও হয়। কেমন এক শাঁখের করাতের তলে পড়েছেন আপনারা। হয়তো আপনারা চান না যুদ্ধ হোক, কিন্তু আপনাদের আশঙ্কা লড়াই না করলে সমাজতন্ত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। আপনারা এ আশা জিইয়ে রাখছেন যে, একদিন রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের জনগণ নিজেরা বিদ্রোহ করে সমাজতান্ত্রিক শাসনকে উৎখাত করবে। আপনারা এমনকি এও আশা করেন যে, একদিন রাশিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু তাতে মন প্রবোধ মানে না। ফলে সবচেয়ে শান্তিবিহীন এ শান্তি যেমন দিনের পর দিন টিকে থাকছে আর আপনারা স্তূপের পর স্তূপ অস্ত্র তৈরি করে চলেছেন, তেমনি আপনাদের আচরণও ক্রমাগত অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ছে। আমাদের দিক থেকে আমরা আপনাদের একটিই কথা বলব, আমরা জানি আপনাদের নিজেদের রক্ষা করতে হবে, কিন্তু যারা সম্ভবত আপনাদের ততটা অপছন্দ করে না, তাদেরকে শত্রুতে পরিণত করে কি আপনাদের পক্ষে এ যুদ্ধ জয় করা সম্ভব? আপনারা নিজেদের সীমান্ত মনে করে যা রক্ষা করার চেষ্টা করছেন, সেগুলি আপনাদের সীমান্ত নয়; আমাদের, নয়তো অন্য কারো। আপনারা গিয়ে নিজেদের উপকূলভাগ রক্ষা করুন, আমাদেরটি নয়। আমি চাই না আপনারা আমাদের কোনো কিছু রক্ষা করার জন্য হাত বাড়ান, কারণ আমি জানি আপনারা আমাদের সুরক্ষা দিচ্ছেন না, সুরক্ষা দিচ্ছেন নিজেদের। সে জন্য আমি আপনাদেরকে আমার রক্ষক মনে করি না। অন্য পক্ষটিও যদি তাদের নিজেদের রক্ষা করতে আমার দেশে আসে, আমি তাদেরও এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলব।'

'মি. আহসান, আপনি দেখছি গোঁড়া ভাববাদী, হয়তো একটু শিশুতোষ। অন্য যে পক্ষের কথা বলছেন, সে কিন্তু এসে আপনার দেশটি আগে দখল করবে, আপনার সুললিত কণ্ঠের উপদেশবাণী তার কানে যাওয়ার কথা না। ওদের কোনো মানবিক আবেগ-অনুভূতি নেই।'

'সে সিদ্ধান্ত আমাদেরই নিতে দিন। এটি খুব জরুরি। আমরাই সাব্যস্ত করব, অপরপক্ষ ভালো না মন্দ। আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধিকে খাটো করে দেখবেন না।'

'আপনার মতো লোকের হাতে যদি এ দেশ পড়ে, না জানি এর কী দশা হবে। ঈশ্বর একে রক্ষা করুন।'

'হ্যাঁ, আপনাদের চেয়ে ঈশ্বরই এ দেশ রক্ষার দায়িত্ব নিলে আমরা খুশি হব।'

'আমাদের ব্যবস্থাকে আপনার এত ঘৃণা, অন্তত একটি ব্যাপারে তো আমাদের প্রশংসা করবেন : আপনার যা খুশি আপনাকে বলতে দেওয়া হচ্ছে।'

'প্রশংসা করা কঠিন হয়ে গেছে, কারণ আমাকে একবার জেলে যেতে হয়েছে।'

'ওখানে ওরা নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে। অন্তত, আপনাকে মেরে তো ফেলেনি।'

'সে জন্য তো ধন্যবাদ দিতে হবে বর্তমান পরিস্থিতিকে, কারণ পরিস্থিতি এখন আপনাদের এবং আপনাদের এখানকার অনুচরদের অনুকূলে।'

জনসন সব আশা ত্যাগ করার মতো ভঙ্গি করে বলে, 'মনে হচ্ছে আমরা দুজনই খামোখা সময় নষ্ট করলাম। তবে যাওয়ার আগে আপনাকে একটি কথা বলি। আমার মনে হয় না, এখানে আপনার চিন্তাধারা হালে পানি পাবে। আপনার এখানকার জনগণই তা হতে দেবে না। তবে একটি কথা জেনে ভালো লাগল যে, নানাভির মতো লোকজনকে আপনারা পছন্দ করেন না। আপনাকে তো বলেছিই, আমাদের সাপ্তাহিক পত্রিকার নীতি হলো এশিয়ার দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন-করা এমন কেউ যে না মস্কোর এজেন্ট, না ওয়াশিংটনের। তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হবে দেশের মঙ্গল, গণতান্ত্রিক আদর্শ ধারণ করবে সে। যখন এ রকম কেউ আপনাদের দেশ শাসনের ভার নেবে, সে দিন আপনার ও আমার দেশের দৃষ্টিভঙ্গি মিলে যাবে, তখন শুধু আমাদের দু দেশের জনগণের সহযোগিতার দুয়ারই উন্মোচিত হবে না, আপনাদের মতো লোকজন অন্য শিবিরে যোগ দেওয়ার পক্ষে যুক্তিও ততটা পাবেন না।'

'আপনারা তেমন একজন মানুষ খুঁজে পেয়েছেন তাহলে?' আহসান অতিশয় গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করেন।

জনসন খানিক দ্বিধায় ভোগে। আবদুল কাদের সম্পর্কে সে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে যায়নি। শেষে সাব্যস্ত করে এ ব্যাপারে কিছু বলবে না, বিশেষত আহসানের চিন্তা করার ধরন যেহেতু তার জানা। 'দেখুন, আমার মনে হয়, তাঁর মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।'

'তাই নাকি?' আহসান চট করে প্রশ্ন করে, 'কেন? তার ভাষা নানাভির মতো অত সুশীল নয় বলে, নাকি ইংরেজিতে পাণ্ডিত্যের ইতিহাস নেই, মফস্বলের মানুষ বলে?'

জনসন পূর্ববৎ দ্বিধায় পড়ে। অবশেষে সে পুরোপুরি আবদুল কাদেরের পক্ষে কথা বলবে স্থির করে। 'তাঁকে দেখে মস্কো কিংবা ওয়াশিংটন কোনো পক্ষের আদেশ শোনার লোক নন মনে হয়েছে বলে। তিনি স্বাধীনচেতা জাতীয়তাবাদী।'

'মি. জনসন, এখনো পর্যন্ত একটি বিষয়েও আমরা একমত হতে পারলাম না, তবে আমরা অন্তত মন খুলে কথা বলেছি। শেষেও অন্তত এ খোলামেলা ভাবটি বজায় রাখি। আপনাদের নীতির এই একটি প্রবণতা আমি জানি। বলছেন, আপনারা এখন এমন একজন লোক খুঁজছেন, যে প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী হবে, আবার গোপনে আপনাদের আদেশ শুনবে। এ তত্ত্বের অসুবিধাটি হলো, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মন-মানসিকতার সত্যিকার প্রতিফলন না ঘটিয়ে এশিয়ার কোনো দেশে কোনো নেতার পক্ষে প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আবার আপনারা অসন্তুষ্ট হবেন। আমার

উপদেশ হলো : নিজেদের লড়াই প্রকাশ্যে লড়ুন, মুখোশ পরবেন না। এটি যদি করতে পারেন, অন্তত এ কারণে হলেও আমরা আপনাদের গুণগান করব।'

'আপনি যাই ভাবুন না কেন, আমাদের জয় হবেই। মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দমিয়ে রাখা যায় না।'

'মুক্তি একটি পবিত্র শব্দ। শত-সহস্রভাবে এ শব্দের অপব্যবহার ঘটছে। কিন্তু দয়া করে এটিকে ক্ষেপণাস্ত্রের ডগায় বসাবেন না।'

জনসন উঠে দাঁড়ালে আহসান বলেন, 'আপনাকে আশাহত করে থাকলে দুঃখিত। তবে একটি কথা মনে রাখবেন, আমাদের শুভেচ্ছা পেতে হলে আমাদেরকে আমাদের নিজেদের নিয়তি নির্ধারণ করতে দিন। মানবেতিহাসের এ বিশেষ অধ্যায়ে আপনারা আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট অবস্থানে আছেন বলে কিংবা আপনাদের ব্যবস্থা আমাদের চেয়ে প্রাণবন্ত বলে আমাদের পথ দেখানোর চেষ্টা করবেন না। আপনাদের পথে আমাদের যত টানবেন, তত আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে চলে যাব। চুপচাপ দেখে যাওয়া ছাড়া আপনাদের আর কিছু করা উচিত নয়। আমরা আপনাদের পছন্দের পথ বেছে না নিলে বুঝবেন সে জন্য আমাদের নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি আছে।'

'সেটি করার কোনো যুক্তি কোনোদিনই পাবেন না আশা করি।'

দরজায় বিদায় দিতে এসে আহসান পূর্ববৎ অমায়িক ব্যক্তিতে পরিণত হন। জনসন মনে মনে বলে, বাইরে থেকে তোমাকে দেখে যে কেউ ধোঁকা খাবে বন্ধু, ভেতরে ভেতরে তুমি একেবারে তেতো। এ জন্য কোনোকিছু তুমি স্পষ্ট দেখতে পাও না। মোট কথা, তুমি এক বিপজ্জনক মানুষ।

জনসন ভাবে এ দেশে তার দুটি সন্ধ্যা নষ্ট হয়ে গেল। একদিন গেছে অর্থনীতির সেই অধ্যাপকের বাসায় আমেরিকান নাম শুনলে যিনি মূর্ছা যান। আরেকটি এই মার্কিনবিরোধীর বাসায়, যে পারলে দুনিয়া থেকে দেশটিকে মুছে ফেলতে চায়। তবে সবার আগে সে নিজেই মুছে যাবে। আরো একটি সান্ত্বনা, তার মতো লোক এখানে হাতেগোনা।

পর্ব : ২

প্রথম অধ্যায়

১

বনবন পাখা ঘুরিয়ে গোঁ গোঁ শব্দে একটি ক্ষুদ্রাকার সি-প্লেন খরস্রোতা কোকা নদীতে এসে বেকায়দাভাবে নামে। এক দীর্ঘকায় মার্কিনি ছোট নৌকায় চেপে সহসা তীরে এসে উঠে চারদিকে তাকান, বেশকিছু বিদেশী ও স্থানীয় লোকজনের মাঝে দাঁড়ানো এক যুবাবয়সী পুলিশ কর্মকর্তা চৌকস ভঙ্গিতে তাকে স্যালুট করে।

'যাত্রা ভালো হয়েছে, মি. হার্ভে?' অভ্যর্থনা জানাতে আসা সৌম্যদর্শন আরেক প্রৌঢ় মার্কিনি জিজ্ঞেস করে। এ দেশে মার্কিন কারিগরি সহায়তা কর্মসূচির পরিচালক জর্জ হার্ভে ক্ষীণ হেসে মাথা নাড়েন। ছোট প্লেন তার একেবারে অপছন্দ, মাথা ঝিমঝিম করে। তিনি আবার চতুর্দিকে তাকান। নদীর ওপাড়ে পাহাড়ের পেছনে সূর্য ডুবে গেছে।

বিস্তীর্ণ জঙ্গলের গহিনে শত শত উন্মুক্ত পিঠ, লগ্নপদ ঘর্মাক্ত শ্রমিক সকাল থেকে সন্ধ্যা, আবার সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত পালাক্রমে কখনো চামড়া জ্বালানো রোদে, কখনো ফ্লাড লাইটের উদ্ভাসিত আলোয় কাজ করে। ডিজেল ইঞ্জিনের বজ্রনিনাদ, এয়ার ড্রিলের বোঁ বোঁ শব্দ, টান টান সিমেন্ট লাভার মতো গড়িয়ে পড়ে। বিদ্যুৎচালিত বেলচা, ক্রেন ও ট্রাক নিচু পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠে-নামে, পাহাড়ের গাছগাছালি এখন কেটে সাফ, লাখ লাখ ঘনফুট মাটি সরানো হয়েছে। পিপীলিকাবৎ অন্তহীন এক কর্মকাণ্ড, বিন্দুর মতো চলমান মানুষজন, বিকটদর্শন মাটি সরানোর যন্ত্র, বুলডোজার, উঁচু মাচান ও নানা যন্ত্রপাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে শুনশান পড়ে থাকা এ জঙ্গলের ভেতরে কেমন অর্থহীন মনে হয়। লোকে বলে, একদা এ স্থলে নিশ্চিন্ত আলস্যে ঘুরে বেড়ানো শার্দূলেরা এখন দূরবর্তী পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মলিন গোঁফে দু পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে এসব ব্যাখ্যাতীত কর্মকাণ্ড দেখে।

এখানে জলবিদ্যুৎ তৈরির একটি বিশাল বাঁধ তৈরির কাজ চলছে। নির্মাণ শেষ হলে এর চারটি উৎপাদন ইউনিট থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হবে। এর কারণে তৈরি হবে এক বিস্তীর্ণ কৃত্রিম হ্রদ এবং ৫০০ ফুট প্রশস্ত এক স্পিলওয়ে, যার অসংখ্য গেট দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে বিপুল পরিমাণ পানি নির্গত হবে। কলকারখানা ও গ্রাম-গঞ্জে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা ছাড়াও এ বিশাল প্রকল্প বহু শতাব্দী ধরে দুই তীরের মানুষজনকে দুদর্শায় নিক্ষেপকারী দুরন্ত কোকা নদীকে শাসনে আনবে।

কোকা নদী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এ দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ যাবৎ কালের সবচেয়ে বড় উদ্যোগ, ইতিমধ্যে তারা এর পেছনে ৫ কোটি ডলার ঢেলে ফেলেছে।

এ প্রকল্পের ভাগ্য অবশ্য সরলরৈখিক নয়, এখানে একটি বহুমুখী জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণের চিন্তা প্রথম উদয় হয় নানাভি সরকারের মাথায়। এক ক্ষুদ্র বিদেশী ফার্মকে এ কাজ দেওয়াও হয়। কিন্তু তড়িঘড়ি করে তৈরি করা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে দেখা দেয় বিচিত্র সমস্যা। ইতিমধ্যে বেশকিছু অর্থ এর পেছনে ঢালা হয়ে গেলেও অবশেষে বন্ধ করে দেওয়া হয় কাজটি। কয়েক বছর পর এ এলাকায় তুমুল বন্যা দেখা দিলে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। তখন বিস্মৃতপ্রায় প্রকল্পটি আবার চালু করা হয়। নির্মাণস্থলে বেশকিছু প্রকৌশলী ও কর্মীকে দেখা যায়, তারা এসে দেখেন মেশিনপত্রের করুণ অবস্থা। কোনোটিতে জং ধরেছে, কোনোটি ক্রমবর্ধমান জঙ্গলের গ্রাসে পড়েছে। অবশ্য এসব যন্ত্রপাতি আবার সারাই হওয়ার আগেই ওপর মহলে রহস্যময় এক টানাপড়েনের কারণে সরকার পুনর্বার এ প্রকল্প বন্ধ করে দেয়।

পরেরবার নদীতে ভয়ঙ্কর বান ডাকলে ব্লটিং পেপারে আলস্য করে হিজিবিজি কাটতে কাটতে কোনো এক যুবাবয়সী কর্মকর্তার হঠাৎ মনে পড়ে যায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত আমেরিকান টেকনিক্যাল এইড এজেন্সির কথা এবং সে অসমাপ্ত প্রকল্পটি তাদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ভাবে। এভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। তারা দ্রুত সরকারের সঙ্গে আইনগত দিক থেকে নিশ্ছিদ্র, বিশদ এক চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং স্বাক্ষরের কালি শুকানোর আগেই সোৎসাহে শুরু হয়ে যায় কাজ। এবার প্রকল্পটি পূর্ববৎ ক্ষুদ্র পর্যায়ের থাকে না, অত্যন্ত ব্যয়বহুল এক দানবীয় কর্মকাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। যে কর্মকর্তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এ কাজে টেনে এনেছে, তারা ভেবেছিল, মার্কিনিরা নিশ্চয় বিশাল কিছু করে ছাড়বে। কিন্তু এ তো এলাহী কাণ্ড । যাক, টাকা-পয়সা তো মূলত ওরাই দেবে!

এরপরও প্রকল্পের কাজকর্ম খুব মসৃণভাবে চলেনি। আগেরবারের মতো এবার কাজ বন্ধ হয়ে না গেলেও শুরুর উৎসাহ-উদ্দীপনায় এমন ভাটা পড়ে যে, মেশিনপত্রের সঙ্গে ঘষে পিঠ চুলকানোর জন্য এক মৌসুমে বাঘেরা ফিরে আসে। প্রবল বর্ষণের দেশে এমন ঢিমে গতিতে এ জাতীয় প্রকল্পের কাজ হয় না। এ কারণে কাজও ফুরায় না, খরচও লাফিয়ে বাড়তে থাকে। ওয়াশিংটন খোঁজ নেয়ার জন্য এক লোককে কারিগরি সহায়তা বিষয়ক প্রতিনিধির কাছে পাঠালে সে এ দেশের কর্মকর্তাদের আলস্যের ব্যাপারে তিক্ত ভাষায় অভিযোগ করে। সে বলে, কারিগরি ব্যাপারগুলি মার্কিনিরা পুরোপুরি বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করলেও এসব স্বদেশী কর্মকর্তার সহযোগিতা ছাড়া খুব বেশিদূর এগোনো সম্ভব হয় না। ওপরওয়ালারা তার কথা বিশ্বাস করেছে কি করেনি জানানো হয়নি, তার জায়গায় শুধু অন্য একজনকে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু এ নতুন লোকটিরও ভাগ্য খারাপ। তার আগমনের পরপরই দীর্ঘ ভারী বর্ষণে নির্মাণকাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিধ্বস্ত হয়ে যায়, কাজ আরো বিলম্বিত হয়। ইতিমধ্যে গুজব ছড়ায়—এ কাজে অভিশাপ লেগেছে, ফলে শ্রমিকসংখ্যাও কমতে থাকে।

নির্বাচনের আগে আগে নানাভি ভাবেন, ভোটারদের মনে চমক সৃষ্টি করতে হবে। এই সাব্যস্ত করে তিনি এ কাজে আরো জোর লাগানোর জন্য মার্কিন এজেন্সির কাছে আবেদন জানান। এমন অনুরোধ নানাভি সাধারণত করেন না। হয়তো এ জন্য, অথবা ওয়াশিংটন এখানকার রাজনীতিবিদদের রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয় বলে, এ অনুরোধে

সহসা সাড়া পাওয়া যায়। কয়েক দিনের মাথায় এ পদে দায়িত্ব পান জর্জ হার্ভে নামে উদ্যমী এক ব্যক্তি। বহু বছর ঝিমিয়ে থাকা কোকা নদীর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প অকস্মাৎ অবয়ব ধারণ করতে শুরু করে।

জর্জ হার্ভে আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে ঘোষণা দেন, পরের বছরই বিশাল হ্রদ পানিতে থৈ থৈ করবে। দানবাকৃতি টারবাইনের চাকায় উৎপন্ন বিদ্যুৎ বয়ে নিয়ে যাবে সঞ্চালন তার।

২

গাছগাছালিতে এখনো আকীর্ণ নিকটস্থ এক টিলার গায়ে কয়েক সারি বেড়ার ঝুপড়িঘরে স্থানীয় শ্রমিকদের থাকার বন্দোবস্ত। উল্টো দিকে আরেকটি টিলার ছায়ায় একগুচ্ছ পরিপাটি বাংলোয় বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে জনাশতেক প্রকৌশলী, তাদের বেশিরভাগই মার্কিনি। অবসরে তারা টেনিস খেলে কিংবা শিশুদের ছোট্ট পার্কের পাশে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটে, সন্ধ্যায় পাতার ছাউনি দেওয়া ক্লাবঘরে তারা নাচে বা বিঙ্গো খেলে।

সে রাতে আবছায়া দিগন্তে ফ্যাকাশে চাঁদ ওঠে, নদীর ওপারে ঝোপে-জঙ্গলে শেয়ালের বেদনার্ত কান্না। শ্রমিকদের ঝুপড়িতে জামিল বেঘোরে ঘুমায়, মাথার কাছে ছোট জানালা আধখোলা। ঘরের অন্য দুটি বিছানা শূন্য। সেখানে যারা ঘুমায় আজ তাদের কাজের পালা রাতে। অন্যান্য ঝুপড়িঘর থেকে ভেসে আসা নাসিকাগর্জন মেশিনের ঘড়ঘড় ও শেয়ালের চিৎকারের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার।

সহসা জানালায় কোনো মানুষের মাথা আবির্ভূত হয়। কয়েক মুহূর্ত তা স্থির থাকে, তারপর ফিসফিস করে ডেকে ওঠে, 'জামিল ভাই!'

লোকটি কণ্ঠ না চড়িয়ে কয়েকবার ডাকে। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সে একটি ম্যাচ জ্বেলে তা জানালার কাছে ধরে রাখে। আকস্মিক এ আলোর ঝলকানি ও ম্যাচ জ্বালার শব্দ হয়তো মানুষটির ঘুম ভাঙিয়ে থাকবে। চোখ মেলে সে ধীরে ঘাড় ফেরায়, চোখে আতঙ্ক জাগে! ভয়ার্ত স্বরে সে জিজ্ঞেস করে, 'কে ওখানে?'

'জামিল ভাই, আমি।'

জামিল লাফিয়ে উঠে বসে। এখনো তার ভয় কাটেনি, কারণ কণ্ঠটি তার চেনা মনে হয় না।

'আমি, মতিন।' বাইরের লোকটি বলে।

হাসার চেষ্টা করায় তার দাঁত অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। তবে তার আগমনের গুরুত্বের কথা ভেবে সে দ্রুত মুখ বন্ধ করে ফেলে।

ভয় কাটলে জামিল উঠে দাঁড়ায়, দরজায় পুঁতে রাখা পেরেকের গায়ে ঝোলানো জামা গায়ে দিয়ে দরজা খোলে। উস্কোখুস্কো চুলের শীর্ণমুখ অতিথি নিঃশব্দে প্রবেশ করে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বগলে চেপে ধরা ছাতা। জামিল একটি ছোট কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালে, তারপর সশব্দে গলা খাঁকারি দিয়ে অতিথির দিকে না তাকিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে বসে। সে সাদা শার্ট পরেছে। বিশেষ কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করলে বা কোথাও বেড়াতে গেলে ছোট্ট ব্যাগ থেকে এ শার্ট বের করা হয়। জামিল একটি সিগারেট ধরিয়ে কষে টান দিতে থাকে। সেটির গন্ধে ঘর ভরে গেলে অতিথি জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে।

অতিথি কোনো কথা না বলায় জামিল একবার প্রশ্নবোধক চোখে তার দিকে তাকায়, তারপর মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে অনুধাবন করে, অতিথি কোনো খারাপ খবর এনে থাকবে। মতিন সম্ভবত বুঝতে পারে, বেশিক্ষণ এভাবে নীরব থাকা সম্ভব নয়, পাকস্থলিতে শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে। দেহের ভর অন্য পায়ে স্থানান্তর করে কাঁপা কাঁপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'আপনার মা মারা গেছেন।'

এরপর বহুক্ষণ দুজনের কেউ কোনো কথা বলেনি। ধোঁয়াটে দিগন্তের ওপর ঝুলে থাকা কুয়াশার ওপারে নেবে যাওয়ায় চাঁদ আবছা হয়ে গেছে। নিকটবর্তী কোনো গাছ থেকে নিশাচর পাখি ডাকে, দূর থেকে ভেসে আসে মেশিনের গোঙানি। বগলে ছাতা চেপে মতিন দাঁড়িয়েই থাকে। জামিলও মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। যুবাবয়সী অতিথি তার চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করে, কিন্তু ছায়ার কারণে চোখ দেখতে পায় না। কোনো অন্ধের দিকে সে চেয়ে আছে বলে মনে হয়।

জামিলের সিগারেটের আভা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেলেও আবছা একটি ধোঁয়ার রেখা সোজা উঠতে থাকে। সে সিগারেট টানছিল না।

জামিল যখন বিছানা ছেড়ে ওঠে, তখন চাঁদ ডুবে গেছে। আর কিছুক্ষণ পরে ৬টার পালা শুরু হবে, তাকে গিয়ে আরো ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বলতে হবে। নিজের সামান্য জিনিসপত্র সে গোলাপ আঁকা ক্ষুদ্র টিনের তোরঙ্গে ভরে লণ্ঠনের সলতে কমিয়ে নিভিয়ে দেয়। তারপর মতিনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

পূর্বাকাশে ভোরের ক্ষীণ আভাস। নক্ষত্রেরা ইতিমধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। দু-একটি ঝুপড়িতে আলো জ্বলে ওঠে। সকালের পালার শ্রমিকরা কাজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সাইরেন দেবে যে কোনো মুহূর্তে।

ছাতা চেপে ধরে জামিলের পিছে পিছে হাঁটে মতিন। তার মনে তোলপাড় চলছে। মনে হয় চারঘণ্টা আগে নৌকায় উঠে গ্রামত্যাগের মুহূর্তে যে পরিকল্পনা মাথায় উঁকি দিয়েছিল, তা এখন বলা দরকার। সহসা সে নিঃশ্বাস চেপে ধরে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যায়। তারপর জামিলের কাছে এসে সে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'আপনাকে একটি কথা বলতে চাই জামিল ভাই।'

জামিল মাথা অর্ধেক ঘুরিয়ে জানান দেয় সে শুনছে।

'আপনার বাড়ি যাওয়ার কয়টি দিন কি আমি এখানে কাজ করতে পারব?'

কিছু না বলে জামিল শুধু মুখ সোজা করে। মতিন তার কেউ নয়, একই গ্রামের হওয়ায় জন্ম থেকে তাকে শুধু চেনে। এমনিতে রোগা-পটকা, তার ওপর গত বছর বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও ছোট চার ভাইবোনকে দেখার সে ছাড়া কেউ নেই। এ প্রকল্পে কাজ নেওয়ার চেষ্টা করেছে কিছুদিন। শুনেছে, বহু লোক চাকরি পেয়েছে, এখানে ভালো বেতন। পরিবারের মুখে অন্ন জোগাতে তার টাকার প্রয়োজন ছিলই, তার চেয়ে বড় কথা এখানকার বিদঘুটে সব মেশিনপত্র আর রহস্যময় কর্মকাণ্ড তার মনে কৌতূহল জাগায়। একাধিকবার চেষ্টা করেও সে এখানে কাজ জোটাতে পারেনি। ভগ্নহৃদয়ে গ্রামে ফিরে সে বন্ধুবান্ধবদের বলে বেড়িয়েছে, ওখানে চাকরি জোটাতে হলে ফোরম্যানদের সঙ্গে খাতির লাগে। ফোরম্যান, মানে যে চাকরি দেয়, তাকে ঘুষ না দিলে চাকরি নেই। তাদের স্পষ্ট অবিশ্বাসী চাহনি উপেক্ষা করে সে ব্যাপক হাত-পা নেড়ে জানাতে থাকে, সেখানে কী কী অত্যাশ্চর্য কাণ্ডকারখানা ঘটে চলেছে। 'এক বিশাল হ্রদ বানাচ্ছে ওরা, প্রায় সমুদ্রের সমান। ওরা বিদ্যুৎ বানাবে।' এক চাষী, যার সার্বক্ষণিক চিন্তা কী করে আরেকটু বেশি

ধান ফলানো যায়, বিরক্তিভরে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, 'বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ দিয়ে কী পেট ভরে! এসব হলো টাউনের সাহেবদের জন্যে, যাতে তেনাদের বউরা রাতের বেলা আয়নায় রূপ দেখতে পারে।' এ প্রকল্প তাদের এই খেয়ালি নদীকে বশে আনবে, এ কথা কারো বিশ্বাসে আসে না। নদীর স্রোত কি বশ করা সম্ভব?

মতিন পূর্ববৎ ক্ষিপ্রবেগে কদম চালিয়ে সামনের নিশ্চুপ লোকটির উদ্দেশ্যে বলে, 'কেউ দেখিয়ে দিলে আপনার কাজটি আমি করে দিতে পারব।'

জামিল কিছু বলে না। শীঘ্র সে তার চেয়ে বড় একটি ঝুপড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা লাগানো হলেও ভেতরে আলো জ্বলতে দেখা যায়, কথাবার্তাও কানে আসে। সে ফোরম্যান খালেকের জন্য অপেক্ষা করে। মাথা নিচু করে টিনের সুটকেস হাতে পাথরের মতো সে দাঁড়িয়ে থাকে।

কয়েক মুহূর্ত পর সুপারি চিবাতে চিবাতে ফোরম্যান খালেক বেরিয়ে আসে। সহসা ভয় পেয়ে সে থমকে দাঁড়ায়, 'জামিল না?'

জামিল নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। খালেক সামনে এগিয়ে এসে সুটকেসের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাড়ি যাচ্ছ নাকি?'

'উনার মা মারা গেছে।' ফোরম্যানের মনোযোগ আকর্ষণে উদ্‌গ্রীব মতিন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বলে।

ফোরম্যান শোকার্ত কণ্ঠে রীতিমাফিক মৃতের আত্মার মঙ্গল কামনা করে দু-একটি কথা বলে, তারপর জিজ্ঞেস করে, 'বাড়িতে গিয়ে কতদিন থাকতে চাও?'

'দিন তিনেক।'

'খুব খারাপ', ফোরম্যান বিমর্ষ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে, 'খুব খারাপ। তোমার জায়গায় কাজ নেওয়ার জন্য কত লোক বসে আছে। ফিরলে তোমাকে আবার কাজে ঢোকাতে পারব কিনা কথা দিতে পারছি না।'

জামিল কিছু বলছে না দেখে মতিন উত্তেজনায় কম্পিত কণ্ঠে বলে, 'তিনি যতদিন না থাকেন কাজটি আমি করে দিতে পারি না?'

'না', ফোরম্যান বলে। তারপর গলার কাছে আঙুল স্পর্শ করে, 'যারা কাজের আশায় বসে আছে তারা আমাকে স্রেফ জবাই করবে।'

জামিল সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে মতিন বগলে ছাতা চেপে তার পেছন পেছন যায়। নদীর ঘাটে মতিনের ডিঙিনৌকা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। ঘাটের পথে তারা অর্ধেক গিয়েছে কি যায়নি, এমন সময় ভোর ৬টার সাইরেন বাজে। তিনবার আর্তনাদ করে সাইরেন ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়। তারা দুজন নদীর ঢাল বেয়ে নেবে যেতে থাকে।

পরে তারা যখন নৌকা স্রোতে ভাসিয়ে বৈঠা হাতে নিয়েছে তখন আবার সাইরেন বাজে, তবে সেদিকে তারা কান দেয় না। নদীর যে বাঁকটিতে একটি লম্বা গাছের ডালপালা নুয়ে পানি ছুঁয়েছে, সেখানে এসে নৌকা বাঁক ঘোরার সময়ও সাইরেন বেজে চলে।

৩

জর্জ হার্ভে ঝাঁকুনি দিয়ে জেগে উঠে কান পাতেন। তারের জালঘেরা জানলার পর্দা পুরো টানা। সেটি ভেদ করে ভোরের কুয়াশাচ্ছন্ন সোনালি সূর্যালোক চোখে পড়ে। জেগে উঠে

তার মনে হয় কিছুক্ষণ আগে সাইরেন বেজেছে যেন, তবে তা স্বপ্নে ঘটে থাকবে বলে তিনি সাব্যস্ত করেন। পরে সাইরেন অবিশ্রান্তভাবে বাজতে থাকলে তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন ৬টা ২০ বাজে। অকারণে লাফিয়ে উঠে স্লিপারে পা ঢোকানোর জন্য কসরত করতে থাকেন।

'জাহান্নামে যাক এই সাইরেন!' তিনি বিড়বিড় করে যুদ্ধের সময়কার স্মৃতিচিহ্ন সাইরেনকে অভিশাপ দেন।

দরজায় সহসা সশব্দ করাঘাত শুনে তার আবার চমক ভাঙে। ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে তিনি বেডরুম পেরিয়ে গিয়ে দরজা খোলেন।

'এত হুলস্থুল কীসের?' তিনি গর্জে ওঠেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে এ প্রকল্পের জন্য নিযুক্ত ক্ষুদ্র পুলিশ বাহিনীর প্রধান। গত সন্ধ্যায় বাঁধ দেখতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। বিস্ফারিত চোখে ভয়ার্ত কণ্ঠে সে বলে, 'ভয়ানক এক খুনের ঘটনা ঘটে গেছে, স্যার।'

জর্জ হার্ভে ভীতসন্ত্রস্ত কম্পিত পুলিশ কর্মকর্তার দিকে তাকিয়ে তার কথা বোঝার চেষ্টা করেন। 'কী বললেন? কাউকে সাইরেন বন্ধ করতে বলুন না, আপনার কথা তো বোঝা যাচ্ছে না।'

'সাইরেনের মাধ্যমে সতর্কবার্তা জানানো হচ্ছে, মি. হার্ভে। আমি আপনার কাছে রিপোর্ট করতে এসেছি। একজন ফোরম্যান খুন হয়েছে, দাঙ্গা বেঁধে গেছে।'

ভালো করে শোনার জন্য জর্জ হার্ভে চোখ কুঁচকে সামনে ঝোঁকেন। পরম স্বস্তিতে তিনি লক্ষ করেন, সাইরেনের বিকট আওয়াজ কমে আসছে। আওয়াজ তৈরির জন্য এরা বাষ্প বা সঙ্কুচিত বায়ু যা-ই ব্যবহার করে থাক, তা ফুরিয়ে এসেছে মনে হয়। এতক্ষণ যে টিকে ছিল সেটিই আশ্চর্য। কয়েক মিনিট অপেক্ষার পর তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে। ধীরস্থির হয়ে এবার বলুন হাঙ্গামাটি কীসের?'

পুলিশ কর্মকর্তা সাইরেনের উৎসের দিকে অস্থিরভাবে তাকায়, যেন তা থেমে যাওয়ায় বিরক্ত। তারপর ঘটনা বিবৃত করে। শেষে যেন-বা মার্কিন ভদ্রলোকটিকে নাড়া দেওয়ার জন্য বলে, 'কমিউনিস্টদের উসকানি দেওয়া দাঙ্গা, মি. হার্ভে?'

'আমাকে এসব বলার দরকার কী?' হতভম্ব ও ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'যান, গিয়ে জেলা কর্মকর্তাকে ফোন করুন। দাঙ্গা থামান।'

পুলিশের লোকটি চৌকস ভঙ্গিতে স্যালুট করে, বুটজুতায় খটাখট আওয়াজ ওঠে। 'ঠিক আছে স্যার, তবে কাউকে ফোন করার সময় নেই।'

জর্জ হার্ভে এবার দূরে উত্তেজিত লোকজনের শোরগোল শুনতে পান। কিছুক্ষণ সেদিকে উৎকর্ণ থেকে তারপর পুলিশ কর্মকর্তাকে বলেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। যান, গিয়ে দাঙ্গার একটি ব্যবস্থা করুন।'

পুলিশ কর্মকর্তাও ততক্ষণে গোলমালের উৎসের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তাকে যারপরনাই অসুস্থ দেখায়। জর্জ হার্ভের দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'আমাকে কিন্তু গুলিও চালাতে হতে পারে।'

'আমাকে বলছেন কেন?' মার্কিন ভদ্রলোক তেতে ওঠেন, 'যান, গিয়ে নিজের যা দায়িত্ব পালন করুন। দেখবেন, মেশিনপত্র যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।'

পুলিশ কর্মকর্তা তাকে আরেকবার স্যালুট করে সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে টারবাইন হাউসের দিকে ছুটতে থাকে। কিন্তু তার পা যে তাকে উল্টোদিকে টানছিল সেটি বোঝা যায়।

জরুরি কিছু ফোন করার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে হার্ভে বিড়বিড় করে বলেন, 'গর্দভ কোথাকার! শুধু স্যালুট করতে শিখেছে।'

৪

সেদিন আরো পরে সূর্য ওপরে উঠে এলে শর্টস ও গলা-খোলা সাদা শার্টপরিহিত জর্জ হার্ভে প্রজেক্ট অফিসে বসে সকালবেলার দাঙ্গার বিশদ বিবরণ শোনেন। সকালের পালায় কাজে যাওয়ার সময় খালেক নামে এক ফোরম্যান খুন হয়েছে। তখনো অন্ধকার কাটেনি। আশপাশে যারা ছিল তারা হয় কাজে যাওয়ার আগে গভীর ঘুমে মগ্ন অথবা কাজ সেরে এসে অবসন্ন তন্দ্রায় ঝিমাচ্ছিল। আচম্বিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি অনুধাবন করার মতো অবস্থা কারোরই ছিল না। একদল লোক রক্তপিপাসু শ্বাপদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, মুহূর্তে কাঠের গুঁড়ির মতো নিথর হয়ে যায় ফোরম্যানের দেহ।

'বোঝাই যাচ্ছে ঘটনার পেছনে ছিল পূর্বশত্রুতা। শ্রমিক ভাড়া করার দায়িত্ব ফোরম্যানরা পালন করে বলে প্রায়ই এদের মধ্যে নানা বিরোধ থাকে। ঘুষটুষ খাওয়া নিয়েই বাধে ঝামেলা।' দুপুর নাগাদ শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী নিয়ে জিপে করে হাজির হওয়া জেলা কর্মকর্তা বলেন, 'কেউ মুখ ফুটে বলবে না ফোরম্যানকে কে খুন করেছে। সবাই এখন বোবা-কালা সেজে থাকবে। কেউ ইচ্ছে করে, কেউ ভয়ে। তবে আমরা খুনির চৌদ্দগুষ্টিকেও ছাড়ব না। বোঝা যাচ্ছে, রাতের পালা শেষ করে ফেরার পথে তাকে খুন করা হয়েছে।'

অকস্মাৎ তার সামনে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকা পুলিশ কর্মকর্তাটির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'মি. হার্ভের সঙ্গে কথা শেষ করে দৌড়ে ফেরার পথে তুমি কী দেখেছিলে?'

জেলা কর্মকর্তাকে দেখে তার মধ্যে অস্বস্তি জেগেছিল, চোরা চোখে একবার তার দিকে চেয়ে সে বলে, 'দেখলাম টারবাইন হাউসের নিচে একদল লোক মারামারি করছে। আমি তাদের দাঙ্গা-ফ্যাসাদ থামিয়ে ছত্রভঙ্গ হওয়ার নির্দেশ দিই। কেউ আমার কথা শোনেনি। তারপর মনে হলো লোকজন টারবাইন হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মি. হার্ভে বলেছিলেন, মেশিনপত্র যাতে অক্ষত থাকে। কাজেই আমি গুলি চালাই।'

জেলা কর্মকর্তা কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলেন, 'কাজেই তুমি গুলি চালাও?'

'জ্বী, স্যার।'

হ্যাঁ, পুলিশ কর্মকর্তাটি কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে, ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হয়। দুটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে লোকজন প্রথমে নিশ্চুপ হয়ে যায়। তারপর কেউ একজন বুনো জানোয়ারের মতো গর্জে ওঠে, শুরু হয়ে যায় এক ভয়াল দাঙ্গা। পুলিশ কর্মকর্তাটির ভয়-ডর ততক্ষণে উবে গেছে। তার অধীনস্থ লোকজন নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যায়। দাঙ্গা থামলে দেখা যায়, আরো বেশ কিছু শ্রমিকের লাশ পড়ে আছে।

পুলিশ কর্মকর্তাটি গর্বভরে ঘটনার বর্ণনা দিতে থাকলে জেলা কর্মকর্তা শান্ত ভঙ্গিতে শোনেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার কি মনে হয় না গুলি না চালিয়েও দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল?'

এই প্রথমবার পুলিশ কর্মকর্তাটিকে সন্ত্রস্ত মনে হয়। একবার ঠোঁট চেটে নিয়ে সে জেলা কর্মকর্তার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে তিনি ঠাট্টা করছেন কিনা। তারপর বলে, 'না, স্যার।'

জর্জ হার্ভে সামনে ঝোঁকেন, 'তিনি আমাকে বলেছিলেন কমিউনিস্টদের মদদে দাঙ্গা বেঁধেছে। আপনি কি তাকে এ ব্যাপারে আরেকটু জিজ্ঞেস করবেন?'

জেলা কর্মকর্তা পুনরায় দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকা পুলিশ কর্মকর্তাটির দিকে ঈষৎ বিস্মিতভাবে তাকান, 'একি সত্যি?'

'হ্যাঁ, স্যার, কমিউনিস্টদের মদদ ছিল। গতকালই এখানে একজন কমিউনিস্ট এসেছে।'

জেলা কর্মকর্তা ভ্রূ-কুঞ্চিত করে এক প্রকল্প কর্মকর্তার দিকে তাকালে সে গলা খাঁকারি দিয়ে ঈষৎ অসংলগ্নভাবে বলে, 'একজন ভিজিটর এসেছিলেন গতকাল। ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একজন নেতা। এখানকার কাজকর্ম দেখার জন্য আমরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।'

'তুমি কি এর ওপর একটি প্রতিবেদন দেবে?' জেলা কর্মকর্তা পুলিশ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করেন।

'জ্বি, স্যার।' তারপর দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে সে একবার জর্জ হার্ভের দিকে আরেকবার জেলা কর্মকর্তার দিকে তাকায়।

'কিছু বলবে?' কর্মকর্তা জিজ্ঞেস করে।

'আমাকে গুলি চালাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল স্যার। মি. হার্ভে আমাকে নির্দেশ দেন।'

বিস্ময়ে মুখ হাঁ করে পুলিশ কর্মকর্তার দিকে তাকান জর্জ হার্ভে। জেলা কর্মকর্তাও তাঁর দিকে তাকান। বস্তুত এরপর নেবে আসা গভীর স্তব্ধতায় এক পুলিশ কর্মকর্তা ছাড়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে তাকায়। পুলিশ কর্মকর্তাটি আবার সোজা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। জর্জ হার্ভে স্তব্ধতা ভেঙে গর্জন করে উঠেন, 'কী যা-তা বলা হচ্ছে!'

জেলা কর্মকর্তা পুলিশ কর্মকর্তার দিকে চেয়ে দ্রুত নির্দেশ দেন, 'তুমি কি তোমার অফিসে ফিরে গিয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবে?'

'জ্বি, স্যার।' সে সিনিয়র অফিসারকে স্যালুট করে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চশমার কাচ পরিষ্কার করে জানালার বাইরে তাকান আবদুর রব। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ে। রাস্তার ওপারে বিস্তীর্ণ প্রাচীন গাছপালার বৃষ্টিস্নাত শীর্ষদেশের দিকে তিনি তাকিয়ে থাকলেও কিছুই দেখেন না, গভীর ভাবনায় ডুবে থাকেন।

নির্বাচনে আবদুল কাদেরের পিপলস পার্টির সঙ্গে আর যেসব ক্ষুদ্র দল একত্রে জোট বেঁধেছিল আবদুর রব তারই একটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বাকি দুটি ক্ষুদ্র দল তাদের নির্বাচনী দাবি-দাওয়া ত্যাগ করে মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছে। আবদুর রব ও তার ক্ষুদ্র দল সগর্বে একলা চলার নীতি ঘোষণা করে। তারা এখনো তাদের পুরনো রাজনৈতিক বিশ্বাসে অটল।

তার দলের নীতি চূড়ান্ত করার পর আবদুর রব ঘোষণা করেন, 'শত্রু যখন সবদিক থেকে কাবু করে ফেলে আত্মসমর্পণকেই তখন সবচেয়ে সহজ সমাধান বলে মনে হয়। কিন্তু আমরা তা করব না।' এক অনুসারী একদা তার সম্পর্কে বলেছিল, 'এ এক আজব ঘাড়ত্যাড়া লোক।' তিনি এখন সে কথার সত্যতার প্রমাণ দিচ্ছেন।

পর্দাবিহীন জানালা দিয়ে চেয়ে থেকে আবদুর রব যখন অতল ভাবনায় বিচরণ করেন, তখন পাশে বসে পুরনো বন্ধু মনিরুদ্দীন সকালের খবরের কাগজ পড়েন, তার এক হাত কানের লতিতে খেলা করে। এক সময় আবদুর রব দৃষ্টি ফিরিয়ে কৌতুকের স্বরে বলেন, 'আমাদের বন্ধু আমাদেরই বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করেছে। তারা আমাদের সর্বনাশ দেখতে চায়।'

মনিরুদ্দীন পত্রিকা থেকে চোখ না সরিয়ে বলেন, 'অবাক হওয়ার কী আছে?'

'কিন্তু আমাদেরও চুপ করে থাকা উচিত ছিল না, তাই না? পুলিশ কর্মকর্তাটি বিবৃতি দিয়েছে। কেউ গুলি করার নির্দেশ দিলে সেটি জর্জ হার্ভেরই তো দেওয়ার কথা।'

'এখন তো মনে হচ্ছে, তিনি নির্দেশ দেননি।' শান্ত কণ্ঠে বন্ধু মন্তব্য করেন।

আবদুর রব তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে তার দিকে তাকান। 'এই ঘোড়ার মুণ্ডু পত্রিকাটি সরাও।' মনিরুদ্দীন পত্রিকা সরালে তিনি বলেন, 'শোনো, জর্জ হার্ভে কী করেছে আর করেনি সেটি কোনো বিষয় নয়, হয়তো পুলিশ কর্মকর্তাটি দিশেহারা হয়ে নিজেই গুলির নির্দেশ দিয়েছে, পরে ঊর্ধ্বতনদের ভয়ে মার্কিনিটির ওপর দোষ চাপিয়েছে। ব্যাপারটিকে

এভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ তো সব সময়ই খোলা থাকে। সরকারও তাই করছে। কিন্তু কোনো ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া এক কথা আর সেই ঘটনার তদন্ত দাবিকারী একটি রাজনৈতিক দলের ওপর মিথ্যে ও ভয়ানক সব অভিযোগ চাপানো আরেক কথা। ঘটনার আগের দিন আমাদের এক নেতা ওই প্রকল্প পরিদর্শনে গিয়েছিল, শুধু এ জন্য এখন আমাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগ তোলা হচ্ছে।'

মনিরুদ্দীনকে অনাসক্ত ও বিচ্ছিন্ন দেখায়। এ ঘটনায় তিনি বিশেষ আগ্রহী নন, বলেন 'পুলিশ কর্মকর্তাটি যে নিজেকে বাঁচাতেই এসব কথা বলছে, তা প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু এ কথা কি অস্বীকার করা যায়, তোমার দলের একজন এ ঘটনার আগের দিন প্রকল্প এলাকায় গেছে, এবং শুধু তাই নয়, অত্যন্ত উসকানিমূলক প্রশ্ন করে বেড়িয়েছে? শ্রমিকদের এমন শোচনীয় অবস্থায় রাখা হয়েছে কেন, আমেরিকানদের এত বেতন দিয়ে না রাখলেই কি নয়—এসব প্রশ্ন যাদের সামনে উচ্চারণ করা হয়েছে, তারা এখন সাক্ষী দিতে রাজি।'

'সে মার্কিন দূতাবাসের আমন্ত্রণে ওখানে গেছে, তারাই প্রকল্প ঘুরিয়ে দেখাতে চেয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পটির ব্যয়ের অংশবিশেষ আমরাও বহন করছি। কাজেই আমাদের কেউ গিয়ে এ রকম দু-একটি প্রশ্ন তুলতেই পারে, তাই না? এ সফরের সঙ্গে দাঙ্গা ও হার্ভের কথিত নির্দেশের সম্পর্ক কী?'

মনিরুদ্দীন হয়তো ভাবেন এ বিষয়ে যথেষ্ট বলা হয়েছে, কাজেই তিনি পূর্ববৎ পত্রিকার পাতা উঁচু করে ধরে দুর্ভেদ্য নীরতায় ডুবে যান।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবদুর রব বলেন, 'তাহলে তুমি মনে করো পুলিশ কর্মকর্তার বিবৃতির বিষয়টি তদন্তের দাবি তুলে আমি ভুল করেছি?'

আবদুর রবকে বিস্মিত করে পত্রিকার পাতার ওপার থেকে উত্তর আসে, 'হয়তো তোমার উপায় ছিল না। কিন্তু এবার তো তুমি মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছ। ভুলে গেলে চলবে না, তোমরাই হার্ভেকে ডেকে এনেছ। তার দেশ এ কাজে ইতিমধ্যে ২০০ কোটি টাকা খরচ করেছে।'

'ওদের সরকারি মুখপাত্র কী বলে?' আবদুর রব এ কথা জিজ্ঞাসা করে একটি ফাইল থেকে পেপার ক্লিপিং তুলে নিয়ে নিজেই তার অংশবিশেষ পড়তে শুরু করেন :

'এ অভিযোগ স্পষ্টত ভিত্তিহীন হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, শুধু যে এ জাতীয় একটি নির্দেশ প্রদান করা মার্কিন কারিগরি সহায়তা কর্মসূচির পরিচালক জর্জ হার্ভের এক্তিয়ারের বাইরে ছিল তাই নয়, একটি সার্বভৌম দেশের একজন পুলিশ কর্মকর্তা যে এ জাতীয় ব্যাপারে একজন বিদেশীর পরামর্শ চাইবে—সেটিও কল্পনাতীত।

'প্রকল্প এলাকায় দাঙ্গার সঙ্গে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক দলের যোগসাজশ খুঁজে না পেলে সরকার দৃশ্যত এ রকম একটি বানোয়াট রিপোর্টকে একটি ইস্যুতে পরিণত করায় দলটির প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে বাতিলই করে দিত। এখন বলা যায়, নির্মীয়মাণ ব্যয়বহুল জলবিদ্যুৎ বাঁধটির নির্মাণকাজ পণ্ড করার লক্ষ্যে এ দলটি গোলযোগ সৃষ্টির জন্য শ্রমিকদের উসকানি দিয়েছে। এ সরকার রাজনৈতিক দলটির বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে, এ দলের রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের কথা সবাই অবগত।'

আবদুর রব পড়া শেষ করে লম্বা বিরতি দিয়ে আবার বলেন, 'আমাদের বন্ধুরা একটিই ভুল কাজ করেছে, তারা পুলিশ কর্মকর্তাটিকে বরখাস্ত করেছে। যদি সে এ

জাতীয় কথা না-ই বলে থাকে, তাহলে তাকে বরখাস্ত করা হলো কেন? আর যদি সে ভয়ের চোটে কাণ্ডজ্ঞানহীন কথা বলেই থাকে, তাহলেই-বা তাকে কেন বরখাস্ত করা হলো? এখন তো শুনছি তাকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। কেন? কেননা, আমাদের বন্ধুরা ভেবেছে, সেটি করাই নিরাপদ।' কথা থামিয়ে তিনি মনিরুদ্দীনের দিকে তাকান, 'আমাদের বন্ধুরা এখানেই জট পাকিয়ে ফেলেছে। এখন যথাযথ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আর মানব না।' এটুকু বলে তিনি ঘোষণা করেন, 'আমি আমাদের নির্বাহী কমিটির জরুরি সভা ডাকব।'

তার বন্ধুর মুখে বিরক্তিভাব ফুটে ওঠে। তিনি পত্রিকার পাতায় আবার ডুব দেন। আবদুর রব কিছুক্ষণ তার নিজের চিন্তার জগতে ভেসে বেড়ান। তারপর উঠে গিয়ে ঘরের কোণে জীর্ণ এক কাঠের কেবিনেটের ভেতর থেকে আরেকটি ফাইল বের করে আনেন। সাবধানে সেটি খোলেন, আলগোছে পাতা ওল্টান এবং বাঁ হাতের তালু দিয়ে চেপে মসৃণ করেন।

'এই যে পেয়েছি, দৈনিক আলোর প্রতিবেদন।' তিনি ঘোষণা করেন, 'তোমাকে পড়ে শোনাই।' তার বন্ধু কোনো আগ্রহ দেখায় না, কেননা এ প্রতিবেদন তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। একবিন্দু হতোদ্যম না হয়ে আবদুর রব তরুণ মফস্বল প্রতিনিধিটির প্রতিবেদন পাঠ করতে থাকেন যে প্রতিবেদনের কারণে ছেলেটি চাকরি হারিয়েছে।

'সাত মাইলের দূরত্বের খানিক বাসে, খানিক ধীরগতির দেশী নৌকায় দুঘণ্টায় পাড়ি দিয়ে আমাদের সংবাদদাতা প্রকল্প এলাকায় পৌঁছে দেখে পুরো জায়গা জুড়ে মানুষের কর্মকাণ্ডের গুঞ্জন। মেঘহীন আকাশ থেকে সূর্যের নির্মম চাবুক নেবে আসছে মানুষ ও মেশিনের ওপর। এরা উভয়েই এমন এক উচ্চাভিলাষী প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করে যাচ্ছে, যে প্রকল্প শীঘ্রই আমাদের লাখ লাখ মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদার সহায়তা ছাড়া এ প্রকল্প নীলনকশা পর্যায় কোনোদিনই হয়তো পার হতে পারত না।

'সূর্যের গনগনে আঁচ ছাড়া কোথাও নিষ্ঠুরতার কোনো আলামত নেই। এখানে যে মাত্র গতকাল এক রক্তাক্ত দাঙ্গায় নয়জন শ্রমিক মারা গেছে, তার কোনো চিহ্নই আজ আর নেই। এ ব্যাপারে পরবর্তী তদন্ত ঝুলিয়ে রেখে সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করছে। তবে আমরা জানতে পেরেছি, খালেক নামক এক ফোরম্যানের হত্যাকাণ্ড থেকে ঘটনাটির সূত্রপাত ঘটেছে। কারা তাকে খুন করেছে, তা এখনো উদ্ধার করা যায়নি। এ হত্যাকাণ্ডের কারণে দাঙ্গা শুরু হলে পুলিশ গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়। এতে দুজন দাঙ্গাকারী নিহত হয়। পুলিশের এ পদক্ষেপের কারণে দাঙ্গা আরো ছড়িয়ে পড়ে। সহিংসতা তীব্র রূপ ধারণ করে। আরো শ্রমিক প্রাণ হারায়। কিছু যন্ত্রপাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

'এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের পেছনের উদ্দেশ্য ও জনতার পরবর্তী উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কারণ উন্মোচিত হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, বিশেষ একজন পুলিশ কর্মকর্তা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হতাহতের ঘটনার জন্য বহুলাংশে দায়ী। তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি শুধু কৌশল ও বিবেচনাবোধ প্রদর্শনেই ব্যর্থ হননি, অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তিও করেছেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জেরার জবাবে তিনি বলেছেন, মার্কিন কারিগরি সহায়তা কর্মসূচির সফররত প্রধান জর্জ হার্ভের বিশেষ নির্দেশে তিনি গুলি চালিয়েছেন।'

আবদুর রব পড়া থামান, তারপর বন্ধুর দিকে না তাকিয়ে যেন নিজের মনে বলতে থাকে, 'আমরা যখন এ দাবি জানাতে শুরু করলাম যে, হার্ভের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্মকর্তাটির অভিযোগ তদন্ত করতে হবে, তক্ষুনি পর পর তিনটি ঘটনা ঘটে। প্রথমত, পুলিশ কর্মকর্তাকে দ্রুত পুনর্বহাল করা হয়। দ্বিতীয়ত, প্রতিবেদক তার চাকরি হারায়। তৃতীয়ত, পুলিশ কর্মকর্তাটির এ জাতীয় বক্তব্য প্রদানের বিষয়টি অস্বীকার করে সরকার একটি বিবৃতি দেয় এবং আমাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগ তোলে।'

মনিরুদ্দীন পত্রিকা নাবিয়ে রেখে সোজাসুজি তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'একটি কথা জিজ্ঞাসা করি : মার্কিন ভদ্রলোকটি যদি গুলি করার নির্দেশ দিয়েই থাকে—সেটি অবশ্য সত্য নাও হয়ে থাকতে পারে—তাও কি ব্যাপারটি খুব আপত্তিকর? তিনি এখানে সব রকম অর্থনৈতিক সহযোগিতা দেওয়ার পেছনে ভূমিকা রেখেছেন। যে প্রকল্পের পেছনে তার সরকার এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ঢেলেছে, সেটি রক্ষা করতে তিনি হয়তো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেননি। এমন দামি দামি মেশিনপত্র চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখাই কি তার উচিত হতো?'

'কোনো পরিস্থিতিতেই গুলি করার নির্দেশ তিনি দিতে পারেন না। তাছাড়া ইচ্ছা করে একটিও মেশিন বা উপকরণ নষ্ট করা হয়নি।'

'ধরা যাক, তদন্ত করে জানা গেল মার্কিন ভদ্রলোক নির্দোষ, তাহলে তোমার অবস্থা কী দাঁড়াবে?'

'কিন্তু বিষয়টির তদন্ত হওয়া দরকার। আমরা নিশ্চুপ বসে থাকতে পারি না।'

'তুমি তাহলে তোমার তদন্তের দাবিতে অটল?'

'হ্যাঁ, অটল।' তারপর বন্ধুর দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'আমি আগেই বলেছি প্রশ্নটি এখন আর তদন্তের দাবি নিয়ে নয়। আমাদের লড়তে হচ্ছে এ জাতীয় একটি তদন্তের দাবি তোলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। না, এভাবে চোখ রাঙিয়ে তারা আমাদের স্তব্ধ করতে পারে না।'

'তারা তোমাকে আঘাত করার ওজর খুঁজছিল। তাছাড়া তোমারও দোষ তো কম নয়। নির্বাচনী অঙ্গীকার পরিত্যাগ করার পর থেকে তুমিও তো তাদের বিরুদ্ধে অনর্গল গালিগালাজ করে যাচ্ছ। ওরা এবার মওকা পেয়েছে, তোমাকে উচিত শিক্ষা দেবে। তোমার বিরুদ্ধে আমাদের ত্রাতা ও মিত্রের বিরুদ্ধে দাঙ্গা সৃষ্টির অভিযোগ এনেছে।'

আবদুর রব কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে থাকেন, তারপর দাঁত পিষে বলেন, 'আমিও দেখে ছাড়ব।'

সহসা তার বন্ধুর মুখে কেমন এক ছায়া পড়ে। তিনি আবদুর রবের দিকে তাকিয়ে নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী করতে পারবে তুমি?'

স্পষ্টত তিনি এমন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তার ছেলেবেলার বন্ধুর লড়াই করার ক্ষমতা খুব একটা দেখতে পান না। তাছাড়া এখন তার বয়স হয়েছে, বিরাট পরিবার টানার লোক নেই।

আবদুর রব জবাব দেন না। মনিরুদ্দীন বিষণ্ন কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার এসব করার দরকার কী? এতে তোমার ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হবে না।'

আবদুর রব পূর্ববৎ জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকেন। বৃষ্টি সেরে গেছে। আকাশে এখনো স্তরীভূত মেঘ। তিনি জানেন, বন্ধুর প্রশ্নের কোনো জবাব তাঁর কাছে নেই। কিছু বিশ্বাস, কিছু আদর্শ আজীবনের বন্ধুকেও বলা যায় না, বিশেষত এই বৃদ্ধ বয়সে তো

নয়ই। বয়স হয়ে গেলে সবাই এসব বিষয় গোপন করতে শেখে, এসব বিষয় হয়তো বন্ধুত্বের ভিত্তিকেই নড়বড়ে করে দিতে পারে।

না, তিনি তাকে জানাতে পারেন না, কেন তাকে লড়াই করে যেতেই হবে। বলতে পারেন না, বিপক্ষ শক্তি আজ এমন শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি আর ভয় পান না। তিনি বন্ধুকে বলতে ব্যর্থ হন, কী অকল্পনীয় তীব্রতায় তিনি মুক্তিকে, নিজের মুক্তিকে, মূল্যবান ভাবতে শুরু করেছেন। তিনি এও জানেন, তাঁর চারপাশের মানুষের মুক্তি ছাড়া তাঁর একার মুক্তির কোনো অর্থ হয় না। তাদের সবার বন্ধন ছিন্ন না হলে তিনি নিজেও মুক্ত হতে পারবেন না।

হ্যাঁ, তারা স্বাধীনতা পেয়েছে, কিন্তু অতিদ্রুত দেশ আবার দাসত্বের নিগড়ে বাঁধা পড়েছে : এবার দাসত্বের রূপ ভিন্ন, সহজে চেনা যায় না। আসল রূপ দেখার উপায় নেই। কিন্তু কেউ একবার তার চেহারা দেখে ফেললে বেদনায় দষ্ট হয়।

সরকারের লোকজন বলে, 'ওদের ছাড়া আমরা টিকতেই পারব না, ওরা টাকা না দিলে কেউ মাসের ১ তারিখে বেতনের চেক হাতে পাবে না।' এ কথা শুনে কি কৃতজ্ঞতায় অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠা উচিত? অন্তরে বরং রক্তক্ষরণ হয়। না, তিনি কিন্তু মুক্তির বিনিময়ে দারিদ্র্য মেনে নিতে রাজি ছিলেন। তিনি ক্রেতা হতে চেয়েছেন, ভিক্ষুক নন; তিনি কৃপা চাননি। দেশকে এই করুণা ও পরাধীনতার অপমান থেকে মুক্ত করতেই হবে।

না, তার হৃদয়ের গভীরে বয়ে বেড়ানো সুরক্ষিত এসব অনুভূতি তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও জানাতে পারেন না। কারণ বন্ধুর কাছে মুক্তি শব্দের অর্থ অদ্ভুত কিছু একটা, এমনকি হাস্যকর।

আবদুর রব সহসা তার বন্ধুর দিকে ফিরে হিংস্র গলায় বলেন, 'তোমাকে বলছি, যা আমি করতে চাই কেন তা করতেই হবে। আমার মাথায় ছিট আছে।'

'কী যে ঠাট্টা করো।' বন্ধু পত্রিকা ভাঁজ করতে করতে বলে।

'কাল আমি একটি জনসভা ডাকছি। সমাবেশ ও ধর্মঘট ডাকব। ওইদিন সকালের ঘটনা আমাদের দেশের জন্য ভয়ানক গুরুতর একটি বিষয়। হুমকির মতো শোনাক বা না শোনাক, বলে রাখছি, আমরা তা সহ্য করব না।'

'তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হার্ভে নির্দোষ।'

'হার্ভে?' কৃত্রিম বিস্ময়ে আবদুর রব জিজ্ঞাসা করেন, 'হার্ভেটা কে?'

'তুমি তো সত্যিই ঠাট্টা শুরু করলে।'

আবদুর রব সহসা অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। মনিরুদ্দীন বুঝতে পারেন না, ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা নিজের ওপর হঠাৎ কেন এত খুশি হয়ে উঠেন।

রাজনীতিবিদদের চোখ-মুখের উদ্ভাস লক্ষ করে তিনি বিষণ্ন কণ্ঠে বলেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে সাবধান করে গেলাম।'

তৃতীয় অধ্যায়

১

রাষ্ট্রদূত হথর্নের ডানহাত কিছুক্ষণ অসহায় ভঙ্গিতে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। তারপর যেন দৈবক্রমে সেটি টেলিফোন সেটের স্পর্শ পায়। অনেকক্ষণ টেলিফোন বাজার পর সহসা সেটির রিং বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কাজ করলে মানুষ যেভাবে ঝটপট ফোন তোলে, সেভাবেই ফোন তোলেন হথর্ন, তখনো চোখ বোজা। জড়িত কণ্ঠে বলেন, 'হ্যালো।'

'স্যাম বলছি, মি. অ্যাম্বাসেডর', চাপা কণ্ঠে স্যামুয়েল কনডন বলে। 'অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

'একটা মিনিট দাঁড়াও', রাষ্ট্রদূত হথর্ন তার বিরক্তি গোপন করে বলেন। তারপর বিছানার পাশে রাখা ল্যাম্প জ্বেলে বালিশে আরো উঁচু হয়ে শোন। 'ব্যাপার কী স্যাম?'

'কিছু তথ্য পাওয়া গেছে, যা খুব জরুরি বলে মনে হচ্ছে। আমি এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, স্যার।'

'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না?'

'যায় না, মি. অ্যাম্বাসেডর।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আসো।'

রাষ্ট্রদূত তক্ষুণি বিছানা ছেড়ে না উঠে বিরক্তির ভাব করে বসে থাকেন। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর, পরপর তিন রাত দেরি করে ঘুমাতে হয়েছে, এ বয়সে এভাবে আর অনিয়ম সইবে না। সশব্দে হাই তুলে উঠে পড়েন, গায়ে ড্রেসিং গাউন মুড়ে প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে শীঘ্র তাঁকে নেবে আসতে দেখা যায়।

মাইকেল হথর্নের স্ত্রী হেলেন গত দু সপ্তাহ ধরে সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। হয়তো আরো তিন সপ্তাহ বাইরে থাকবেন, যদি না ফেরার পথে জাপানে মেয়ের ওখানে অবস্থানের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত করেন। স্ত্রীকে ছাড়া এ বিশাল দোতলা বাড়িটি হথর্নের কাছে ভয়ানক নিঃসঙ্গ বোধ হয়। হেলেন যাওয়ার পর থেকে এখানে তাকে শুধু নিজের নিঃশ্বাসের ধ্বনিই শুনতে হচ্ছে। এ উন্মুখতার কোনো মানে না থাকলেও তিনি নেই বলে হথর্নের হয়তো তাকে একটু বেশি বেশি মনে পড়ে গিয়ে থাকবে, হথর্নের হৃদ্‌যন্ত্রে সমস্যা আছে। গত কয়েক বছর হৃদ্‌যন্ত্র কোনো সমস্যা না করলেও একা হলেই নিজের

এ সুপ্ত রোগ সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন। মনে হয়, যেন নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, কিছুটা পশুর মতো, কেমন ভারী নিঃশ্বাস।

পড়ার ঘরে পৌঁছানো মাত্র ড্রাইভওয়েতে স্যামুয়েল কনডনের গাড়ির চাকাঘর্ষণের শব্দ পাওয়া যায়। গাড়ির উজ্জ্বল আলোয় গাছ-গাছালিঘেরা বিশাল একখণ্ড জমির ওপর নির্মিত রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের সাদা চুনকাম জ্বলজ্বল করে ওঠে। পড়ার ঘরে প্রবেশ না করে রাষ্ট্রদূত দরজা খোলার জন্য ঘোরেন।

কয়েক মুহূর্ত পর বাদামি-লাল ম্যান্টলপিসসহ বানানো নকল ফায়ারপ্লেসের সামনে স্যামুয়েল কনডনের সঙ্গে আরামদায়ক চেয়ারে বসা রাষ্ট্রদূত।

'কথাটা, স্যার, আবদুর রব সংক্রান্ত', কনডন বলে। তার কপাল ঘামে চকচক করে। 'আগামীকাল বিরাট এক মিছিলের আয়োজন করছেন তিনি। প্যারেড গ্রাউন্ডে এ মিছিল শেষ হলে সেখানে গরম গরম বক্তৃতাবাজি হবে।'

ক্ষুদ্র একটি দলের অপরিচিত এক নেতার রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাট আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার মতো বড় ঘটনা নয়। তবে আজকাল নামগোত্রহীন রাজনৈতিক নেতারাই একের পর এক ঝামেলা পাকিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের এ কথা মনে পড়ে।

'কোকা বাঁধের ঘটনা নিয়ে মিছিল তো?'

'হ্যাঁ, স্যার। কাল কী কী আয়োজন করা হবে আজ রাতে দলের নির্বাহী কমিটির সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন।'

মাইকেল হথর্ন কিছুক্ষণ নীরব থেকে বিরক্ত ভঙ্গিতে বলেন, 'ভেবেছিলাম ঘটনাটি শেষ হয়ে গেছে। খামোখা পানি ঘোলা করা হচ্ছে। ওরা নিজেরাও জানে হার্ভে গুলি চালানোর নির্দেশ দেয়নি।'

'এরা ঘোঁট পাকানোর চেষ্টা করছে মনে হয়। সুষ্ঠু তদন্তের দাবি তুলবে তারা।'

রাষ্ট্রদূতের চেহারায় এবার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। তিনি নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, 'রাতারাতি সবকিছু ওরা জোগাড় করতে পারবে?'

'ওরা হ্যান্ডবিল বিতরণ করবে।'

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে রাষ্ট্রদূত তার মাথা নাড়েন। 'সরকারের বরদাশত করার কথা নয়।'

'আপনি বোধ হয় প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করে দিতে পারেন।'

রাষ্ট্রদূত হথর্ন কিছুক্ষণ ভাবেন। নতুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এখনো তার তেমন ভাব জমেনি। শেষে তিনি বলেন, 'পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললে চলবে?'

'আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই, স্যার। সারা শহরে হ্যান্ডবিল ছড়িয়ে যাওয়ার আগেই কিছু একটা করতে হবে।'

'বেচারা', রাষ্ট্রদূত অকস্মাৎ বলেন। তিনি হার্ভের কথা ভাবছিলেন, তাকে এক কুটিল ভিত্তিহীন অভিযোগের শিকার হতে হয়েছে। তিনি ভাবেন, হ্যাঁ, নিরপরাধ মার্কিনিদের কাদায় পড়া থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রদূতেরই। হার্ভেকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের কারণ প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন। তিনি ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন, উল্টাপাল্টা কিছু ঘটতে দিতে রাজি নন। তাছাড়া এ অমূলক অভিযোগ থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের যে কোনো চেষ্টাও যে তিনি কঠোর হাতে দমন করবেন, তাও মনে হয়েছে।

'তুমি ঠিক বলেছ স্যাম। এক্ষুণি কিছু একটা করতে হবে। আমি শুধু ভেবে দেখছিলাম প্রধানমন্ত্রীকে এর সঙ্গে জড়ানো ঠিক হবে কিনা।'

স্যামুয়েল কনডনকে আশ্বস্ত মনে হয়। সে বলে, 'আমি নিশ্চিত তিনি আপনার উদ্বেগ বুঝবেন।'

কয়েক মিনিট পর রাষ্ট্রদূত হথর্ন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ফোন করেন। প্রধানমন্ত্রী এখনো শুয়ে পড়েননি জেনে তিনি খুশি হন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে জরুরি প্রশাসনিক বিষয়ে আলোচনা করছেন।

'তাহলে তো তাঁকে বিরক্ত না করাই ভালো', ঈষৎ হতাশার সুরে রাষ্ট্রদূত বলেন, এর জবাব কী আসবে তার আগেভাগেই জানা। একান্ত সচিব ফোন লাইন ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে নিতে গেলে রাষ্ট্রদূত রিসিভার নাবিয়ে রেখে অপেক্ষা করেন। কয়েক মুহূর্ত পর রিসিভার আবার কানে দিলে এক ক্লান্ত ভারী কণ্ঠ শোনা যায়, 'হ্যাঁ, ইয়োর এক্সেলেন্সি।'

অসময়ে বিরক্ত করার জন্য রাষ্ট্রদূত ক্ষমা চাইলে প্রধানমন্ত্রী মৌনভাবে তা গ্রহণ করেন। তারপর আবদুর রব কিংবা পরের দিন তার কর্মসূচির প্রসঙ্গ উলেখ না করে রাষ্ট্রদূত কেবল জানান, ইতিমধ্যে যথেষ্ট হয়রানির শিকার হার্ভেকে যেন আর হয়রানি না করা হয়, তিনি তা নিশ্চিত করতে চান।

প্রধানমন্ত্রী তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দেন। তিনি শুধু বলেন, 'আমি জানি।'

রাষ্ট্রদূত কিছুক্ষণ দ্বিধা করেন। প্রধানমন্ত্রী কি টের পাচ্ছেন, তিনি পরদিন আবদুর রবের কর্মসূচির কথা বোঝাতে চান?

প্রধানমন্ত্রী নীরবতা ভেঙে বলে ওঠেন, 'নিশ্চিন্ত থাকুন, শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি, জনাব প্রধানমন্ত্রী', হথর্ন ঝট করে জবাব দেন। তারপর রিসিভার নাবিয়ে রেখে চিন্তিত ভঙ্গিতে চিবুকে হাত বোলাতে বোলাতে সম্মুখে তাকিয়ে থাকেন। স্যামুয়েল কনডন এসব দেখে। অবশেষে রাষ্ট্রদূত যেন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

'ভদ্রলোককে আমার পছন্দ হয়েছে। মনে হচ্ছে, এর ওপর নির্ভর করা যায়।'

২

একবার ঘুম ভেঙে গেলে সহজে আর ঘুমাতে পারেন না রাষ্ট্রদূত হথর্ন। তাঁর চোখের কোণে যখন তন্দ্রার মেঘ ঘন হতে শুরু করেছে, ততক্ষণে তাঁর বাসভবন থেকে কয়েক মাইল দূরে গ্রিন স্টার প্রিন্টিং হাউসের হ্যান্ডমেশিন থেকে ঘটাং ঘটাং শব্দে হ্যান্ডবিল বের হতে শুরু করে। বাড়ির পেছনে নোংরা জঞ্জালে ভরা চালাঘরে ছাপার কাজ চলে। তুমুল আওয়াজ তুলে মেশিন চলে। তবে যে লোকটি মেশিন চালায়, ছাপা হওয়া কপির দিকে সে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে। নিকটে উদ্‌গ্রীব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা শীর্ণ এক লোক একতাড়া হ্যান্ডবিল তুলে নিয়ে আলগা খোলা তারে লাগিয়ে রাখা বৈদ্যুতিক বাল্বের নিচে ধরে ভেজা অক্ষরের ওপর চোখ বোলায়। লেখা পড়ে তাকে সন্তুষ্ট মনে হয়। এর মধ্যে যে আহ্বান জানানো হয়েছে তা সুলিখিত ও লক্ষ্যভেদী। এতে বলা হয়েছে, হার্ভের কর্মকাণ্ড সত্য প্রমাণিত হলে তা এ দেশের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন। তাছাড়া এ কর্মকাণ্ডের ফলে বেশ কিছু নিরপরাধ শ্রমিকের মৃত্যু ঘটায় এ বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত দাবি করার অধিকার জাতির আছে। হ্যান্ডবিলে সকল দেশপ্রেমিক জনগণকে পুরান শহরের

বাজারের ময়দানে সমবেত হয়ে মিছিল করে প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভাস্থলে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। আহ্বানে স্বাক্ষর করেছেন আবদুর রব নিজে।

আবদুর রবের কয়েকজন সহকর্মী এবং গ্রিন স্টার প্রিন্টিং হাউস থেকে ছাপা হওয়া একটি ক্ষুদ্র দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক পার্শ্ববর্তী মূল ভবন থেকে চালাঘরে এসে হ্যান্ডবিলগুলিতে চোখ বোলাতে থাকেন। সম্পাদক কিছুদিন আগেও একটি প্রাদেশিক বেসরকারি কলেজে ইংরেজি বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন, হ্যান্ডবিল পড়ে সম্মতির ভঙ্গিতে তিনি মাথা নাড়তে থাকেন, তারপর চতুর্দিকে আবছায়ার দিকে তাকান। ভবনের এ অংশটিতে তিনি তেমন আসেন না। দুটি হ্যান্ডমেশিন ও মান্ধাতা আমলের একটি ফ্ল্যাট-বেড প্রেসে প্রতিদিন কষ্টেসৃষ্টে তাঁর পত্রিকা ছাপা হয়, সে দৃশ্য বিশেষ মনোমুগ্ধকর নয়। নির্বাচনের ঠিক আগে বিপুল উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করেছিল। এটি এখন সরকারের সমালোচনা এবং একটি ক্ষুদ্র বিরোধী দলকে সমর্থন করে। অর্থনৈতিক অবস্থা বড় শোচনীয়, পত্রিকার টিকে থাকার জন্য জরুরি সরকারি বিজ্ঞাপন আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সরকারের ওয়াদাভঙ্গের জন্য তাঁর ক্ষোভ হয়, একই সঙ্গে এও মনে হয়, ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে আপস করলে নির্বাচনে তিনি ও আবদুর রব যে নীতির জন্য লড়েছেন তার অনেক জরুরি বিষয়ই বিসর্জন দিতে হবে। তাছাড়া একে আপসও বলা যাবে না। কেননা অপর পক্ষ আপসের হাত বাড়ায়নি। নির্বাচনের সময় যে নীরব সমঝোতা বিদ্যমান ছিল, অন্য দল আর তার তোয়াক্কা করে না। সম্পাদক এখনো বলেন, আলোচনার দরজা তিনি খোলা রেখেছেন। তবে তিনি জানেন, খোলা সদর দরজা দিয়ে কেউ আসবে না, বিশেষত এ হ্যান্ডবিল বিতরণ এবং তার সদ্যসমাপ্ত সম্পাদকীয় পাঠ করার পর তো নয়ই। এ চালাঘরে ঢোকার আগে তিনি তাঁর এ যাবৎকালের সবচেয়ে স্পষ্টভাষী ও জোরালো সম্পাদকীয়টি লিখে এসেছেন, পরদিন সকালের সংস্করণে সেটি বেরোচ্ছে। না, আর কোনো আপসের প্রশ্ন নয়। যার যার ভিন্নপথ বেছে নেওয়া হয়ে গেছে। সহসা তাঁর মনের কোণে আতঙ্ক উঁকি দেয়। তিনি বিস্মিত হন।

তাঁর এ ভয় অবশ্য অমূলক নয়। কিছুক্ষণ পর একটি শব্দ শুনে তিনি উৎকর্ণ হন, পাশের মানুষটির দিকে তাকান, তারপর দরজার দিকে মুখ ফেরান। এখনো দরজায় কেউ এসে দাঁড়ায়নি, তবে আঙিনায় ভারী বুটের আওয়াজ শোনা যায়। তারপর দরজায় কয়েকটি খাকি পোশাকের অবয়ব চোখে পড়ে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য কবরের নিস্তব্ধতা নেবে আসে, এমনকি ভারী বুটের আঘাতেও যেন বিন্দুমাত্র শব্দ উৎপন্ন হয় না। দরজায় উদয় হওয়া প্রথম ব্যক্তিটি চোরাচোখে তাকায়। সম্পাদক নিশ্চল দাঁড়িয়ে।

তারপর অকস্মাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙে। 'আপনিই কি ম্যানেজার?'

সম্পাদকের নিচের ঠোঁটে ক্ষীণ কম্পন সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, 'না, আমি সম্পাদক। কিন্তু তাতে কী, এখানে যা ঘটছে, তার সবকিছুর দায়দায়িত্ব আমার।'

'আপনি কি হ্যান্ডবিল ছাপছেন?'

সম্পাদক ক্রমশ স্তূপীকৃত হ্যান্ডবিলের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন। প্রিন্টার এখনো ছাপার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, তার চোখ ভাবলেশহীন।

'বন্ধ করুন', পুলিশ কর্মকর্তা নির্দেশ দেয়, তৎক্ষণাৎ হ্যান্ডমেশিন থেমে যায়।

এবার সম্পাদকের নিচের ঠোঁটের কম্পন আরো স্পষ্ট হয়।

'কেন?'

'আমার কাছে হ্যান্ডবিলগুলি জব্দ করার নির্দেশ আছে', পুলিশ কর্মকর্তা চকিতে সম্পাদকের দিকে তাকায়। সম্পাদক ফিরে তাকান না, সহসা তাঁর নিজের মধ্যে এক বিস্ময়কর অনুভূতি উথলে উঠতে থাকে। তবে তিনি কিছুই বলেন না। এমন পরিস্থিতিতে কার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব?

'আপনি কি আমাকে দেখাবেন, কাল আপনারা কী ছাপতে যাচ্ছেন?'

'ও আচ্ছা', সম্পাদক বলেন। তার নিচের ঠোঁট আর কাঁপে না।

৩

আবদুর রবের বৈঠকখানায় ম্লান আলো জ্বালানো। পর্দাবিহীন জানালার বাইরে ঝোপঝাড়ে শোরগোল তুলে ঝিঁঝি ডাকে। সিগারেটের পোড়া দাগে ভর্তি পালিশবিহীন ডেস্কের চারপাশে বসা কয়েকজন। তারা নিচু স্বরে কথা বলে, কারণ রাত্রি গভীর ও নিস্তব্ধ।

তাদের পরিকল্পনা সময় মতোই এগোচ্ছে। কালকের জনসভা ও মিছিলের আয়োজন করতে শহরের বিভিন্ন অংশে তাদের লোকজন ব্যতিব্যস্ত। আবদুর রব ইতিমধ্যে স্থানীয় একটি সংবাদ সংস্থায় বিবৃতি দিয়ে দিয়েছেন।

সহসা আবদুর রব বলে ওঠেন, 'আচ্ছা, হ্যান্ডবিলগুলি আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন?'

একজন দরজার দিকে তাকায়। বলে, 'যে কোনো সময় এসে পড়বে।'

আগামীকালকের কর্মসূচির জন্য আরো বেশি সময় হাতে নেওয়া উচিত ছিল বলে আবদুর রবের যে সহযোগী মতামত দিয়েছিল সে গজগজ করে বলে, 'সবকিছু খুব বেশি তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছে।'

'চিন্তার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে', আবদুর রব উত্তর দেন। তাঁর বিশ্বাস, মানুষের তাৎক্ষণিক আবেগ-অনুভূতি বসিয়ে রাখা চলে না। তাড়াহুড়োর আরেকটি কারণ আছে। সরকার পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই সব করে ফেলতে হবে। তিনি এতকিছু ব্যাখ্যা করেন না। শুধু বলেন, 'হ্যান্ডবিলগুলি এতক্ষণে এসে পড়া উচিত ছিল।'

৪

বেশ কিছুক্ষণ হলো মৃদু নাসিকাগর্জন সহকারে শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন রাষ্ট্রদূত। একটানা পরিশ্রমে ক্লান্ত প্রধানমন্ত্রী কেবল বিছানায় গা এলিয়েছেন। কয়েকজন সহকর্মী-পরিবেষ্টিত আবদুর রব শহরের বিভিন্ন স্থানের খবর ও হ্যান্ডবিল নিয়ে কর্মীদের আগমনের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। তখন সহসা তার সাদামাটা বাড়ির সামনে একটি জিপ এসে থামে, জিপের ব্রেক গড়গড় ও টায়ার ক্যাচক্যাচ করে ওঠে। দুজন পুলিশ কর্মকর্তা নেবে আসে দ্রুত। স্টার্ট দেওয়া ইঞ্জিনে হেডলাইট জ্বালিয়ে চালক অপেক্ষা করে।

ঘরে ক্ষীণ কোলাহল সৃষ্টি হয়, সবাই দরজার দিকে তাকায়। ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা আবদুর রবকে স্যালুট করে বলে, 'আপনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে।'

খানিক নিশ্চুপ থেকে আবদুর রব উঠে দাঁড়ান। 'আমার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারব? আমার এক ছেলে অসুস্থ।'

'অবশ্যই পারবেন', পুলিশ কর্মকর্তা বলে।

সহকর্মীদের একজন জিজ্ঞাসা করে, 'তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ কী?' আবদুর রব ভেতরের দরজার দিকে কয়েক পা বাড়িয়েছেন, তিনি এ সময় আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার জামাকাপড় ও অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের কী করা?'

পুলিশ কর্মকর্তা একটু দ্বিধা করে বলে, 'পরে চেয়ে পাঠাতে পারবেন।'

'তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ কী?' কর্মীটি আবার জিজ্ঞাসা করে। পুলিশ কর্মকর্তা নাক-উঁচু লোকটির দিকে তাকায়। ভেতরের দরজার দিকে ইশারা করে বলে, 'তিনি জানেন।' তারপর আরো বলে, 'আপনারাও সবাই জানেন।'

৫

ভোরের দিকে প্রধানমন্ত্রী গভীর ঘুমে তলিয়ে যান। ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটে আহসানের গভীর ঘুম হয়, নিকটবর্তী বৃক্ষ থেকে এক অভাগা পেঁচা ডাকে। পরিপুষ্ট আঁটসাঁট বালিশে আহসানের মাথা নড়ে ওঠে। কেউ একজন দরজায় কড়া নাড়ছে। তিনি চোখ মেলে অন্ধকার ছাদের দিকে তাকান। হ্যাঁ, কেউ দরজায় টোকা দিচ্ছে, খুব একটা শব্দ করে নয়, আলতোভাবে। পা দুলিয়ে উঠে পড়ে তিনি অন্ধকারে বালিশের নিচে চশমা জোড়া খুঁজতে থাকেন, শীঘ্র পেয়েও যান।

দরজা খুলে দেখেন তিনটি যুবকের ছায়া। সবচেয়ে লম্বা ছায়াটি ফিসফিস করে বলে, 'এত রাতে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। এক মিনিটের জন্য ভেতরে আসতে পারি, স্যার?'

আহসান লম্বা যুবকটিকে চিনতে পারেন, অন্ধকারেও যুবকের চেহারার খুঁটিনাটি তাঁর চোখে পড়ে। তিনি দরজা মেলে ধরেন।

তারা অপ্রতিভভাবে ঘরে প্রবেশ করে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে থাকে। তারপর তারা নিচু অনিশ্চিত কণ্ঠস্বরে আবদুর রবের গ্রেপ্তার হওয়া, পত্রিকা প্রকাশে হস্তক্ষেপ, মিটিং-মিছিলের ওপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা আরোপ—প্রভৃতি ঘটনা সম্পর্কে বলে। প্রত্যেকে একটু একটু করে তথ্য যোগ করে। তারপর নিস্তব্ধতা নেবে আসে। আহসান সহসা অনুধাবন করেন, তাঁর একটু বিরক্তি জাগছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাকে এসে এখন এসব বলছ কেন?'

যুবকেরা তক্ষুনি জবাব দেয় না, অস্থিরভাবে এ ওর দিকে তাকায়। তারপর লম্বা যুবক মনস্থির করে। নিজের পায়ের দিকে চেয়ে সে বলে, 'আবদুর রব যে দাবি তুলতে চেয়েছিলেন, আমরা সে দাবি তোলার জন্য সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'কিন্তু আমার কাছে কেন?' আহসান ঈষৎ কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করেন। লম্বা যুবক এ কর্কশতা অনুভব করে খানিক ঘাবড়ে যায়। 'কারণ, আমরা জানি না, কাজটি করা ঠিক হচ্ছে কিনা।'

আহসান ঘুরে দাঁড়িয়ে একটি চেয়ারে বসেন। যুবকদের দিকে না তাকিয়ে বলেন, 'বসো।' তিনি তাঁর বিরক্তি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। ভাবুক প্রকৃতির লম্বা যুবককে তিনি

পছন্দ করেন; সে তারই সেরা ছাত্রদের একজন। বিজ্ঞানে পড়া শ্যামলা-খাটো যুবকটিকেও তিনি চেনেন, ওর ভাই দু বছর আগে স্নাতক হয়েছে। তবে তৃতীয় যুবককে তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগে। লাজুক নিশ্চুপ যুবক বিশেষ কৌতূহলী, প্রচুর পড়াশোনাও করে। ওরা এখন সরকারের নির্দেশ অমান্য করার পরিকল্পনা করছে, এতে হয়তো ওদের ওপর শারীরিক আঘাতও নেবে আসতে পারে।

'কিন্তু তোমরা আমার কাছে কেন এসেছ?' আহসান আবার জিজ্ঞাসা করেন।

'কারণ আমরা জানি না কার কাছে যাব। আমরা জানি না, কাজটি যথাযথ কিনা।'

ওরা কি তাঁর কাছে নৈতিক সমর্থন চাইতে এসেছে? তিনিই ওদের কাছে মুক্তির গল্প করেছেন, তাই এমন একটা সময়ে ওদের তাঁর কাছে আসাই স্বাভাবিক। এ সিদ্ধান্তের পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে জেনেও তারা শুধু শুনে নিতে এসেছে, তাদের ভাগ্যে যা-ই ঘটুক, অন্তত তারা যথার্থ ছিল কিনা।

অবশেষে তিনি বলেন, 'না, কোকা বাঁধ প্রকল্পে আসলে কী হয়েছে আমি ঠিক জানি না।'

উত্তর শুনে যুবকেরা যেন-বা স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। তারা কিছুক্ষণ স্তব্ধ বসে থেকে চাওয়া-চাওয়ি করে। বিজ্ঞানের ছাত্রটি তখন বলে, 'আমরা শুধু দাবি তুলব, আমাদের সামনে সঠিক তথ্য বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরা হোক। ওখানকার ঘটনা সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে ঠিক, তা কীভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে? চুপচাপ তো বসে থাকা যাবে না।'

আহসান এতক্ষণ নিশ্চুপ ছিলেন। এবার মাথা নেড়ে বলেন, 'না। তোমাদের কিছু করার দরকার নেই। তোমরা বাড়ি যাও।'

যুবকদের বিহ্বল ও হতাশ দেখায়। লম্বা যুবক বলে, 'আমাদের কিছু হবে ভেবে আপনি কি ভয় পাচ্ছেন, স্যার?'

'না। আমি বুঝতে পারছি না, তোমাদের কিছু করা ঠিক হবে কিনা।' কিছুক্ষণ থেমে তিনি আবার বলেন, 'তোমরা বরং বাড়ি ফিরে যাও।'

যুবকেরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর কোনো কথা না বলে চলে যায়। অধ্যাপক দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় তা বন্ধ করার জন্য উঠে যান। পেঁচাটি এখনো ডাকছে।

অজ্ঞাত কারণে তাঁর মধ্যে এক অস্বস্তি ভর করে, তার ঘুম আসে না। দ্রুত ভোর হয়, পেঁচাটির ডাক থামে, কিচিরমিচির শুরু হয় অন্যান্য পাখপাখালির।

অধ্যাপক মনে মনে বলেন, না, ওদের কোনো ক্ষতি হবে না।

তিনি জানেন, ওরা ওদের সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

১

সকাল তখনও শীতল ও ঝরঝরে।

'সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের টেলিফোনে লাগাও', প্রধানমন্ত্রী বলেন। অপেক্ষার ফাঁকে সকালের সংবাদপত্রগুলির ওপর তিনি চোখ বুলিয়ে নেন। অধিকাংশ পত্রিকা বণিক সমিতির উদ্দেশে তাঁর গতকালে প্রদত্ত ভাষণ বড় বড় শিরোনামে ছেপেছে। কয়েকটিতে তাঁর ভাষণ দেওয়ার গতানুগতিক ছবিও ছাপা হয়েছে। কোনো সম্পাদকীয় মন্তব্য আছে কি না দেখার জন্য তিনি পৃষ্ঠা ওল্টাবেন এমন সময় টেলিফোন বাজে।

সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের ফোন। প্রধানমন্ত্রী প্রায় আধমিনিট ধরে শুনে যান, তারপর বলেন, 'বেশ।' তারপর ঝট করে রিসিভার রেখে দেন।

প্রায় একই সময়ে স্যামুয়েল কনডনও রাষ্ট্রদূতকে রিপোর্ট করে। সে বলে, 'সব কিছু ঠিকঠাক, স্যার।'

'শুনে খুশি হলাম', রাষ্ট্রদূত উত্তর দেন। কনডন ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার পর রাষ্ট্রদূত কয়েকবার মাথা নাড়েন। আর বিশেষ কথা হয় না। রাত্রির নাটক সন্তোষজনকভাবে এবং নিভৃতে শেষ করা গেছে।

বস্তুত দেশের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন গত রাতের নিঃশব্দ সংক্ষিপ্ত নাটকের কথা জানতে পায়। পুলিশ খুব দ্রুত আর দক্ষ হাতে কাজ সেরেছে। সকালের কোনো পত্রিকায় এ ঘটনার উলেখ নেই, যে একটিমাত্র পত্রিকায় এর উল্লেখের সম্ভাবনা ছিল সেটি প্রকাশিতই হয়নি। সেই পত্রিকার সম্পাদকের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর তার সহকর্মীদের কাছে এখনো পৌছেনি। ইতিমধ্যে একই কারাগারে নতুন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করিয়ে নিচ্ছিলেন আবদুর রব, কারাগার তাঁর কাছে বিশেষ কষ্টের স্থান মনে হয় না। শহর তখনও শান্ত, সকালবেলা পুলিশ তাদের নিত্যকার মতো কর্ম করে। বস্তুত এ যেন আর দশটি দিনের মতোই একটি দিন।

পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষীণ একটি সমস্যা দেখা দেয়। দুপুরের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের বিভিন্ন স্থানে সহসা কিছু হাতে লেখা পোস্টার দেখা যায়। নানাজন নানারকম প্রশ্ন করতে থাকে।

'আচ্ছা কোকা বাঁধ প্রকল্পে আসলে হয়েছিল কী?'

'নয় জন লোক যে মারা গেল, ট্রিগার চেপেছিল কে?'

'ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতাকে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? কোকা বাঁধ প্রকল্পের ঘটনা সম্পর্কে তিনি কী এমন জানতেন যে সরকারের কাছে এতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিলেন?'

কিংবা কেউ কেউ সরাসরি জিজ্ঞাসা করে, 'গত রাতে শহরে কী হয়েছিল?'

ভিন্ন কয়েকটি পোস্টারে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিকেল ৪টায় এক আলোচনাসভায় যোগ দেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। সরকার যে বাঁধের ঘটনাটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তাই নিয়ে সভায় আলোচনা হবে। এসব পোস্টার সহসা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গোচরে আসে এবং সেসব তুলে ফেলার নির্দেশ জারি করা হয় ও পুলিশকে জানানো হয়, কিন্তু ততোক্ষণে ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই তা পড়ে ফেলেছে এবং এদের মধ্যে যারা অনাগ্রহী ছিল, এমনকি তারাও সাব্যস্ত করে বৈঠকে উপস্থিত হয়ে অন্ততপক্ষে পোস্টারে কথিত রহস্যের বিষয়টি জেনে নেবে।

বিকেলে ছাত্ররা জড়ো হলে তিনটি ভ্যানবোঝাই বেয়নেটধারী পুলিশ নীরবে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরে অবস্থান নেয়। স্তব্ধ ও অশুভদর্শন খাকি পোশাকের সশস্ত্র পুলিশ দেখে কিছু যুবকদের মনে ভীতি সঞ্চারিত হয়, বাকিদের মনে পোস্টার-কথিত রহস্য আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এরপর আর পিছু হটা চলে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর শাখায় এক প্রশস্ত কক্ষে বসে উপাচার্য কোলের ওপর রাখা পুরু বইয়ের পাতা ওল্টান, সভা বাতিল করার ব্যাপারে ছাত্রদের বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করাতে মাঝে মাঝে তাঁর শিক্ষকদের পাঠান। তাঁর দূতেরা খুব একটা সাফল্য দেখাতে পারে না; তাঁর কক্ষের সন্নিকটে ছাত্রদের হট্টগোল কমে না।

উপাচার্য ক্রুদ্ধ হতে শুরু করেন। নিজেই নেবে গিয়ে ছাত্রদের সভা ভাঙার নির্দেশ দেবেন কি না, এ নিয়ে তিনি নিজের মনে বিতর্ক করছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ সুশৃঙ্খল মিছিল যেন বিস্ফোরিত হয়। পৃথুল উপাচার্য তাঁর বিশাল চেয়ার ছেড়ে ক্ষিপ্র বেগে উঠে জানালার কাছে যান, পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকান, যা দেখতে পান তার মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। ছেলেমেয়েরা পাগলের মতো চিৎকার ও আর্তনাদ করে এদিক-সেদিক ছুটে পালাচ্ছে। শীঘ্রই তিনি এ বিশৃঙ্খলার ভেতর একটি ছক লক্ষ করেন। মনে হয় ছাত্ররা হাট হয়ে খুলে থাকা বিশালাকার লোহার ফটকের ভেতর দিয়ে ছুটছে। পুলিশভ্যান তিনটি এভাবে তাদের ছত্রভঙ্গ করেছে। ছাত্ররা তাদের দিকে পাটকেল নিক্ষেপ করে। বাকিরা চত্বরের কোনায় স্তূপীকৃত ইট সংগ্রহ করে দেয়।

জানালায় ঠিকমতো শরীর টেনে আনার আগেই হট্টগোল ছাপিয়ে পরপর কয়েকটি গুলির শব্দ ভেসে আসে। তারপর সহসা চারিদিকে নিস্তব্ধতা নেবে এলে বর্তমানে আতঙ্কিত ও মুখ হাঁ হয়ে যাওয়া নিশ্চল উপাচার্য তাকিয়েই থাকেন, কী করণীয় তিনি ভেবে পান না। তারপর আবার স্তব্ধতা ভাঙে, এবার কর্ণবিদারী এক হৈচৈ, এর ফলে তাঁর সম্বিত ফিরে পেতে সহায়তা হয়। তিনি ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে নিষ্ক্রান্ত হন।

চিৎকার করতে করতে এ মুহূর্তে উল্টোদিকে ধাবমান ভিড় ঠেলে তিনি যখন ফটকে পৌঁছান, ততোক্ষণে রাস্তায় তিনটি ছাত্রের লাশ পড়ে থাকে, তাদের শরীর থেকে অবিশ্রান্ত রক্ত ঝরে।

২

সেই সন্ধ্যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে সংবাদ সম্মেলন ডাকেন।

বর্তমানে কড়া পুলিশ-প্রহরাধীন শহরের জনশূন্য নিথর সড়কপথে সংবাদকর্মীরা দ্রুত ছুটে চলে, সন্দিহান প্রহরীদের কাছে ঘনঘন ছাড়পত্র দেখিয়ে নিতে হয়, অনুমোদনহীন কেউ যাতে কারফিউ ভঙ্গ করতে না পারে প্রহরীরা তা নিশ্চিত হয়ে নিতে চায়। কাসেমকে এখানে-সেখানে সাইকেল থামাতে হচ্ছে, বারবার নাবতে হচ্ছে, কারণ অন্যদের মতো উইন্ডশিল্ডের ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে পেশাগত পরিচয়পত্র মেলে ধরার সামর্থ্য তার নেই, এ জন্যে যখন সে মন্ত্রীর কক্ষের করিডোরে পৌঁছায়, ততক্ষণে সেখানে বেশ বড়সড় ভিড় জমে গেছে। সহকর্মীরা নিচু কণ্ঠে কথা বললেও তাদের উদ্গ্রীব ভাব সে বুঝতে পারে, কেউ কেউ অপেক্ষা করে করে অস্থির। তার মনে হয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কী বলবেন, তা এদের আগেভাগেই জানা, তবে সে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ দরজা খোলে, তারা সদলবলে প্রবেশ করতে থাকে। নম্র অথচ অটল ভঙ্গিতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়।

ভেতরে ঢোকার পর তাদের চোখে পড়ে কাগজপত্রে নাক ডুবিয়ে রাখা মন্ত্রীর টাক মাথা, টেবিল ল্যাম্পের আলোয় সে টাক চকচক করে। কক্ষের নিস্তব্ধতার কারণে কাসেমের কাছে পরিবেশ ভয়ানক গুরুতর মনে হয়, তার হৃৎস্পন্দন সহসা ছন্দচ্যুত হয়। বয়সে সে এখনো তরুণ, পেশায় নতুন, এ জাতীয় সংবাদ সম্মেলনে গিয়ে অভ্যস্ত নয়।

একজন কর্মকর্তা সবার হাতে একটি করে কাগজ ধরিয়ে দিয়ে যায়। তাতে বড়জোর দশ-বারটি বাক্য লেখা। তারা যতোক্ষণে তা পড়ে, মন্ত্রী তাঁর কাজ চালিয়ে যান। কর্মকর্তাটি অন্ধকার কোণে মিশে যায়।

কাসেম দ্রুত দশটি লাইন পড়ে ফেলে, তারপর পৃষ্ঠা উল্টে দেখে উল্টোপিঠে কিছু লেখা আছে কি না, তারপর দেয়ালের দিকে চেয়ে বসে থাকে। কেউ একজন ক্ষীণ কেশে ওঠে।

সহসা টাক মাথা থেকে আর আলো বিচ্ছুরিত হয় না। 'আপনারা কি ওটা পড়েছেন?' মন্ত্রী শান্ত ও পরিষ্কার গলায় বলেন, তিনি ধীরে ভিড়ের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নেন।

সাংবাদিকরা জানায়, পড়া হয়েছে, তাদের কেউ কেউ পা নাড়াচাড়া করে।

কাসেম আরেকবার কাগজটির দিকে তাকায়। তার মনে হয়, লেখাগুলি তাকে হতাশ করেছে, কিন্তু কেন মনে হয়, সে জানে না। তথ্যবিবরণীতে একটি ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, ষড়যন্ত্রটি পাকিয়েছে কতিপয় রাষ্ট্রবিরোধী পক্ষ ও রাজনীতিবিদ, যারা 'চিহ্নিত বিদেশী শক্তির' পক্ষ হয়ে এ ধরনের কর্মকাণ্ড চালায়। চিহ্নিত বিদেশী শক্তিটির লক্ষ্য দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। সরকার যথাসময়ে ষড়যন্ত্রের জাল উন্মোচন করেছে, এর নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়েছেন। তথ্যবিবরণীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করে সরকারের পক্ষ থেকে গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, এ ঘটনায় যদি সত্যিকার অর্থে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয়, তবে তা পুলিশ সদস্যরা নয়, তারা 'আত্মরক্ষার' পদক্ষেপ নিয়েছে মাত্র, দোষী তারাই যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, কারণ তারাই পুলিশকে আক্রমণ করার জন্য নিরাপরাধ ছাত্রদের উসকানি দিয়েছে। তথ্যবিবরণীতে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে, নতুন সরকার দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির যে কোনো রকম ষড়যন্ত্র কঠোর হাতে গুঁড়িয়ে দেবে।

'ঠিক আছে?' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জিজ্ঞেস করেন, নিঃসন্দেহে তিনি প্রশ্ন আশা করছেন।

এক মুহূর্তে নিশ্চুপ থাকার পর একজন বিদেশী প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি ষড়যন্ত্রটির ব্যাপারে আরো সবিস্তারে বলবেন, স্যার?'

'না, তা বলা যাচ্ছে না। নিরাপত্তাজনিত কারণেই তা সম্ভব নয়। তাছাড়া এ বিষয়ে এখনো আরো বেশ কিছু তথ্য জানতে বাকি রয়েছে। এটি একটি গভীর ও গুরুতর ষড়যন্ত্র বলে মনে হচ্ছে।'

প্রতিনিধির খাতায় দ্রুত কলম চলে, তারপর সে তার কামড়ে থ্যাঁতা করা পেন্সিল তোলে।

'হুঁ?' মন্ত্রী তার ঠাণ্ডা চোখজোড়া তার ওপর নিবদ্ধ করেন।

'এ বিশেষ মুহূর্তে দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিশেষ কোনো কারণ আছে কি না বলবেন?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব। দেখুন, ষড়যন্ত্রকারীরা মনে করেছে, একটি নতুন সরকার ক্ষমতায় বসেছে, তাদের আঘাত করার এটিই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, নতুন সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, আমাদের কাছে এ বিষয়ে তথ্যপ্রমাণ আছে যে, একটি বিদেশী শক্তি—নির্বাচনের সময় যাদের মনে বিরাট আশার সঞ্চার হয়েছিল—নতুন সরকার তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে না দেখে ভীষণ হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছে। হতাশা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তারা পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

'তাই নাকি', খাতায় ব্যস্ত ভঙ্গিতে কলম ঘষতে ঘষতে বিড়বিড় করে সাংবাদিক। মন্ত্রী বিপজ্জনকভাবে চুপ করে থাকেন। কিছুক্ষণ তাঁর দৃষ্টি লোকজনের ক্ষুদ্র জটলার ওপর অস্থিরভাবে ঘোরে।

'আর কোনো প্রশ্ন?' অন্ধকার কোণের লোক জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ', একটি কণ্ঠস্বর মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'আপনি কি সেই বিদেশী শক্তিটির নাম বলবেন?'

মন্ত্রী বিস্ময়ভরে প্রতিবেদকের দিকে তাকান। বিদেশী শক্তিটির নাম তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। তিনি মাথা নাড়েন।

কাসেম দুর্বলভাবে তার গলা পরিষ্কার করে। 'শহরে গুজব শোনা যাচ্ছে।'

'কীসের গুজব?'

কাসেম অকারণে একবার ছাদ ও একবার ডানে দেয়ালের দিকে তাকায়, তার হাত পায়ের মাঝখানে গোঁজা। প্রশ্নটা করা ঠিক হবে কি না সে ভাবছে।

'কীসের গুজব?' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবার জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর চোখ শীতল।

'কেউ কেউ বলছে, কোকা বাঁধে গুলি চালানোর ঘটনার প্রতিবাদে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আজ বিক্ষোভ মিছিল বের করার পরিকল্পনা করেছিল।'

মন্ত্রী কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে থাকেন। 'হ্যাঁ, এটি সত্য। বিদেশী শক্তির নির্দেশে এ দলটি সংকট সৃষ্টির লক্ষ্যে কোকা বাঁধের মতো একটি তুচ্ছ ঘটনাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি চাই না, আপনারা কেউ এ নিয়ে কথা বলুন। তুললে আপনারা ষড়যন্ত্রকারীদেরই সাহায্য করবেন। আপনারা জানেন, এ অভিযোগের মধ্যে একবিন্দুও সত্য নেই।'

'আপনি কি বলতে চান, ষড়যন্ত্রকারীরা ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির লোক?' হ্যাংলা চেহারার পুরনো ধাঁচের স্টিলের গোল চশমা পরা আরেক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করে।

'এনডিপি আছে এর মধ্যে, তবে অন্য লোকজনও আছে। তাদের নাম বলতে আমার আপত্তি নেই। তারা হলো কমিউনিস্ট। এনডিপি সরকারের প্রতি অকারণ ঈর্ষা পোষণ করে, তারা কমিউনিস্টদের মদদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হ্যাঁ, এ দলটি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ভালোভাবেই জড়িত।'

কাসেমের মিনমিনে গলা আবার শোনা যায়। 'যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের কি কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে?'

মন্ত্রী আবার তার দিকে শীতল চোখে তাকান।

'তাদের নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' তারপর তিনি তাকান, এ সময় তাঁর কিছু একটা মনে পড়ে যায়। 'হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ বিকেলে যে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে, সে জন্যে এ ব্যর্থ ষড়যন্ত্রকারীদের দোসররা শাস্তি পাবে বলে আমরা আশা করি। উপাচার্য নিজে পুলিশকে দায়মুক্ত করেছেন। বলেছেন, পুলিশ ভুল করেনি। ছাত্ররাই বেরিয়ে এসে পুলিশকে আক্রমণ করেছিল। আমি চাই, আপনারা সবাই এ বিষয়টি স্পষ্ট করে লিখবেন।'

এটুকু বলার পর মন্ত্রী কাচের টেবিলে হাত রাখেন। সংবাদ সম্মেলন শেষ হয়।

মন্ত্রীর কার্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে এসে ভবনের পেছন থেকে কাসেম সাইকেল বের করে, তারপর জীর্ণ দ্বিচক্রযানটি ঠেলে রাস্তায় ওঠায়। সে ইতিমধ্যে সাব্যস্ত করেছিল, কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরবে, কিন্তু জনহীন রাস্তা দেখে কারফিউর কথা মনে পড়ে গেল, নিতান্ত অনিচ্ছায় সাইকেলে উঠে বসে সে পত্রিকা অফিসের দিকে প্যাডেল মারে। গন্তব্যে পৌঁছে প্রতিবেদন লিখে জমা দেয়। সেদিন হাতে আর কোনো কাজ না থাকলেও ডেস্কে বসে একখণ্ড কাগজে সে হিজিবিজি কাটে। কিছুক্ষণ পর সহসা যেন তার চমক ভাঙে।

উঠে বড় কক্ষটির অন্য কোণে গিয়ে সে এক সহকর্মীকে সংবাদ সংস্থার সেই তরুণ প্রতিবেদকের নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করে, কোকা বাঁধে গোলাগুলির ঘটনার ওপর প্রতিবেদন পাঠানোর কারণে যার চাকুরি চলে গিয়েছিল।

কাসেম যথাসম্ভব দ্রুত তার সঙ্গে দেখা করবে বলে সাব্যস্ত করে।

পঞ্চম অধ্যায়

১

প্রশস্ত বারান্দায় বসে ঝিমাতে থাকা এক শ্মাশ্রুল আর্দালি চোখ মেলে পিস কোরের তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকায়। মার্কিন তরুণটি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ানো, যে সাইকেলে চেপে ছয় মাইল পথ পাড়ি দিয়ে জেলা সদর দপ্তরে এসেছে তার হ্যান্ডেলবারে এক হাত রাখা, ইতিমধ্যে উষ্ণ হয়ে ওঠা সকালের রোদে তার মুখ লাল, পিঠের শার্ট জবজবে।

'জেলা কর্মকর্তা আছেন?'

আর্দালি তখনও তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সাদা মানুষ দেখলে তার মনে সর্বদা সম্ভ্রম জাগে। তবে সাহেবদের সে এতোদিন গাড়ি করেই আসতে দেখেছে, পরিপাটি পোশাকে। কোনো কথা না বলে সে শুধু মাথা নাড়ে।

'আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।' স্বেচ্ছাসেবক তার নামধাম ও কর্মস্থল আর্দালিকে জানায়। আর্দালির মনোভাবে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। সে শুধু এক বাক্যে বলে, 'তিনি নাশতা করছেন।'

উঁচু বারান্দার ধারে সাইকেল হেলান দিয়ে মার্কিন তরুণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে। 'আমি তাহলে অপেক্ষা করি।'

আর্দালির মুখের পেশী কুঞ্চিত হয়। একবার মনে হয়, সে যেন দাঁড়িয়ে যাবে। তবে সে শুধু বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারের দিকে নির্দেশ করে মুখ ফিরিয়ে শূন্যে চেয়ে থাকে।

মার্কিন তরুণের নাম এন্ড্রু। এ দেশে শিক্ষক, সমাজ-উন্নয়নকর্মী, রাজমিস্ত্রি, ছুতোর, মেকানিক, কৃষিবিদ এবং আরো বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত প্রায় দু শ পিস কোর স্বেচ্ছাসেবীর সে একজন। এন্ড্রু শিক্ষক, লম্বা গড়ন, শিশুতোষ মুখমণ্ডল, সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুদূর দক্ষিণাঞ্চলের লোক। নিজে সে তেমন ধার্মিক না হলেও তার বড় দুই ভাই যাজক হওয়ায় তার আচরণে স্বভাবজাত কিছু ধর্মপরায়ণতা প্রকাশ পায়। বাল্য থেকেই মানবপ্রেমকে সে সকল মানুষের কর্তব্যজ্ঞান করে। মানুষকে সেবা করার চিন্তা তাকে গভীরভাবে টানে। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন

জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে সে গোপনে বিদ্রোহ করেছিল। মানবজাতির ভুলত্রুটির কিয়দংশ সংশোধনের বাসনাতেই হয়তো সে পিস কোরে যোগ দিয়ে থাকবে।

এ দেশে আসার পর প্রথম কয়েক মাস এড্রুর ভালো লাগছিল। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার অতিশয় অজ্ঞতায় এতদিন সে নিতান্ত আড়ষ্ট বোধ করতো। কিন্তু এখানে এসে দেখছে, যাদের সেবা করতে এসেছে তাদের সঙ্গে তুলনায় তার মতো লোককেও রীতিমতো বিশেষজ্ঞ মনে হয়। মাথা খাটিয়ে এবং একটি অগ্রসর সমাজে বসবাস করার অভিজ্ঞতার সুবাদে বেশ কিছু লাগসই কর্মপন্থা সে বের করে ফেলে। বয়স্কদের শিক্ষাদানের একটি নিজস্ব পদ্ধতি সে উদ্ভাবন করে নেয়, যা স্বদেশে তার উর্ধ্বতনদের নজর কাড়ে। তবে যাদের সাহায্য-সহযোগিতা ভীষণ দরকার, তাদের জন্য কিছু একটা করতে পারছে, এটিই তার সন্তুষ্টির প্রকৃত কারণ। যে দেশ থেকে সে এসেছে, সেখানে একটি লোকের পক্ষে আরেকটি লোককে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করার সুযোগ কম।

তবে এ দেশে এড্রুর সুখী ভাব বেশিদিন স্থায়ী হয় না। নানাভি নির্বাচন ডাকার পর নির্বাচনী প্রচার যতোই বৃদ্ধি পায়, গ্রামেগঞ্জে তার উত্তাপ অনুভূত হতে থাকে। তবে এড্রুকে সবচেয়ে বেশি যা পীড়া দেয় তা হলো, পিস কোরের উদ্দেশ্য নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রন্টের সন্দেহ প্রকাশ। প্রথম দিকে বিষয়টিতে সে বিশেষ গা করেনি, কিন্তু একটা সময় আসে যখন তার সংগঠনের নামে এ জাতীয় কুৎসার জবাব না দিয়ে থাকা কোনো পিস কোর স্বেচ্ছাসেবকের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। শেষে সে সাব্যস্ত করে, পিস কোরের বিরুদ্ধে সমালোচনার জবাব অন্তত দিতে হবে। নিজেদের উদ্দেশ্যকে সে মহৎ মনে করে। এজন্যে এর পক্ষে দাঁড়াতে না পারলে দায়িত্বে অবহেলা করা হয়। কিন্তু সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে বাস্তবে ইউনাইটেড ফ্রন্টের সঙ্গে তার তিক্ততা সৃষ্টি হয়।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর এড্রু স্তম্ভিত হয়ে যায়। কয়েক দিন গভীর মর্মযাতনায় ভোগে। তার মনে হয়, এবার হয়তো তাকে এ দেশ ছেড়ে যেতে হবে, অথচ দেশটিকে সে চিনতে শুরু করেছে, এখানকার ভাষায় তার দক্ষতা এসেছে। সৌভাগ্যবশত এড্রুর আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে দ্বিগুণ উৎসাহে তার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সরকার ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটনের ঘোষণা দেবার দু সপ্তাহ পরে স্কুল থেকে ফেরার পথে এড্রু দুজন যুবাবয়সী লোককে দেখতে পায়। এদের সে আগে কখনো দেখেনি। লোক দুটি তার দিকে কেমন বিদঘুটে চকিত চাহনি দিয়ে দ্রুত প্রস্থান করে। পরদিন তাদের আবার দেখা যায়। কিন্তু আজ যেন তারা তাকে এড়িয়ে যেতে উগগ্রীব। সে তাদের সম্ভাষণ করলে ক্ষীণ প্রত্যুত্তর পায়। তার দিকে না তাকিরে দ্রুত চলে যায় তারা। বিকেলবেলা সে আমজাদকে এ অদ্ভুত লোক দুটির কথা বলে। গ্রামে আমজাদের সওদাগরি ব্যবসা, মাঝে-মাঝে সে গল্পগুজব করতে আসে। এড্রুর মনে হয়, কথাটি শুনে আমজাদের চোখে কিসের যেন একটি ছায়া পড়ে, সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে।

এড্রুর কৌতূহল বৃদ্ধি পেলে সে বলে, 'আপনি ওদের চেনেন নাকি?'

'না', আমজাদ জবাব দেয়। এড্রু টের পায়, আমজাদ মিথ্যে কথা বলছে।

আমজাদ সৎ, খানিকটা সহজ-সরলও, মিথ্যে কথা সে সচরাচর বলে না। বাকি সন্ধ্যা সে আর স্বস্তিবোধ করতে পারে না। তবে যাবার সময় ঘনিয়ে এলে সে অস্বস্তি

নিয়ে এন্ড্রুর দিকে তাকায়। 'আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন অচেনা লোক দুজনকে চিনি কি না। আমি সত্যিই তাদের চিনি না, তবে এটা জানি কী উদ্দেশ্যে তারা এখানে এসেছে। গ্রামে কিছু একটা হচ্ছে।'

'কী হচ্ছে?'

আমজাদ কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থাকে। 'রাতের বেলা করে সভা হচ্ছে।'

'সভায় কী হচ্ছে?'

'জানি না। তবে ওরা আপনাদের এবং আপনাদের দেশকে পছন্দ করে না।'

এন্ড্রু মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকা আমজাদের দিকে তাকায়। 'আমাদের পছন্দ করে না কেন?'

আমজাদ আবার কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে থাকে, সে যেন কিছু একটা নিয়ে নিজের সঙ্গে তর্ক করে, এতে শুধু তার অস্বস্তিই বাড়ে। তারপর নিচু কণ্ঠে সে দ্রুত বলে, 'আমি ওদের একটি সভায় গিয়েছিলাম।'

'তারপর জানতে পারলেন তাদের আলাপের বিষয়?'

'সেদিন সন্ধ্যায় তারা একজন মার্কিনির কথা আলাপ করছিল, সে কয়েকজন শ্রমিককে মেরে ফেলেছে। তারা বললো, সরকার লোকটির অপকর্ম ঢেকে রাখতে চায়, কারণ তার দেশের টাকায় সরকার চলে। এ অপরাধের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করছে, সরকার তাদেরকেও মেরে ফেলছে। আপনার প্রসঙ্গেও কথা উঠলো। ওরা আপনাকে পছন্দ করে না। বলছে, নির্বাচনের সময় আপনি ওদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।'

'আমি তো শুধু আমার কোরের পক্ষে কথা বলেছি', সহসা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে এন্ড্রু বলে।

'ওরা মনে করে না যে আপনি শুধু আমাদের সাহায্য করার জন্য এখানে এসেছেন', খোলাখুলি বলতে পেরে এখন কিছুটা ভারমুক্ত আমজাদ বলে চলে, 'ওরা বলে আপনার উদ্দেশ্য আছে। মিশনারিদের মতো উদ্দেশ্য। তবে মিশনারিদের চেয়েও আপনারা খারাপ, কারণ আপনারা একটি দেশের হয়ে কাজ করেন। যদি আমাদের দরিদ্র লোকজনের দুর্দশায় কাতর হয়ে আপনারা নিজ বিবেকে আসতেন, তাহলে অন্য কথা ছিল।'

এন্ড্রুর মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। কোনো কথা না বলে সে ছাদ থেকে ঝোলা কেরোসিনের লণ্ঠনটির দিকে চেয়ে থেকে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে। অবশেষে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার কী মনে হয়, ওরা যা বলছে, তা ঠিক?'

আমজাদ ভীতিবিহ্বল চোখে তাকায়। সেও নিজের মনে এ ফয়সালাই করার চেষ্টা করছিল। তাছাড়া তার ভয় হচ্ছিল, এন্ড্রু তাকে এ প্রশ্নটিই করতে পারে।

'আপনি জানেন, আমি আপনাকে পছন্দ করি। মা যখন রোগে শয্যাশায়ী হলেন, তখন আপনি তার জন্য কী করেছিলেন, আমি কোনোদিন ভুলব না।'

'আপনার কী মনে হয়, আমি কোনো কুটিল উদ্দেশ্যে সেটি করেছি?' এন্ড্রু জিজ্ঞাসা করে। তার কণ্ঠে ঈষৎ তিক্ত ভাব, কারণ আমজাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব তাকে আরো ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

'না। আপনি দয়ালু, সেজন্যেই করেছেন। আমি আপনার পক্ষে কথা বলেছি। কিন্তু ওরা বললো, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছেন বলে আপনাদের এসব ভালোমানুষির কোনো দাম নেই।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর এন্ড্রু বলে, 'ওরা কমিউনিস্ট বলেই এ কথা বলছে। ওরা আপনাদের দেশের বন্ধু নয়। আমার কথা বিশ্বাস করছেন?'

'করি', আমজাদ অনুচ্চ কণ্ঠে বলে।

'ওরা আমাদের ঈর্ষা করে। এ দেশের জনগণ আমাদের পছন্দ করুক ওরা চায় না। কারণ লোকে আমাদের পছন্দ করলে ওরা কোনো খারাপ কাজ করতে পারবে না।' কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে সে আবার বলে, 'কর্তৃপক্ষ মনে হয় এসব সভার খবর জানে না।'

আমজাদ বলেন, 'আমি জানি না।' তার চোখের অস্বস্তি ভাব দূর হয়েছে। সে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে কিছু একটা বলতে উদ্যত হয়েও আর বলে না।

২

আর্দালি উঠে বারান্দার সুদূর কোণে দরজাপথে নিষ্ক্রান্ত হয়। নিঃসন্দেহে তার কর্তাটির নাশতা খাওয়া এতক্ষণে শেষ হয়েছে। আর্দালি শীঘ্র হাজির হয়ে মার্কিন তরুণটিকে ভেতরে যাওয়ার ইশারা করে।

'তারপর? স্কুল কেমন চলছে?' কর্মকর্তাটি জিজ্ঞাসা করেন, এন্ড্রুর সঙ্গে তার সামান্য পরিচয় আছে।

'ভালো। ভিন্ন একটি ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি।' গ্রামের সভা এবং সে সম্পর্কে কীভাবে জ্ঞাত হয়েছে, সেসব সে কর্মকর্তাকে বলে। জেলা কর্মকর্তা নীরবে শোনেন, এন্ড্রুর কথা শেষ হলে কিছুক্ষণ চিন্তায় আচ্ছন্ন হন। তারপর বলেন, 'আমাকে এসে এসব কথা জানিয়ে ভালো করেছেন।'

এন্ড্রুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'আপনি তা মনে করেন জেনে খুশি হলাম। গুপ্তচর হতে কারো ভালো লাগার কথা নয়।'

'গুপ্তচর?'

'মানে ইনফরমার আর কী।'

পিস কোরের স্বেচ্ছাসেবকের দিকে চকিতে একবার তাকান জেলা কর্মকর্তা। তিনি বুঝতে পারেন, এভাবে দেখা করতে আসা এ মার্কিন তরুণের পক্ষে সহজ হয়নি।

'আপনি যা করেছেন, ঠিক করেছেন', সান্ত্বনার ভঙ্গিতে তিনি বলেন।

এন্ড্রুর মনে হয়, তার কর্তব্য শেষ হয়েছে, এবার যাওয়া উচিত। কিন্তু সে ওঠে না। গত রাত থেকে তার মনে একটি কথা খচখচ করছে। নিজেকে একটি প্রশ্ন তার করা হয়ে উঠছে না, এমনকি ইউনাইটেড ফ্রন্ট পিস কোরের বিরুদ্ধে যখন প্রকাশ্যে সন্দেহ প্রকাশ করে যাচ্ছিল, তখনও প্রশ্নটি তোলা হয়ে ওঠেনি। সে জেলা কর্মকর্তার দিকে চেয়ে থাকে, সৌম্য ঈষৎ দার্শনিক চেহারাই যেন, তাতে সদাশয় ভাব।

'আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?' আচমকা সে প্রশ্ন করে।

কিছুটা বিস্মিত ভঙ্গিতে জেলা কর্মকর্তা বলেন, 'অবশ্যই।' সহসা তাঁর মনে হয় যে গ্রামে এ যুবাটি কাজ করে, সেখানে হয়তো-বা সে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করে থাকবে।

এন্ড্রু দ্বিধা করে। 'আশা করি এ প্রশ্নে আপনি কিছু মনে নেবেন না। কিন্তু আমার জানা জরুরি।'

'বলুন না', ভদ্রলোক সদয় কণ্ঠে বলেন।

'এ দেশে আমরা অনেকে কাজ করছি। আমরা কঠোর পরিশ্রম করি, আপনাদের জনগণকে সত্যিই সাহায্য করতে চাই। কমিউনিস্টরা আমাদের পছন্দ করে না, আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারলে তারা খুশি, ঠিক আছে। কিন্তু আপনার কি মনে হয়, মানুষজন আমাদের কাজকর্মে সত্যি খুশি?'

'আমি নিশ্চিত ওরা খুশি।'

এন্ড্রু মৃদু হেসে মাথা নাড়ে। 'কথাটা বোঝাতে পারিনি। আমি যা জানতে চাই, তা হলো জনগণ আমাদের ওপর আস্থাশীল কি না। আমার মনে হচ্ছে, আস্থা যেন নেই। আমাদের বিরুদ্ধে কেউ তাদের দাঁড় করাতে চাইলে সহজেই তা করতে পারবে। আমরা শুধু বিদেশীই নই, এখানকার লোকজন হতেও অনেক ভিন্ন। বিদেশীদের বিরুদ্ধে সন্দেহ জাগানো খুব সহজ। আমাদের কাজ যাতে কেউ ধ্বংস করতে না পারে, সে জন্য জনগণের আস্থাই একমাত্র নিরাপত্তা।'

জেলা কর্মকর্তা ডেস্কের ওপর রাখা ভারী পেপারওয়েটের দিক তাকিয়ে থাকেন। বোঝা যায়, এ প্রশ্নের খুব আন্তরিক কোনো জবাব তিনি সন্ধান করছেন। অবশেষে তিনি বলেন, 'আমার মতে কে কী বলছে সেদিকে না তাকিয়ে আপনাদের উচিত কাজ চালিয়ে যাওয়া। এখানে মানুষের লিখতে-পড়তে শেখা দরকার। তাদের লেখাপড়া শেখান। বিনিময়ে কী পাচ্ছেন, লোকে আপনাদের বিশ্বাস করছে না ভালোবাসছে, তা দেখার দরকার নেই।'

'সেটি ভুলে থাকা যায়, কিন্তু মন থেকে তো একেবারে মুছে ফেলা যায় না। তাছাড়া আমাকে স্বীকার করতে হবে, আমাদের কাজকর্ম একেবারে নিঃস্বার্থ নয়। আমরা আপনাদের লোকজনকে সাহায্য করতে চাই, বিনিময়ে তাদের আস্থাও চাই। সেটি না পেলে মিশনারিদের এ সান্ত্বনাটুকুও আমরা পাব না যে, অন্তত ঈশ্বর আমাদের প্রচেষ্টাটুকু দেখেছেন।'

জেলা কর্মকর্তা পূর্ববৎ চিন্তাচ্ছন্ন হন। ঘরে গভীর নিস্তব্ধতা নামে। এন্ড্রুর অস্থিরতা কাটে না।

'আপনারা এমন একটি জিনিস দাবি করছেন, যা দেওয়া কঠিন', প্রবীণ ভদ্রলোক অবশেষে বলেন, 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, কিছুই চাওয়ার নেই মনে করে কাজ করে যান। যদি সত্যি প্রত্যাশা ত্যাগ করতে পারেন, আরো ভালো।'

এন্ড্রুর চোখমুখের কোণ ঈষৎ কুঞ্চিত হয়। শান্ত ভঙ্গিতে সে জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে আমরা কাজ করব কেন?'

'সেটি তো আপনাদের সিদ্ধান্ত।'

এন্ড্রু কিছুক্ষণ বসে থেকে একসময় উঠে পড়ে। করমর্দনের সময় সে জেলা কর্মকর্তার দিকে তাকায় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১

'সুলতানা' নামক ধূসর ও সাদা রঙের লঞ্চটির ইঞ্জিন মৃদু খড়খড় শব্দ করে চালু হয়। ডেকে একটি চেয়ারে আয়েস করে বসে রাষ্ট্রদূত হথর্ন সকালের রৌদ্রে ঝিকমিক করা নদীর দিকে তাকিয়েছিলেন। একটি ডিঙিনৌকা বৈঠা ছপছপ করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। একটি শান্ত-সৌম্যভাব চারদিকে। দু ঘণ্টার এ নৌভ্রমণ প্রীতিকর হবে, তিনি ভাবেন। তবে এ লঞ্চের মালিক ও ধনী মেজবান ইদ্রিসের গ্রামের বাড়িতে দিনটি কাটানোর ইচ্ছা তাঁর নেই। এ দেশে মেজবানরা মাত্রাতিরিক্ত আতিথেয়তা করে।

নীল ইউনিফরমপরা লস্কর সিঁড়ি তুলতে যাবে, এমন সময় রাষ্ট্রদূত দেখেন হ্যারি রাইট তার মোটরগাড়ি থেকে লাফিয়ে নেবে লঞ্চের দিকে ছুটে আসছে।

'এ লোকটি যে আমাদের সঙ্গে আসছে, জানা ছিল না তো', বিস্মিত চোখে বিড়বিড় করেন তিনি।

ইদ্রিস ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটন্ত লোকটির দিকে কৌতূহলভরে তাকিয়ে থাকে, রাইট এখন সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে।

'একে তো দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। লোকটি কে?'

ইদ্রিস রাইটকে চেনে না শোনার পর রাইটের পরিচয় দিতে রাষ্ট্রদূতের দ্বিধা হয়। 'আমাদেরই একজন, আমার সঙ্গে দেখা করবে বোধ হয়', অস্পষ্ট স্বরে তিনি বলেন, যেন এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে।

এ অস্বস্তির পেছনে কারণ আছে। রাইট এমন একটি পেশায় জড়িত, কূটনীতিকদের কাছে যা গভীর রহস্যময়; তিনি রাইট সম্পর্কে যতটা পারা যায় কম জানার চেষ্টা করেন। নিঃসন্দেহে রাইট এ দেশে কোনো গুপ্ত কার্যক্রম চালায় না। নানাভির আমলে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং এর আধুনিকায়নে সহায়তা দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা হিসেবে সে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। তবে তাকে পার্টি-টার্টিতে খুব একটা দেখা যায় না; যদি যায়ও, তাকে কেউ সহজভাবে পরিচয় করিয়ে দেয় না। রাষ্ট্রদূত কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবে, রাইট এখানে কেন এসেছে। কারণ যা-ই হোক, বিষয়টি জরুরি বলে মনে হচ্ছে।

রাইট সামনের ডেকে উঠে এলে রাষ্ট্রদূত নিরাবেগ কণ্ঠে বলেন, 'হ্যালো, রাইট। ইদ্রিস সাহেবের সঙ্গে পরিচয় আছে?'

লম্বা-চওড়া দেহ রাইটের, চোখ দেখে তাকে নিষ্পাপ ভোলাভালা ধরনের লোক মনে হবে; এভাবে হাজির হওয়ার জন্য ইদ্রিসের কাছে সে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তারপর হথর্নের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকালে তিনি অযথা গলা চড়িয়ে বলেন, 'আপনি সম্ভবত আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন?'

রাইট বোকার মতো মাথা নেড়ে ইদ্রিসের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'বেশি সময় নেব না। আশা করি লঞ্চ ততক্ষণে ছেড়ে যাবে না।'

ইদ্রিস একে একে দুজনের দিকে তাকায়, ইঙ্গিত বুঝতে পেরে রাইট থাকা অবস্থায় লঞ্চ ছেড়ে যাবে না মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইদ্রিস চলে যায়।

ডেকের ওপর রাখা একটি চেয়ারের কাঠের ফ্রেমে রাইট পিঠ সোজা করে বসলে রাষ্ট্রদূত জিজ্ঞাসা করেন, 'ব্যাপার কী?'

'ষড়যন্ত্র, মি. অ্যাম্বাসেডর।' আবহাওয়া সংবাদ পরিবেশনের ভঙ্গিতে সে বলে।

'আবার?'

রাইট যেন হাসে, কারণ চোখের কোণে কুঞ্চন দেখা দেয়। 'আপনি তো অন্য ষড়যন্ত্রটির কথা জানেনই, স্যার।'

হ্যাঁ, কয়েকদিন আগে সরকারের 'উন্মোচিত' ষড়যন্ত্রটির কথা তিনি জানেন। কেউ সেটিকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। অনেকে মনে করে, ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে কব্জা করার জন্য কিংবা কোকা বাঁধের ঘটনা নিয়ে কেউ যাতে আর সমস্যা করতে না পারে সে জন্য সরকার এ ষড়যন্ত্রের কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

'এবার কি সত্যি সত্যি?' রাষ্ট্রদূতের কণ্ঠে কৌতুকের ছাপ।

'দুর্ভাগ্যবশত এবারেরটি সত্যি।'

রাষ্ট্রদূত গোয়েন্দা সংস্থার লোকটির দিকে তাকান। যে তথ্য তাকে এইমাত্র দেওয়া হলো, তার সত্যতা নিয়ে এখনো তিনি সন্দিহান। কেননা তিনি যতদূর জানেন, পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণে। ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অধিকাংশ নেতা কারাবন্দি। ছাত্র বা শিক্ষকরাও বেশি কিছু করতে পারবে না, কারণ শুধু যে বিঘ্ন-সৃষ্টিকারীরা কারারুদ্ধ তা-ই নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

'ষড়যন্ত্র কারা করতে পারে?' রাষ্ট্রদূত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর কণ্ঠে এখনো অবিশ্বাস।

রাইট চারদিকে তাকায়, তারপর সামনে ঝুঁকে ঈষৎ ফিসফিস করে বলে, 'সেনাবাহিনী।'

হথর্ন ক্ষিপ্র চাহনিতে গোয়েন্দার দিকে তাকান। ঠাট্টা নয় তো? গোয়েন্দাকে বেশ আন্তরিকই মনে হয়।

'আপনি নিশ্চিত?'

'নিশ্চিত। কতিপয় তরুণ লেফটেন্যান্ট সরকারকে উৎখাত করতে চায়।'

হথর্ন দৃষ্টি ফিরিয়ে নদীর দিকে চেয়ে থাকেন। খবরটি তাঁকে বিশেষ অস্থির করে তুলেছে। জেনারেল প্লেকে শুরু করে সেপাই পর্যন্ত এখানকার সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের চমৎকার ঐতিহ্য রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো উদ্বেগের কারণ কখনো

ঘটেনি। বস্তুত এ সেনাবাহিনীকে বিবেচনা করা হচ্ছিল এশিয়া-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতার চমৎকার মডেল হিসেবে। এটিকে মাত্রাতিরিক্ত সরঞ্জামে সজ্জিত করা হয়েছে এবং, সন্দেহ নেই, এসব ক্ষেত্রে আমেরিকা সহায়তা দিয়ে আসছে। তাদের প্রতিটি পালিশ করা বোতামের ঔজ্জ্বল্যে মার্কিন ডলার ঝিকমিক করে।

'না, আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে', হথর্ন বলেন, 'এই লেফটেন্যান্টগুলি কী চায়?'

'তারা চায় নিরপেক্ষবাদ।'

রাষ্ট্রদূত তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে আবার রাইটের দিকে তাকান, এবার তার চোখে নিখাদ অবিশ্বাস। মাথায় কোনো ছোটখাটো পরিকল্পনা উঁকি দেওয়ায় কিছু মাথাগরম, অপরিণামদর্শী, তরুণ লেফটেন্যান্ট সরকারকে উৎখাত করার কথা চিন্তা করতে পারে— এটুকু মেনে নিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। হতে পারে, তারা বোকার মতো আদর্শবাদী, অবাস্তব দ্রুত গতিতে দেশের উন্নয়ন ঘটানোর চিন্তা তাদের তাড়িত করতে পারে। কিংবা দ্রুত পদোন্নতির উদ্দেশ্যে এ ষড়যন্ত্র হতে পারে, সদ্য স্বাধীন দেশে যেমন হয়ে থাকে— পুরনো জেনারেলদের বিদায় করার একটি সহজ পন্থা। কিন্তু সেনা কর্মকর্তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, এটি কল্পনাতীত।

'আপনি যা বলছেন, তা যেন সত্যি না হয়', রাষ্ট্রদূত বলেন।

রাইট উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সে বলে, 'প্রধানমন্ত্রীকে যত দ্রুত সম্ভব সাবধান করে দেওয়া উচিত।'

'আজ রাতে ফিরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করব।'

'বিষয়টি খুব জরুরি, স্যার।'

রাষ্ট্রদূত ভ্রূ-কুঞ্চিত করেন। 'এক্ষুনি তো লঞ্চ ছেড়ে উঠে যেতে পারি না। তাতে সন্দেহ তৈরি হবে।'

'আমার মনে হয়, আমাদের অপেক্ষা করার সময় নেই। ওরা আজ রাতেই কিছু একটা করে ফেলতে পারে।'

রাষ্ট্রদূতের ভ্রূ-কুঞ্চন আরো গভীর হয়। 'সেনাবাহিনীর গোয়েন্দারা প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করতে পারে না?'

রাইট কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকে, যেন বক্তব্য সাজিয়ে নিচ্ছে। অবশেষে বলে, 'তারা এখনো ব্যাপারটি জানে কি না জানি না। তাছাড়া আপনি বললে প্রধানমন্ত্রী বেশি গুরুত্ব দেবেন।'

মার্কিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে তাকান রাষ্ট্রদূত হথর্ন। সহসা তিনি অনুধাবন করেন রাইট কতটা ধূর্ত চাল দিচ্ছে।

এ ষড়যন্ত্রের খবর শোনামাত্র সে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করার সুযোগ আবিষ্কার করেছে। সে চায়, মার্কিন মিশনের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রদূত এ সুযোগটি কাজে লাগাক। তাছাড়া কেনইবা নয়? রাষ্ট্রদূত ভাবেন। হাজার হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তো এ ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছে।

রাষ্ট্রদূত উঠে দাঁড়ান। স্বচ্ছ নীল আকাশের নিচে ঝকমক করা নদীর দিকে অসহায় দৃষ্টি দেন। হু হু বাতাসে একটি লাল রঙের পাল টানানো হচ্ছে।

'আশা করি ওটি ডুবে যাবে না।' দূরে লাল পালতোলা এক নৌকা দেখিয়ে তিনি বলেন, মালপত্রের ভারে নৌকাটির পাটাতনে পানি ছুঁইছুঁই।

ছোট্ট একটি কুঠুরিতে বসে একা একা বই পড়ছিল ইদ্রিস।

'আমি খুব আশা করেছিলাম।' গভীর হতাশার সুরে সে বলে।

পেছন থেকে রাইট ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসে।

গাড়িতে বসার পরই খবরের আসল গুরুত্ব রাষ্ট্রদূত হথর্ন অনুধাবন করতে পারেন।

'গোটা দেশই ভেঙে পড়ছে নাকি?' ঈষৎ ক্রুদ্ধ চোখে জিজ্ঞাসা করেন তিনি।

রাষ্ট্রদূতের ক্রুদ্ধভাব কমার জন্য অপেক্ষা করে রাইট। তারপর জানালাপথে বাইরে চেয়ে থেকে প্রায় খোশগল্প করার ভঙ্গিতে বলে, 'নির্বাচনের ফলাফলকে কখনোই আমার বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হয়নি। ভেতরের পরিস্থিতি তেমন ভালো নয়। প্রশাসনের উচ্চপদে এমন অনেকে আছে, যারা চায় আমরা চলে যাই। আমি এও নিশ্চিত কমিউনিস্টদের সংখ্যা সম্পর্কে গোয়েন্দাদের তথ্য ঠিক নয়। আমরা যতটা ভাবি, কমিউনিস্টদের সংখ্যা তার চেয়ে বহুগুণ বেশি।' সে থেমে মুখ দিয়ে অস্পষ্ট একটি আওয়াজ করে। 'যে লোকটি এখন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান, আমি নিশ্চিত, সে মার্কিনবিরোধী। আমি জানি, সে মনে করে জর্জ হার্ভের বিরুদ্ধে অভিযোগটি সত্য হলেও হতে পারে। তাছাড়া কেউ এ ব্যাপারে তদন্ত দাবি করলে তাতেও দোষের কিছু নেই বলে সে মনে করে। কিন্তু এ যে ডাহা মিথ্যা সেটি সেও জানে, তার সহকর্মীরাও জানে।'

জর্জ হার্ভের প্রসঙ্গ ওঠায় রাষ্ট্রদূতকে কেমন বিরক্ত মনে হয়। এই হার্ভে-কেলেঙ্কারি এবং একে কাজে লাগিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদের ফায়দা লোটার চেষ্টা—এসবে তার অরুচি ধরে গেছে। তাছাড়া বর্তমানে বিষয়টির আর কোনো গুরুত্ব অবশিষ্ট নেই; এমনকি তাঁর ধারণা, যারা এটি ব্যবহার করে সরকারকে বিব্রত করার, এমনকি উৎখাত করারও চেষ্টা চালিয়েছিল, তারাও এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করে না।

দেরিতে হলেও রাইট বলে, 'আপনার দিনটি মাটি করার জন্য দুঃখিত।'

রাষ্ট্রদূত বলতে যাচ্ছিলেন, 'বেচারা হার্ভে!' কিন্তু মাঝপথে তা নিঃশব্দে চেপে গিয়ে বলেন, 'বেচারা ইদ্রিস!'

২

'আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না।' হতাশায় কপালে করাঘাত করে পুলিশপ্রধান বলেন।

বড় খারাপ দিন যাচ্ছে তার। বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাগুলির পর থেকে এক মুহূর্তও শান্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ হয়নি, প্রত্যেক দিন দেশের কোথাও না কোথাও অশান্তি লেগেই আছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন। প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে দু দফা ডেকে পাঠিয়েছেন। তাছাড়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৈঠক আর সভা তো লেগেই আছে। বস্তুত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওখানে একটি মিটিং শেষে তিনি মাত্রই ফিরেছেন; গত রাতে নিজের শহরের আদালতভবনে হামলার ঘটনায় দারুণ রুদ্রমূর্তি হয়ে ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এতদিন পর্যন্ত তার নিজের শহরে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ছিল না। পুরো পুলিশ বাহিনীকে অকর্মণ্য বলে গালিগালাজ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, গোয়েন্দা বিভাগকে বলেছেন আবর্জনা। মন্ত্রীর এ চণ্ডমূর্তি ধারণের কারণ পুলিশপ্রধান বোঝেন। নতুন সরকার জনগণের কাছ থেকে আনুগত্য ও আত্মবিশ্বাস আশা করেছিল, কিন্তু প্রতিদিন সে আশা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু তারই-বা কী করার আছে? তিনি কি রাজনীতিবিদ-ছাত্র-শিক্ষকদের ধরে ধরে

জেলের ভেতর পুরে রাখেননি? ভবিষ্যতে যাদের উদারপন্থী মনোভাব পোষণ করার সামান্য সম্ভাবনাও আছে, তাদেরও কি তিনি পাকড়াও করেননি? যে কোনো গোপন তৎপরতা সন্ধান করার জন্য তিনি কি গোটা পুলিশ বাহিনীকে সতর্ক অবস্থায় রাখেননি, কেউ আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘনের হুমকি হয়ে উঠলেই তাকে নাস্তানাবুদ করার নির্দেশ কি তিনি জারি করতে বাকি রেখেছেন? তাঁর পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব, সবই করেছেন।

'আমাকে আবার খুলে বলো।' উত্তেজিত ভাব কিছুটা প্রশমিত হলে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তার নিজের শ্যালকের দিকে চকিতে চেয়ে পুলিশপ্রধান বলেন। এ আত্মীয়তার সম্পর্কটি মাঝে মাঝে তার মর্মপীড়ার কারণ হয়।

'রাইট একটি ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পেয়েছে।'

'হ্যাঁ, এটুকু পুরো বোঝা গেল। এখন বলো কীসের ষড়যন্ত্র, কারা এর পেছনে আছে?'

'এত ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ব্যাপারটি আমাদের এক্তিয়ারে নয়।'

'শুনে খুশি হলাম', পুলিশপ্রধান অঙ্গভঙ্গি করে বলে, 'তবু ব্যাপারটি বোঝা গেল না।'

'ষড়যন্ত্রটি চলছে সেনাবাহিনীর ভেতরে। এবং এবার এটি', এক মুহূর্ত দ্বিধা করে সে বলে, 'গুজব নয়।'

পুলিশপ্রধানের মুখে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে; শঙ্কায় নাকি স্বস্তিতে, বোঝা যায় না। নিঃসন্দেহে তার ভেতরে পরস্পরবিরোধী অনেক অনুভূতি একত্রে ক্রিয়া করছে। শ্যালকটি তার দিকে শান্তভাবে চেয়ে থাকে।

'রাইটই কি এটা জানতে পেরেছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এতে আর অবাক হচ্ছেন কেন, সেনাবাহিনী রাইটের দেশ থেকে বহু কিছু পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব তথ্যদাতা আছে।'

'যা-ই হোক, খোদাকে শুকরিয়া যে ষড়যন্ত্রটি সেনাবাহিনীতে। তুমি তো বললেই, এটি আমাদের এক্তিয়ারে নয়।'

'আপনার কথা কি এটুকুই?'

'হ্যাঁ। আমার চৌহদ্দির মধ্যে যা পড়ে না, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার অবকাশ আমার নেই।'

গোয়েন্দাপ্রধানের মুখ অন্ধকার হয়। 'কিন্তু আমার একটি কথা বলার আছে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। আপনার হয়তো জানা আছে, এই রাইট লোকটি মনে করে আমার গোয়েন্দা বিভাগ একটি ঠুঁটো জগন্নাথ। তার ধারণা, দেশের প্রকৃত পরিস্থিতি সরকারকে জানাতে আমি ব্যর্থ হয়েছি। লোকটি বলে বেড়ায়, আমার দেওয়া তথ্যের চেয়ে অনেক বেশি কমিউনিস্ট দেশে বিচরণ করছে।'

'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও মনে করে তুমি সবাইকে ভুল তথ্য দিয়েছ।'

'রাইটের কারণেই যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বিশ্বাস জন্মে থাকে, আমি অবাক হব না। যা হোক, ষড়যন্ত্রের এ চমকপ্রদ তথ্য উদ্‌ঘাটনের পর রাইটের বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস কারো থাকবে না।'

'তাকে নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কী আছে? সে তো উপদেষ্টা, দু দিন পরে চলে যাবে। তাছাড়া সে যদি মনে করে থাকে, আমরা অকেজো, সেটি সে বিশ্বাস করে। আমাদের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা তো নেই।'

'আমার সঙ্গে কিছুটা আছে।'

'তার কারণ, সে জানে তুমি তাকে দেখতে পারো না। তুমি তোমাদের বিষয়ে তার নাক গলানো বরদাশত করো না।'

'তাকে অপছন্দ করার যথেষ্ট কারণ আছে। এখানে ব্যক্তিগত বলে কোনো ব্যাপার নেই।'

'সেই অব্যক্তিগত কারণগুলি কী, জানতে পারি?' এবারও পুলিশপ্রধানের কণ্ঠে কৌতুক।

'আমাদের উপদেশ দেওয়ার জন্যই সে এসে থাকলে উপদেশ বিতরণের মধ্যেই তার সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, অন্য কিছুতে নয়। গোয়েন্দাগিরির কী কী নতুন কৌশল বেরিয়েছে, সেসব শিক্ষা সে আমাদের দিতে পারে, কিন্তু এতদিন আমরা এখানে কী বানিয়েছি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না। আমাদের মতামত সে নাও মানতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা ভুল। ভুল তো তারও হতে পারে।'

পুলিশপ্রধান অস্থিরভাবে কিছু কাগজ ভাঁজ করতে থাকেন। 'তার ব্যাপারে পরে কখনো আলাপ করা যাবে। আজ আমি ব্যস্ত। দুপুরের মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রিপোর্ট করতে হবে।'

'আমি খোশগল্প করছি না। আপনাকে খুব জরুরি একটি কথা বলতে এসেছি। আমার মনে হচ্ছে, রাইট এমন একটা কিছু করতে যাচ্ছে, যা পুরোপুরি একজন উপদেষ্টার কাজের মধ্যে পড়ে না। সে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে যাচ্ছে।'

এই প্রথমবারের মতো পুলিশপ্রধানের মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ে। 'কী নিয়ে?'

'আমি নাকি মার্কিনবিরোধী।'

শ্যালকের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকেন পুলিশপ্রধান। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি তার কী ক্ষতি করেছ যে সে এমন সিদ্ধান্ত নিল?'

'গতকাল তার সঙ্গে বিতণ্ডা হয়েছে, বেশ বড় ধরনের বিতণ্ডা। আপনি ব্যস্ত, তাই বিস্তারিত বলছি না। আমি যা বলতে চাই, তার মোদ্দা কথা হলো এই, ক্রুদ্ধ দেবতাদের সন্তুষ্টির সবচেয়ে ভালো পন্থা হলো তাদের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া। রুই-কাতলাদের এই বলে কান ভারী করা হয়েছে যে, আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ পচে গেছে। তারা আপনার ওপরও ক্ষুব্ধ, কারণ আপনি পুরো বিভাগের প্রধান। তাই আপনার পক্ষে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে সংগঠনটির আগাপাশতলা রদবদল করা। আর সেটি আমাকে দিয়েই শুরু করুন না কেন? আমি খুশিমনে বলির পাঁঠা হতে প্রস্তুত আছি।'

পুলিশপ্রধানের মুখ ধীরে ধীরে হাঁ হয়ে সহসা বন্ধ হয়ে যায়। আবার যখন খোলে, তখন তা থেকে একটি ছোটখাটো বিস্ফোরণের শব্দ বেরোয়।

'এসব কী বলছ তুমি?'

'আমি পদত্যাগ করতে চাই।'

'শুধু রাইটের কারণে?'

'ব্যাপারটিকে আমি অন্যভাবে দেখছি। ওপর মহল যেহেতু কমিউনিস্টদের সংখ্যাসংক্রান্ত রাইটের তত্ত্ব মেনে নিয়েছে, আমি চাইলেও এ পদ আর রক্ষা করতে পারব না। কমিউনিস্টদের খোঁজখবর রাখা আমার দায়িত্ব। আমি এখনো মনে করি, আমার তথ্যই সঠিক। কিন্তু আমার মতামতের আর মূল্য নেই।

পুলিশপ্রধান কিছুক্ষণ নিশ্চল বসে থাকেন, তাঁর চোখে শূন্যতা। একসময় সম্বিত ফিরে পেয়ে তিনি পাগলের মতো এক টুকরো কাগজ খোঁজেন।

'আজ দুপুরেই খবরটি আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কানে তুলতে পারেন। বলবেন যে, আপনি বিপুলভাবে পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছেন', গোয়েন্দাপ্রধান এমনভাবে কথা বলে যেন বোধশক্তি ভোঁতা হয়ে যাওয়া কাউকে বোঝাচ্ছে।

পুলিশপ্রধান কিছু একটা পড়তে শুরু করেন। যে কাগজটি খুঁজছিলেন, সেটি পেয়ে গেছেন বলে মনে হয়। তিনি কোনো উত্তর দেন না।

'আমাকে যদি পুরোপুরি চাকরিচ্যুত নাও করা হয়, তবু মনে করার কোনো কারণ নেই যে, কোনো না কোনো ধরনের অপমানের হাত থেকে আমি রেহাই পাব। সেটি আমার সহ্য হবে না। আমি পদত্যাগ করব। যে সুযোগ সাধছি, তা নষ্ট করবেন কেন?'

পুলিশপ্রধান এখনো কোনো কথা বলেন না। গোয়েন্দাপ্রধান উঠে দাঁড়ায়। 'আমি পদত্যাগ করবই', বলে সে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করে। ভেতরটা তিক্ত মনে হয় তার। ভাবে, পুলিশপ্রধানের সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই, কারণ তিনি তার অভিজ্ঞতাকে চোখের ঠুলি হিসেবে ব্যবহার করেন।

সপ্তম অধ্যায়

১

কেশ পরিচর্যার জন্য শিরস্ত্রাণের মতো মুকুটটি মাথায় পরে বসে থাকতে মিসেস ক্রিমের ভালোই লাগে, কারণ এ অবস্থায় সে চোখ মুদে রাখতে এবং তার আয়ত চোখে ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক দিয়ে ওঠা স্বর্গীয় সুখানুভূতি লুকিয়ে রাখতে পারে।

বিকেল গড়িয়ে গেছে, তবু তাকে তরুণ সেনা কর্মকর্তাটির সঙ্গে দেখা করতে আরো তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে (সে চকিতে চোখ মেলে তার রত্নখচিত অপূর্ব হাতঘড়িটির দিকে একবার তাকিয়ে বুঝতে পারে তিন ঘণ্টা নয়, আসলে দুই ঘণ্টা উনচল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে তাকে)। এই সেনা কর্মকর্তা তার হৃদয় কেড়ে নিয়েছে। এ কথা সে তার বন্ধুবান্ধবের কাছে স্বীকার করেছে এবং আর কাউকে না বলার জন্য বারবার মিনতি করেছে। মনে মনে সে শত-সহস্রবার বলে, লোকটি দুষ্টুমির এতদিনকার জানা-অজানা সমস্ত বর্ণনা মিথ্যে প্রমাণ করে দেওয়া এক 'চৌকস দুষ্টু।' কেন ও চৌকস সে সম্পর্কে মিসেস ক্রিমের সুস্পষ্ট ধারণা বিশেষ নেই, তবে সে এটুকু নিশ্চিত যে, ওর মতো 'সত্যিকার সেনা কর্মকর্তা আজ আর তেমন একটা দেখা যায় না'। তবে কেউ ওর ধাঁচের লোকের মধ্যে টুথব্রাশ গোঁফের চেয়েও বেশি কিছু যদি খোঁজার চেষ্টা করে তাহলে মুশকিল, মিসেস ক্রিমের সেনা কর্মকর্তাটি কিছুটা সচেতনভাবে তেমন একটি গুম্ফের অধিকারী হয়েছে বটে। মিসেস ক্রিম শিহরিত হয়ে মনে মনে বারবার বলে, 'ও খাঁটি ভদ্রলোকও। সত্যিকারের সাহসী ও বীর।' সে আরো ভাবে, 'এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, ও হাজার হলেও স্যান্ডহার্স্টে পড়াশোনা করা মানুষ।'

মিসেস ক্রিমের এতসব ভাবনা স্বাভাবিক মনে হয়। তবে একটি ব্যাপারে তার বান্ধবীরা তাকে দেখে খুব অবাক হয়। 'আমি জাতীয়তাবাদী হয়ে যাচ্ছি', সে ঘোষণা করে, 'ও খুব জাতীয়তাবাদী, আর আমিও এই প্রথম বুঝতে পারছি নিজের দেশ আসলে কত বড় একটি ব্যাপার।' এ পরিবর্তনও তার খুব রোমাঞ্চকর মনে হয়, যতবার ভাবে শিহরিত হয়।

মিসেস ক্রিমের মুখে একটি ক্ষীণ হাসি দেখা যায়, শিরস্ত্রাণপরা অবস্থায় মাথা ঝাঁকানো সম্ভব হলে, নিঃসন্দেহে সে ঝাঁকাত। মনে মনে সে বলে, একটি কথা কাউকে বলা যাবে

না। ওকে আমি ভালোর দিকে ফিরিয়েছি। দারুণ এক বিপর্যয় থেকে ওকে আমি রক্ষা করেছি, দেশও রক্ষা পেয়েছে। ভাগ্য ভালো যে ওকে বোঝাতে পেরেছি, ওর তথাকথিত বন্ধুরা আসলে কী করতে যাচ্ছে। ওরা যে কী ভীষণ বোকামি করতে যাচ্ছে তা ওকে বিশ্বাস করাতে না পারলে উর্ধ্বতনদের সে এ কথাটা জানাত না, কেননা কাউকে কিছু বলা ওর ধাঁতে নেই। এত ভালো ও। কিন্তু এ তো শুধু কারো কান ভারি করার ব্যাপার নয়, উর্ধ্বতনদের ও যদি কথাটি না জানাতো, ঈশ্বরই জানেন, দেশের কী হতো!

যাই হোক, এখন ওর পদোন্নতি হবে, সামরিক বাহিনীর প্রধান নিজে ওকে মেডেল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মিসেস ক্রিম ভাবে, মেডেল পেয়ে লাভ কী? ক'জনই-বা এর মর্ম বোঝে? এর চেয়ে পদোন্নতি ভালো, পদের নাম শুনলেই বুঝতে পারে সবাই। আচ্ছা, ওকে কি ব্রিগেডিয়ার বানাবে?

ব্রিগেডিয়ার পদ তার পছন্দ না, শব্দটি কেমন পুরনো, বুড়ো বুড়ো শোনায়। ক্যাপ্টেন নামটির মধ্যে যে মাধুর্য আছে, এর মধ্যে সেটি নেই। ক্যাপ্টেন শুনলেই কেমন তরতাজা, তারুণ্যের গন্ধ ভেসে আসে, দুঃসাহসী মানসিকতার খাঁটি রূপ চোখে ভাসে যেন। ওরা কি ওকে ক্যাপ্টেন পদে বহাল রেখেই ব্রিগেডিয়ারের মান-মর্যাদা দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারে না?

কিন্তু মিসেস ক্রিমের জন্য ওর মনে যদি জায়গা থাকে, তাহলে পদমর্যাদাই-বা কী, আর মেডেলই-বা কী? মিসেস ক্রিম নিশ্চিত, ওর মনে জায়গা আছে, যদিও কখনো এ কথা ও প্রকাশ্যে বলেনি। তড়িঘড়ি করে কিছু বলে ফেলার লোক ও নয়। সে হৃদয় দিয়ে কথা বলে, শব্দ দিয়ে নয়। ওর হৃৎস্পন্দনের ভাষা যেন সে পড়তে পারছে। তার মনে সন্দেহের আর লেশমাত্র নেই।

সে পুনর্বার শিহরিত হয়।

মিসেস ক্রিম নিজেকে বলে, আজ রাতে তার সময় হবে নিশ্চয়। ককটেল পার্টি শেষে সে তাকে ডিনারে নিয়ে যাবে। হাজার হোক, পার্টিতে তো একে অপরকে ভালো করে দেখাই হয়ে ওঠে না, শিল্পপতির বাসায় এত লোককে দাওয়াত দেওয়া হয় যে, ভিড় জমে যায়।

২

'গত সপ্তাহে একটি টোরি বসিয়েছি। বললাম, দু দিনের মধ্যে চাই। এরা আড়াই দিন লাগিয়েছে, খারাপ কী। হাজার হোক, এরা বানানো তো দূরের কথা, জীবনে টোরিই দেখেনি।'

শিল্পপতির আঙুলের ইশারা অনুসরণ করে মিসেস ক্রিম প্রশস্ত লনে দাঁড় করানো বিদঘুটে কাঠের অবয়বটির দিকে তাকিয়ে অস্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'ও, ওটি? মানে ওই চায়নিজ জিনিসটি?'

'ওটি আসলে জাপানি। শিন্তো মন্দিরের সামনে ওটি দেখতে পাবেন।'

'ও, আচ্ছা।' বিসদৃশ কাঠের ফটকটির দিকে চেয়ে আগ্রহমেশানো কণ্ঠে মিসেস ক্রিম বলে, মাঝে মাঝে চকিতে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে নেয়। তরুণ সেনা কর্মকর্তাটিকে কোথাও চোখে পড়ছে না।

'এই তোরণের ভেতর দিয়ে তো আর কোনো মন্দিরে ঢুকছেন না। এর পেছনে একটা হৃৎপিণ্ডাকার পুল বানাব।'

'কী দারুণ আইডিয়া!' মিসেস ক্রিমের কণ্ঠে উচ্ছ্বাস, 'আপনি জাপানকে ভালোবাসেন?'

শিল্পপতির মুখ সহসা শক্ত হয়ে ওঠে। 'জাপানিরা কট্টর বেনিয়া। পশ্চিম কিংবা পূর্ব, যা-ই বলুন না কেন, এরা সবাই সমান, সবাই হাঙরের মতো। আমাদের মতো দরিদ্র দেশের লোকজনের প্রতি কোনো মমত্ব নেই। দাম বাড়িয়ে আমাদের ঠকিয়ে নেওয়ার কাজে সবাই ওস্তাদ।'

মিসেস ক্রিমের কানে কিছু যায় না। সে আরেকবার চারদিকে তাকায়, চোখে উদ্বেগের রেশ দেখা দিতে থাকে। এখনো সেনা কর্মকর্তাটিকে দেখা যাচ্ছে না, ক্ষীণ হেসে সে বলে, 'হ্যাঁ, জাপান নিশ্চয়ই সুন্দর দেশ। আচ্ছা, ক্যাপ্টেন বেগ আপনার পার্টিতে আসছেন শুনেছিলাম?'

মেজবান জানায়, ক্যাপ্টেনের আসার কথা থাকলেও এখনো এসে পৌঁছাননি।

মিসেস ক্রিমের উদ্বেগ প্রকাশ পেলে শিল্পপতি সপ্রশ্ন চোখে তার দিকে তাকায়। হঠাৎ নিম্নকণ্ঠে সে বলে, 'প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে আটকা পড়েছেন হয়তো। ওখানে অবস্থা মনে হয় খুব উত্তপ্ত।'

এ মন্তব্যে মিসেস ক্রিমের উদ্বেগ আরো বাড়ে। সে তীক্ষ্ণভাবে মেজবানের দিকে তাকায়। 'আপনার এখান থেকে একটি ফোন করতে পারি?'

পরের চারটি ঘণ্টা সে ক্যাপ্টেনকে খুঁজে ফেরে। যখন সন্ধান পায়, ততক্ষণে তার অবস্থা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো, সহসা স্বস্তির নিঃশ্বাসও তার আচরণকে আর স্বাভাবিক রূপ দিতে পারে না। সে ভাবে, এতে করে তো ও অন্তত তার আকুতির কথা জানবে।

লাজলজ্জা ভুলে সে কেঁদে ফেলে, একটু বেশি সময় ধরেই কেঁদেছে বলে তার নিজের কাছে মনে হয়। তারপর কান্না থামলে সে হেসে বলে, 'আপনার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। চলুন না কোথাও যাই, খুব তেষ্টা পেয়েছে।'

৩

'তোমার হয়েছেটা কী?'

মিসেস ক্রিম এ নিয়ে দশবার তরুণ ক্যাপ্টেনকে এ প্রশ্নটি করে। প্রতিবারের মতো এবারও তার কৌতূহল নিবৃত্ত না হলে এখন তা আতঙ্কে পরিণত হয়। বিষণ্ন ও রহস্যময় এক চিন্তার গহিনে ডুবে বিয়ারের গ্লাসের দিকে চেয়ে ক্যাপ্টেন নিশ্চুপ বসে থাকে। মিসেস ক্রিমের ভয় এখন দম আটকানোর পর্যায়ে পৌঁছে গেলে খানিক দ্বিধা করে সে বলে, 'আমি কি কোনো ভুল করেছি?'

প্রশ্নটি এমনকি মিসেস ক্রিমের কানেও বেখাপ্পা শোনালেও হয়তো এ প্রশ্নই ক্যাপ্টেনের ঘোর ভাঙায়। ঝটিতি গ্লাস তুলে নিয়ে তৃষ্ণার্তের মতো সে পুরোটা গিলে ফেলে। এ সময় তার হাত প্রবলভাবে কাঁপে।

এরপর সে নির্জীবভাবে তাকে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কেন আটকা পড়েছিল। শেষে শোনা যায় না এমন নিচু কণ্ঠে সে বলে, 'ওদের চারজনকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে।

হয়তো আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।' তার গলায় কিছু একটা এসে আটকে যায়, মুখ দিয়ে একটি বিদঘুটে শব্দ বেরোয়।

মিসেস ক্রিম বলে, 'কিন্তু তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ। এ জন্য বরং তোমার গর্ব হওয়া উচিত।'

মিসেস ক্রিম লোকটির গলা থেকে আবার সেই বিদঘুটে শব্দটি শুনতে পায়। নিঃসন্দেহে নিজের কৃতকর্মে গর্ববোধ করার সিদ্ধান্ত সে নিতে পারছে না। শীঘ্রই এ সাহসী তরুণ সেনা কর্মকর্তা ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। মিসেস ক্রিম দারুণ অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকে। সে সহসা তার মাথা নাটকীয়ভাবে পেছনে হেলিয়ে দেয়, 'তোমাকে দেখে আমার লজ্জা হচ্ছে। তোমার আচরণ স্রেফ অসহ্য।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে সেনা কর্মকর্তা বলে, 'আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমি এমন কিছু কাগজপত্রে সই করেছি যেগুলি ডাহা মিথ্যেও হতে পারে। হয়তো ওরা এতটা করতে চায়নি। এখন নাকি ওদের মেরে ফেলা হবে।'

'তুমি থামো', উদ্ধত কণ্ঠে আদেশ করে মিসেস ক্রিম। 'যারা ওসব কাগজে তোমার সই নিয়েছে, তারা জানে কীসে দেশের সর্বোচ্চ মঙ্গল হবে।'

তরুণ সেনা কর্মকর্তা সবেগে মাথা নাড়ে, যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার যে চার বন্ধুকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে, তাদের সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কি না এখনো সে স্থির করতে পারে না, কিংবা এও বুঝতে পারে না, তাদের আদর্শকে সে এখনো ঠিক মনে করে কি না। শুরুতে তাদের সে সমর্থন করেছিল এবং অন্তত নৈতিকভাবে এ সমর্থন অব্যাহতই রাখত যদি না অকস্মাৎ এক তদন্ত কর্মকর্তার জেরার মুখে তাকে পড়তে হতো, সেই কর্মকর্তা তাদের এবং ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সব খবরই রাখেন বলে মনে হয়। হ্যাঁ, ওরা আগেভাগেই সব জানত। ফলে অস্বীকার করে কি কোনো লাভ হতো? জেরাকারীর প্রশ্নের মুখে তার খানিকটা ধাঁধা লেগে যায়, তখন বন্ধুদের পরিকল্পনা তার অনুচিত কর্ম বলে মনে হয়। তাহলে জেরাকারী কি তাকে সম্মোহিত করে থাকবে? তারপর কোনো কথা না বলে তার নাকের ওপর কাগজ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল, সেসব কাগজ বারবার করে পড়েও সে ঠিকমতো অর্থ উদ্ধার করতে পারেনি। কাগজ থেকে মাথা তুলে সে দেখেছিল সেনাপ্রধান স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। 'ওরা তোমাকে সব কথা বলেনি', সেনাপ্রধান দয়ার্দ্র কণ্ঠে তাকে বলেছিলেন, 'ওরা তোমার কাছে সবকিছুই গোপন করেছে। তুমি অবাক হচ্ছ দেখছি। শুভবুদ্ধির লোকমাত্রই তাজ্জব হওয়ার কথা। তুমি কি স্বাক্ষর করবে?' সে সেনাপ্রধানের স্নেহশীল চোখের দিকে আরেকবার তাকিয়েছিল, পিতৃসুলভ স্নিগ্ধ চাহনি। 'তুমি ভালো মানুষ। একজন ভালো অফিসারও', সে সেনাপ্রধানের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, 'এ জন্য ওরা তোমাকে সবকিছু বলেনি। তুমি কি দয়া করে স্বাক্ষর করবে?' কলমটি আলতো করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরা হয়েছিল, সে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে ছিল সেটির দিকে। সে কি সত্যিই কিছু ভাবছিল না? হ্যাঁ, সে ভাবছিল, ওরা তাকে সবকিছু বলেনি; তিন শীর্ষ সেনা কর্মকর্তা, পুলিশপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও তার তিন সহযোগীকে হত্যার পরিকল্পনার কথা ওরা বলেনি। কেন বলেনি?

'তুমি কি সই করবে?'

তারপর সে স্বাক্ষর করেছিল।

স্বাক্ষর করা কাগজপত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এখন ওদের কী করা হবে?'

'তোমাকে জানিয়ে রাখা উচিত', সেনাপ্রধান উত্তর দিয়েছিলেন, 'তাদের পদ কেড়ে নিয়ে প্রত্যূষে গুলি করে হত্যা করা হবে।' সেনাপ্রধানের চোখে সেই পিতৃসুলভ চাহনি এখন কম।

নিজেকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে মিসেস ক্রিম একটি সিগারেট জ্বেলে গভীরভাবে ধোঁয়া টানে। তারপর অকস্মাৎ উন্মত্তভাবে সিগারেট নিভিয়ে দেয়।

কাঁপা কাঁপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করে, 'বাস্তব পরিস্থিতিটি একবার ভাবো। ধরো, তোমাকে যেসব কাগজ সই করতে দেওয়া হয়েছে সেগুলি মিথ্যা, তারপরও কি তুমি সই না করে পারতে? তাছাড়া তুমি জানতে, ওরা সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করার পরিকল্পনা করেছে। সরকারকে উৎখাত করতে চেয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ওরা যে কাউকে মেরে ফেলত না, কী করে নিশ্চিত হচ্ছো? বোঝাই যাচ্ছে, ওরা তোমাকে সবটা বলেনি। তুমি মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী, তবে তোমার বন্ধুদের থেকে তুমি আলাদা। তুমি ওদের মতো নও।' মিসেস ক্রিম সহসা ক্যাপ্টেনের একটি হাত তুলে নিয়ে চাপ দেয়। 'এ জন্যই আমি তোমার প্রেমে পড়েছি, তুমি যে কী ছেলেমানুষ!' সে আদুরে ভঙ্গিতে হাসে।

কিন্তু ক্যাপ্টেন যেন তার কথাও শুনছে না, তাকে দেখতেও পাচ্ছে না।

চরম বিরক্তিভরে সে তার হাত ছেড়ে দেয়।

'আমি ভেবেছিলাম, তোমার অন্তত বুদ্ধিশুদ্ধি আছে।'

এ মন্তব্যও তার কান পর্যন্ত পৌঁছায় বলে মনে হয় না। কারণ তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। নিশ্চল বসে সে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পর্ব : ৩

প্রথম অধ্যায়

১

'এটি কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়', ক্রুদ্ধস্বরে প্রধানমন্ত্রী আবদুল কাদের বলেন। 'জনগণের কাছে আমরা কিছুই গোপন করি না। ওদের সবাইকে এ কথা জানিয়ে দাও।'

কিছুই গোপন করা হয় না। চার সেনা কর্মকর্তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা, তাদের কয়েকজন সহযোগীকে কারাগারে নিক্ষেপ এবং দেশজুড়ে বিপুলসংখ্যক লোককে গণহারে গ্রেপ্তারের খবর ফলাও করে সংবাদপত্রে প্রচার হয়। পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধে কুটিল রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিতে তৎপর একদল সুপ্রশিক্ষিত ভয়ঙ্কর মানুষের ছবি আঁকা হয়। মানুষকে দাস করার এক মহাপরিকল্পনার কথা রোমহর্ষক শিরোনামে প্রচারিত হয় এবং বহুদিন পর্যন্ত তা পত্রিকার স্তম্ভ দখল করে রাখে।

প্রধানমন্ত্রী নিজে বেশ কিছু সুরক্ষিত জনসভায় বিরোধী দলের বিরুদ্ধে অনলবর্ষী ভাষণ দেন। বস্তুত বিরোধী দল তাকে সত্যি স্তম্ভিত করেছে। তিনি চিন্তাই করতে পারেননি। এর চরিত্র ও কর্মপদ্ধতি তার পরিচিত নয়। 'সাহস থাকে তো সরকারের সামনে এসে লড়াই করুন', বিরোধী পক্ষকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন। পরমুহূর্তে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যভরে বলেন, 'ওরা সেটি পারবে না। পারবে না, কারণ জনগণের সমর্থন তাদের সঙ্গে নেই। জনগণের আক্রোশের ভয়ে তারা নিজেদের মুখোশ খোলে না।'

মার্কিন-বিরোধিতার প্রসঙ্গ এলে তিনি বলেন, 'মার্কিন-বিরোধিতা বলে কিছু নেই। এ স্রেফ প্রোপাগান্ডা। নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিরোধিতা কে করবে?'

তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ তিনি বরদাশত করতে পারেন না, খুব অপমানজনক ও কুটিল অভিযোগ। 'না, আমি কারো হাতের পুতুল নই। যদি পুতুল হই, তাহলে যারা দিনরাত শুধু দেশ নিয়ে চিন্তা করে তারা সবাই হাতের পুতুল।'

পুলিশপ্রধানকে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশও জনগণের কাছ থেকে লুকানো হয় না : 'জনগণের শত্রুদের জন্য কোনো করুণা নয়, তাদের খুঁজে বের করতে কোনো শিথিলতা

দেখাবেন না। দেশকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করুন, গোটা জাতি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।'

২

'তাহলে আপনি ফিরে এসেছেন', শহরের গ্যারিসন কমান্ডারকে তিন গেমে হারিয়ে স্যামুয়েল কনডন আপাদমস্তক ঘামতে ঘামতে জনসনকে বলে।

'ওই যে বলে না, ময়লা পয়সার মতো', অপিনিয়ন পত্রিকার প্রতিনিধি বলে।

'দেখুন, একটি বিখ্যাত ষড়যন্ত্র বানচাল করা হয়েছে, নতুন আর কোনো ষড়যন্ত্রের গুজবও বাতাসে নেই। শুয়ে শুয়ে ঘুমানো ছাড়া আর কিছু করার পাবেন না এখানে।'

'ষড়যন্ত্র নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। নানা এজেন্সি আছে, ওরাই যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে আশা করি।'

'তাহলে আপনার আগমনের হেতু কী?'

'দেখতে যে দেশটির হয়েছেটা কী। গতবার পুরো খোঁজখবর নেওয়া হয়নি।'

আমেরিকান কূটনীতিক হো-হো করে হেসে ওঠে। 'কীভাবে খুঁজবেন?'

'দেখতে পাচ্ছি, নির্বাচনের সময় যেসব রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা উসকে দেওয়া হয়েছিল, সেসব পুরোপুরি মরে যায়নি বরং সেসব বাস্তবায়নের জোরদার চেষ্টা চলছে। এসব চেষ্টা ব্যর্থ করতে আপনাদের জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুল কাদের শুধু কঠোর ব্যবস্থাই নিতে পারেন। কাতারে কাতারে লোকজন ধরে জেলে পাঠিয়েছেন, কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। আমার মনে হয়, আরেকটু কম নিষ্ঠুর ব্যবস্থা নিলেও চলত। প্রধানমন্ত্রী সংবাদপত্র আর বিরোধী দলেরও কণ্ঠরোধ করেছেন। সরকারপ্রধান হিসেবে এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রমাণ করেছেন, তার পূর্বসূরির চেয়েও তিনি স্বৈরাচারী, অথচ তার পূর্বসূরিকে কেউ জাতীয়তাবাদীই মনে করত না। তাছাড়া তাঁর পূর্বসূরির আমলে আমেরিকা শব্দটির প্রতি মানষের শ্রদ্ধাভক্তি কিছু ছিল। এখন সেটি ক্রমে একটি নোংরা শব্দে পরিণত হচ্ছে।'

কনডন আবার মৃদু হাসে। 'তাহলে আবদুল কাদেরকে পছন্দ নয় আপনার।'

'মার্কিন দূতাবাস কি তাকে পছন্দ করে?'

এবার কনডন আর হাসে না। 'সবাইকে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পরিস্থিতি বিচার করতে হয়। তিনি, মানে আমাদের এই আবদুল কাদের, মানুষ খারাপ নন। লোকটি কাজের, আর যদি মানেন তো বলি, তিনি জাতীয়তাবাদীও। শুধু তাঁর কপাল খারাপ। ক্ষমতায় বসার পর থেকে একের পর জটিল সব সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁকে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় হয়তো তাঁর একটু কম নিষ্ঠুর হলেও চলত, কিন্তু কে জোর দিয়ে বলতে পারে, কী করলে কী হতো।'

'সেনা কর্মকর্তাদের মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারেও কি কেউ সেটা বলতে পারবে না?'

'সেটাও কিন্তু যার যার মতামতের বিষয়। এ দেশে সেনাবাহিনীর আনুগত্য আর শৃঙ্খলার ঐতিহ্যের জন্য গর্ব করা হয়। এই ঐতিহ্য ভাঙার চেষ্টা যারা করেছে, তাদের প্রতি সরকারের কঠোর মনোভাবকে কি দোষ দিতে পারেন? না, আবদুল কাদেরের দোষ ধরার চেষ্টা করলে বলব, আপনি ভুল পথে এগোচ্ছেন। আমরা বিষয়টিকে এভাবে দেখি :

নির্বাচনের সময় কমিউনিস্ট আর তাদের সহযোগীরা মাথাচাড়া দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। আবদুল কাদের সুকৌশলে তাদের প্রত্যাশাকে পিষে ফেলে। তাই, তারা তার পেছনে লাগবে, এটিই স্বাভাবিক।'

'খুব সহজ ব্যাখ্যা, মনে হচ্ছে।'

'অর্থনৈতিক সংকটের বিষয়গুলিও উল্লেখ করতে হয়। এ বছর ফসলের খুব খারাপ অবস্থা গেছে। দেশের রপ্তানিও পড়ে গেছে। এ জন্য কি নতুন সরকারকে দায়ী করা যায়? কিন্তু কমিউনিস্ট আর তাদের সাঙাৎরা এ কাজটিই করছে।'

জনসন মাথা নাড়ে। 'আমার মনে হয়, ব্যাখ্যাটি অতিমাত্রায় সরল হয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরা যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কেন আক্রমণ করা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা এতে নেই।'

'এটি তো কমিউনিস্টদের বরাবরের কৌশল', কূটনীতিক বলেন।

অপিনিয়ন পত্রিকার প্রতিনিধি আবার মাথা নাড়ে। 'কী করে নিজেদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির দিকে পিঠ ফেরানো সম্ভব হলো সেটির কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কি আবদুল কাদের দিতে পেরেছেন?'

কনডন সহসা জবাব দেয় না। নিঃসন্দেহে মার্কিন দূতাবাস আবদুল কাদেরের এ পদক্ষেপের বিষয়টি উল্লেখ করতে চায় না, কারণ তারা এটিকে অন্যায় অথচ দরকারি একটি চতুর রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে মেনে নিয়েছে।

'আপনি আবদুল কাদেরকে জানেন', কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে কূটনীতিক বলেন, 'নিরপেক্ষতাবাদে কখনোই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। ফলে আপনি বলতে পারবেন না, আমাদের খুশি করার জন্য তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে।'

'আপনারা তাহলে আবদুল কাদেরকে পুরোপুরি সমর্থন করছেন, তার সমস্ত নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড না দেখার ভান করছেন?'

কনডন বিরক্ত ভঙ্গিতে চোখ পিটপিট করে। 'রাজনীতির একটি ছোট্ট সমস্যাকে আপনি অযথা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করছেন। একটি নতুন দেশে এসব স্বাভাবিক।'

জনসন সম্মত হয় বলে মনে হয় না। 'না, আমার এসব পছন্দ হচ্ছে না।'

কনডন ঈষৎ সামনে এগিয়ে আসে। 'আমাদের কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করতে আবদুল কাদেরকে বাধ্য করা? আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী কমিউনিস্টদের আমরা ক্ষমা করে দিতে বলব?'

'আপনার জায়গায় আমি হলে, আমি বোঝার চেষ্টা করতাম আবদুল কাদেরের বিরোধী পক্ষরা কী চায়। হতে পারে তাদের সবাই কমিউনিস্ট নয়। হয়তো তারা আসলে মার্কিন-বিরোধী নয়। নেতা হিসেবে যাদের ওপর তারা আস্থা রাখতে পারে না, শুধু তাদেরকেই হয়তো তারা অপছন্দ করে। হতে পারে, আমরা সেইসব নেতাকে মদদ দিচ্ছি বলেই আমাদেরও তারা অপছন্দ করতে শুরু করেছে।'

'আমাকে একটি কথার জবাব দিন। আপনি কি মনে করেন আবদুল কাদের মনেপ্রাণে নিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী হলে এবং এটিকে তার সরকারের নীতি বানালে আমাদের জন্য সেটি ভালো হতো? তাহলে আজ এ দেশে রুশদের, চীনাদের, চেকদের আর পোলদের রাজত্ব শুরু হতো।'

'আমার মনে হয়, আবদুল কাদের যদি তাঁর ওয়াদায় অটল থাকতেন এবং লাল ঝাণ্ডার বিদেশীরা পিপীলিকার মতো দেশ ছেয়ে ফেলা সত্ত্বেও আমরা যদি আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখতাম তাহলেই বরং দীর্ঘমেয়াদে লাভ হতো।'

'ধ্যাৎ', কনডন বলে, 'আপনি আর আপনার পত্রিকা দেখছি চরম ভাববাদী।'

'আমি প্রমাণ পেতে শুরু করেছি, শেষ পর্যন্ত টিকে যায় ভাববাদীরাই, অস্ত্র আর সম্পদের পূজারীরা নয়।'

কনডন তার বিশাল হাত দিয়ে সাংবাদিকের উরুতে মৃদু চাপড় মেরে হেসে বলে, 'আপনাকে এতটুকু নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমরা খুব খারাপ কিছু করছি না।'

৩

পরের তিনটি দিন জনসন সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ঘোরাফেরা করে। লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুব কিছু জানা যায় না, তবে যাদের সঙ্গে কথা হয়, দেখে তাদের প্রায় প্রত্যেকের স্থির ধারণা, পরিস্থিতি এখন পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে, যারা সমস্যা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

'প্রধানমন্ত্রীর সফরে তার সঙ্গী হবেন নাকি?' এক কর্মকর্তা জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে বুঝতে পারতেন তিনি কত জনপ্রিয়।'

প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তার পরিধি মাপার কোনো অভিপ্রায় জনসনের ছিল না। রাজনৈতিক সফরে বের হলে তার পূর্বসূরির বেলাতেও প্রচুর লোকসমাগম হতো, তবু জনগণ তাকে নির্মমভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে গ্রামের লোকজনের চিত্তবিনোদনের বড় অভাব, এ জন্য এসব আজেবাজে বক্তৃতা শুনতে মাইলের পর মাইল হাঁটতেও তারা কসুর করে না।

'তিনি যে খুব জনপ্রিয়, এতে আমার বিশেষ সন্দেহ নেই', সে উত্তর দেয়, 'তবে আমার পক্ষে শহরে অবস্থান করাই ভালো।'

'আপনি কি গণ্ডগোলের গন্ধ পাচ্ছেন নাকি?' চোখ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে কর্মকর্তা, 'আপনি কি মনে করছেন, প্রধানমন্ত্রী বাইরে থাকা অবস্থায় এখানে কিছু ঘটে যাবে?'

'আমি কোনো গন্ধটন্ধ পাচ্ছি না। সেটিই তো সমস্যা। বাতাস এখানে এমন সাফসুতরো করে ফেলা হয়েছে, মনে হচ্ছে, উপভোগই করছি। মনে হচ্ছে, দু-এক দিনের মধ্যে ফেরত যেতে হবে। যা হোক, সংখ্যাগুলি আবার বলবেন কি?'

'অবশ্যই', চোখের পলক না ফেলে জবাব দেয় কর্মকর্তা, 'এ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৩৯২ জনকে নিরাপত্তা আইনের অধীনে আটক করা হয়েছে। সর্বস্তরের লোকজনকেই ধরা হয়েছে। এর মধ্যে অবশ্য সেনাবাহিনীর লোকজনকে ধরিনি, তবে সংখ্যায় তারা খুব বেশি হবে না। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হয়তো তাদের সংখ্যা জানাতে পারবে। তবে মনে রাখবেন, সেনাবাহিনী কিন্তু কথাটথা বলতে খুব একটা পছন্দ করে না।'

'বিশেষত যদি আপনাদের মতোই হয় তাদের শৃঙ্খলার অবস্থা', জনসন খোঁচা দেয়।

'সেনাবাহিনী আমাদের গর্ব।'

'ঠিক আছে, আমি বরং যাই', জনসন উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গি করে।

কর্মকর্তাটি জনসনের মুখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়, 'এবার আপনাকে ততোটা প্রফুল্ল মনে হচ্ছে না।'

'তাই নাকি? হতাশ হলাম বলেই হয়তো। হাজার হাজার মাইল উড়ে এসে এখন যদি দেখি কুড়োবার মতো একটি খড়কুটোও নেই, কেমন লাগে বলুন? তবে আমার পেশাগত হতাশাই সবকিছু নয় কিন্তু। ভেতরে ভেতরে আমি খুশি। আপনার এবং আমার কারণে খুশি', দু হাতে আয়েশী ভঙ্গি করে জনসন উঠে পড়ে।

'আর দু-এক মিনিট বসুন। আরেক কাপ চা খাবেন? নাকি কফি?'

'বসছি, তবে চা-কফি দরকার নেই। ধন্যবাদ।'

কর্মকর্তা কিছুক্ষণ জনসনের দিকে তাকিয়ে থেকে নিচুস্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'বলুন দেখি কীসের গন্ধ পাচ্ছেন আপনি?'

জনসন প্রশ্নটি নিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করার ভান করে, তারপর পাল্টা প্রশ্ন করে, 'বলুন তো, আপনি কি খুশি? আমি দেখতে পাচ্ছি, পরিস্থিতি এখানে আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে, সরকারকে তা নিয়ন্ত্রণ করতে দিনকে দিন আরো কঠোর হতে হবে। এতে প্রতিপক্ষও শক্তি সঞ্চয় করবে। সব মিলিয়ে একটি দুষ্টচক্র তৈরি হবে, যা থেকে বেরিয়ে আসা মুশকিল। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার একটিই রাস্তা খোলা আছে। সংঘাতের পথে না গিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করা। আমাদের সরকারের সমর্থন নিয়ে আপনাদের সরকার কেবল যুদ্ধংদেহি হয়ে আছে। কিন্তু আপনার কি মনে হয়, এতে আমি, আপনি, আমরা লাভবান হবো?'

'আপনি অযথা পরিস্থিতিটিকে বড় করে দেখছেন। আপনি দেখছি নৈরাশ্যবাদী লোক'।

'হয়তো আমি নৈরাশ্যবাদী। কিন্তু একটি ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। দেরি করে বুঝে কোনো লাভ নেই। যথাসময়ে বুঝতে চেষ্টা না করার কারণে বহু জায়গায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ভিত্তি হারিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু অস্ত্রেরই আশ্রয় নিয়েছে।'

'সত্যি বলছি, আপনার বক্তব্য আমি বুঝতে পারছি না।'

জনসন কয়েক মুহূর্ত ভাবে। তারপর কথাটি বলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। 'আমার মনে হয়, সরকার যতটা দিতে রাজি, এ দেশের মানুষ তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু চায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, না আপনাদের না আমাদের সরকার এ দাবি মানতে প্রস্তুত।'

কর্মকর্তা একটি দীর্ঘ উত্তপ্ত বিতর্কের প্রস্তুতি হিসেবে যেন পিঠ সোজা করে। 'মি. জনসন', সে তীক্ষ্নস্বরে বলে, 'আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে, আমি এখনো আপনার কথা অনুধাবন করতে পারছি না। আপনার কি জানা আছে, সরকারকে স্থবির করে দেওয়ার জন্য সারা দেশে সুপরিকল্পিতভাবে বিক্ষোভ-মিছিল চালু রাখা ছাড়াও ইতিমধ্যে এ সরকারকে উৎখাতের দু-দুটি গুরুতর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে?'

'আমি জানি না এসব ষড়যন্ত্রের পেছনে কারা ছিল। তাদের উদ্দেশ্যও যে আমার কাছে খুব পরিষ্কার তাও বলব না। কিন্তু এত কষ্ট করে নানাভিকে অপসারণ করে এখন আবার সেই পুরনো পথই বহাল হতে দেখে জনগণ যে হতাশ হয়ে পড়েছে, এসব কি তারই প্রতিফলন নয়?'

কর্মকর্তা সহসা গম্ভীর হয়ে যান। ব্লটিং প্যাডের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি মাথা নাড়েন। 'না, আপনার কথাবার্তা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'সেটি আমি আশাও করিনি', জনসন কিছুটা অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলে। 'আপনার সান্ত্বনার জন্য বলছি, আমার দেশের সরকারও আমার কথা বুঝতে পারবে না।'

জনসনের বিদায় সম্ভাষণের জবাবে কর্মকর্তার শীতল কণ্ঠ ধ্বনিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিজের কক্ষের দরজায় ধাক্কা দিতেই পেছন থেকে একটি কণ্ঠস্বর শুনে জনসন চমকে ওঠে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে এক তরুণী, যে তাকে শোনা যায় না এমন নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি মি. জনসন?'

'হ্যাঁ, আমি জনসন। আপনি কোন পথে এলেন?'

তরুণী করিডোরের রেলিংয়ের দিকে দেখিয়ে দিয়ে ঈষৎ হাসে। 'তাছাড়া আমার জুতা বেশি শব্দ করে না।'

করিডরের স্বল্পালোকে মেয়েটির চেহারা বিশেষ চোখে পড়ে না, তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে জনসন সহসা বিস্মিত হয়। 'তোমার সঙ্গে আগে দেখা হয়েছিল। তুমি অর্থনীতির সেই অধ্যাপকের মেয়ে না, গতবারের সফরের সময় যিনি আমাকে নৈশভোজের দাওয়াত দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ', মেয়েটি হেসে উত্তর দেয়। 'আমি কি ভেতরে আসতে পারি?'

ঘরের ভেতরে জনসনের দেওয়া চেয়ারের কিনারায় বসে মেয়েটি। 'রাত হয়ে গেছে, কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা জরুরি ছিল।'

'অস্বস্তি দূর করে সব খুলে বলো', জনসন উষ্ণভাবে বলে। তরুণীর এ অপ্রত্যাশিত সফরে সে খুশি হয়, কেননা তার মনে হয়, গত তিন দিনে সে সবার কাছ থেকে যা শুনেছে, এ মেয়েটির কাছ থেকে তার চেয়ে ভিন্ন কিছু শোনা যাবে। 'যা হোক, ভালোই হলো তুমি দেখা করতে এসেছ। কী করে জানলে, আমি এখানে আছি?'

মেয়েটি খানিক দ্বিধা করে অবশেষে বলে, 'আমরা সংগঠিত হচ্ছি।'

'খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।'

'আপনাকে বলা দরকার, প্রথমবার আপনাকে দেখেই আমাদের পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মনে হয়েছে, আপনি ভালো লোক।'

'তোমার জায়গায় আমি হলে অত নিশ্চিত হতাম না।'

মেয়েটি অস্পষ্টভাবে কাঁধ ঝাঁকায়। 'যাই হোক, ঝুঁকি আমাদের নিতেই হয়।'

'ঘাবড়ানোর কিছু নেই', জনসন বলে, 'আমি শুধু ছাপানোর কাজে তথ্য ব্যবহার করি। পুলিশকে তথ্য দেওয়া আমার কাজ নয়।'

কথা শুরু করতে মেয়েটি কিছুটা সময় নেয়। চুপচাপ বসে কীভাবে শুরু করা যায় মেয়েটি ভাবতে থাকে। এ সময় তাকে একটি শিশুর মতো দেখায়। তারপর কপালের ওপর এসে পড়া একগোছা চুল সে সরায়। 'বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাগুলির ঘটনাটি শুনেছেন তো?'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'ওই গোলাগুলিতে আমার ভাই মারা গেছে।' একটু থেমে আবেগ গোপন না করে মেয়েটি বলে চলে, 'রাজনীতিতে ওর কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু সেদিন বিকেলে যে ওর কী হলো, পাগলা কুকুরের মতো পুলিশের দিকে ছুটে গিয়েছিল ও। আপনি দেখেছেন ওকে। আপনাকে আমাদের বাসায় নিয়ে গিয়েছিল।'

জনসনের সহমর্মিতাসূচক ধ্বনি উপেক্ষা করে মেয়েটি বলে চলে, 'তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল বলেই ভাবলাম কথাটি আপনাকে বলি। কিন্তু আপনাকে এ কথা বলার জন্য এখানে আসিনি। এ দেশে যে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে চলছে, আমরা চাই সেসব আপনি জানুন। তরুণ ছাত্রছাত্রীসহ বহু মানুষ এখন কারাগারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ তাদের নির্মমভাবে পিটিয়েছে। এতে কমপক্ষে তিনজন মারা গেছে। মনে করা হয়, তারা আত্মহত্যা করেছে। তাদের শরীরে নির্মম চাবুকের ক্ষত পাওয়া গেছে। মুশকিল হলো এসব কথা এখানকার জনগণের কাছে, বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার রাস্তা নেই। তারা শুধু এটুকু জানে যে, শ চারেক লোককে আটক রাখা হয়েছে এবং কারাগারে তাদের আরাম-আয়েশে দিন কাটছে। মনে করা হয়, এরা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত।'

জনসন তীক্ষ্ণভাবে মেয়েটির দিকে তাকায়, 'সেনাবাহিনীর ষড়যন্ত্রটি তো?'

'এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। সত্যি বলতে কী, কোনো ষড়যন্ত্র সম্পর্কেই আমাদের কিছু জানা নেই।'

'আমাকে কী করতে বলছ?' জনসন জিজ্ঞাসা করে।

'আমরা চাই, আপনি আপনার সরকার ও জনগণকে এখানকার সত্যিকার পরিস্থিতি জানিয়ে দেবেন, যাতে তারা এ সরকারকে সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ করে। তাদের এসব জানা উচিত। এখানে তাদের স্বার্থ কেবল পর্যটনে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়, আপনাদের সাহায্য ছাড়া এ দেশ স্রেফ ভেঙে পড়বে। এ দেশে আপনাদের দেশের স্বার্থ আছে, আর এ জন্য আমাদের জনগণের সমর্থন আপনাদের দরকার। যদি মনে করে থাকেন এ সমর্থন ছাড়াই আপনাদের চলবে, ভুল করবেন।' ক্রোধে উচ্চগ্রামে উঠতে থাকা মেয়েটির কণ্ঠস্বর শেষ দিকে ধনুকের ছিলার মতো কেঁপে ওঠে।

তার শান্ত হওয়ার জন্য জনসন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর বলে, 'তোমার নাম কিন্তু এখনো বলোনি।'

'সবাই আমাকে তিন্নি ডাকে।'

'দেখো তিন্নি, তোমার জানা দরকার, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অকিঞ্চিৎকর একটি সাপ্তাহিকীর এক অকিঞ্চিৎকর সাংবাদিক। প্রশাসনের কাছে আমরা কখনো তেমন জনপ্রিয়তা পাইনি, কারণ আমরা তাদের কঠোর সমালোচনা করি। আমার পক্ষে খুব বেশি কিছু করতে পারা সম্ভব নয়। তাছাড়া, তোমরা যদি আমার সরকারের সহমর্মিতা চাও তাহলে বলব, তোমরা ভুল পথে পা বাড়িয়েছ। তোমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিয়েছ, এ দেশে তোমরা তাদের চাও না। তোমরা যে কমিউনিস্ট নও, সে ব্যাপারে

তারা নিশ্চিত নয়। তোমরা যদি কমিউনিস্ট নাও হও, হতে পারে যে কমিউনিস্টরা তোমাদের মধ্যে মিশে আছে। সত্যি বলছি, এমনকি আমিই এখনো জানি না, তোমরা কারা, তোমরা কী চাও, কেন তোমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন ঘোর বিরোধী।'

তরুণী এই প্রথম সরাসরি জনসনের দিকে তাকায়, তারপর মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'আমরা মুক্তি ছাড়া আর কিছু চাই না। আমরা আমাদের নিজেদের খুশিমতো চলার স্বাধীনতা চাই।'

'এটি কোনো উত্তর হলো না। আবদুল কাদেরও একই জিনিস চান। ধরা যাক, ওয়াশিংটন বুঝতে পারল, আবদুল কাদের ভুল করছে, তারা তাকে শোধরানোর জন্য বলল, তোমার কি মনে হয়, তিনি সেটি বরদাশত করবেন?'

মেয়েটি মেঝের দিকে তাকিয়েই থাকে। 'তিনি আপনাদের সাহায্য চান, পুরোপুরি আপনাদেরই সাহায্য চান। তাকে সাহায্য করতেও দেখি আপনাদের আপত্তি নেই। এই যে, এখন এত সিআইএ এজেন্ট এখানে আসছে, কেন আসছে? তারা তো পর্যটক নয়।'

'বাজে কথা', জনসন সহসা উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বলে, 'স্রেফ একটি প্রোপাগান্ডা, তুমি যাদের সঙ্গে কাজ করো, তাদের কারো বানানো হয়তো।'

মেয়েটি মেঝে থেকে চোখ তোলে না, দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'বাজে কথা নয়। আমরা জানি।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর জনসন মেয়েটিকে জেরা করার দৃঢ় সংকল্প নেয়। খুব অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সে বলে, 'দেখো তিন্নি, তোমাকে একটি ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদি তথ্য-প্রমাণ দেখাতে পারো, তাহলে আমি এখানকার পুলিশি বর্বরতার কথা আমার দেশের জনগণকে জানাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু তুমি যাদের প্রতিনিধিত্ব করছ, তাদের সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য আমাকে দিতে হবে।'

'আমরা একটি নতুন দল গঠন করেছি, নাম স্বাধীনতা দল। ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্যসহ নানা মতের লোক আছে এতে।'

'আর কমিউনিস্ট পার্টির লোকজন?'

'আমি জানি না। যদি তারা থেকেও থাকে, কমিউনিস্ট হিসেবে নেই।'

'আবদুল কাদেরকে আক্রমণ করার আগে তাকে তোমরা কিছু সময় দিচ্ছ না কেন?'

মেয়েটির চোখ সহসা জ্বলে ওঠে। 'লোকটি একটা বিশ্বাসঘাতক। তাকে কীভাবে সময় দেওয়া সম্ভব? তিনি তো তার প্রকৃত রূপ নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করতে একদণ্ডও সময় নেননি। লোকে বলে, তার পক্ষে এটি করা সম্ভব হয়েছে, কারণ তার পেছনে আপনার সরকারের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। লোকে এও বলে, আপনাদের কারণেই তিনি বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছেন।'

তিন্নির ক্ষুদ্র মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে জনসন ভাবে, তারুণ্য উপভোগ করার বদলে এ বয়সী একটি মেয়েকে এমন একটি রোমান্টিক আদর্শের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে হয়েছে, এ বড় দুঃখজনক। মেয়েটি হয়তো জানেই না, এর সঙ্গে কত প্রতারণা, মিথ্যাচার, এমনকি অমানবিক বর্বরতা মিশে আছে।

'তোমার বয়স কত, তিন্নি?'

উত্তর দেবার আগে মেয়েটি দ্বিধা করে। 'বয়সে কিছু যায় আসে না। আমাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকজনই প্রায় নেই। আমরা একটি পুরো প্রজন্ম অপেক্ষায় বসে থাকতে পারি না।'

'খুব দুঃখজনক মনে হচ্ছে', সে বলে। মেয়েটি প্রত্যুত্তর না দেওয়ায় সে মাথা নেড়ে নরম ও বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, 'অনেক কিছুই আমার ভালো করে জানা নেই। সিআইএ এজেন্টরা সত্যি সত্যি এখানে এসেছে কি না, আমি জানি না। আমাদের লোকজনই আবদুল কাদেরকে তার নির্বাচনী ওয়াদা বিসর্জন দিতে বাধ্য করেছে কি না, তাও আমার জানা নেই। হতে পারে, এ সবই সত্যি; আবার এ সব কিছু প্রোপাগান্ডাও হতে পারে। তবে আমার অন্তরের অন্তস্তলে একটি সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে, আবদুল কাদের হয়তো উপযুক্ত লোক নন। অন্তত তিনি সেই লোকটি নন, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ আপনাদের দেখতে সাহায্য করবেন। কিন্তু একই সঙ্গে ওয়াশিংটনের অবস্থানটিও আমি বুঝি। তাদের পক্ষে বাইরের দেশে ঘন ঘন নেতৃত্বে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যেতে তারা বাধ্য হয়।'

'তাহলে আপনি কী করবেন?' মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, 'আপনিও কি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যাবেন?'

জনসন মেয়েটির দিকে তাকায়। 'তা হয়তো আমি করব না। না, ওয়াশিংটনকে সাবধান করে দেওয়ার স্বার্থে হলেও এ দমনপীড়নের কথা আমাকে জানাতে হবে। ওয়াশিংটনকে হুঁশিয়ার করা জরুরি।'

মেয়েটির মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি ঈষৎ বদলায়। হয়তো তার মধ্যে কোনো আশ্বস্ত ভাব এবং ঈষৎ সন্তুষ্টি দেখা দিয়ে থাকবে।

'এখন খুশি তো?' জনসন মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করে।

মেয়েটি এ প্রশ্নের উত্তর দেয় না। সে শুধু বলে, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' তারপর সে চট করে বলে, 'আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে? আপনাকে আরো বিস্তারিত কিছু তথ্য দেব।'

জনসন তাকে পরের দিন সময় দেয়। তারপর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে সে বলে, 'এক মিনিট।' মেয়েটি ফিরে দাঁড়ালে সে বিদ্রূপপূর্ণ হাসি হেসে বলে, 'একটি প্রশ্নের জবাব দাও। মার্কিনিদের যারা ঘৃণা করে, তুমি কি তাদের দলে?'

মেয়েটি দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে দৃঢ়ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে, সহসা জনসন তার গভীর চোখের চাহনিতে এক প্রকার বন্ধুত্বের ছোঁয়া অনুভব করে। মেয়েটি ক্ষীণ হেসে বলে, 'আপনারা আমাদের যতটা ঘৃণা করেন বা ভালোবাসেন, আমরাও আপনাদের ততটাই ঘৃণা করি বা ভালোবাসি।'

'একটুও কম বা বেশি নয়?'

'একটুও না।'

তারপর মেয়েটি চলে যায়, এক নাজুক তরুণী, পাতলা স্যান্ডেল পায়ে নিঃশব্দে হেঁটে যাওয়ার সময় তার লম্বা বেণী তেমন একটা দোলে না।

তৃতীয় অধ্যায়

১

রাষ্ট্রদূত হথর্নের ভাবলেশহীন মুখমণ্ডলে তৃপ্তির আভা।

'ভদ্রমহোদয়গণ', কনফারেন্স টেবিলের চতুর্দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'সবকিছুই উপযুক্ত সময়ে এসে পৌঁছেছে। তাই আসুন এখন কালবিলম্ব না করে কাজে নেবে পড়া যাক।'

তৃপ্ত বোধ করার পর্যাপ্ত কারণ আছে। দূতাবাসের বিভিন্ন বিভাগ ও টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেন্স এজেন্সির লোকজনের উপস্থিতিতে এক বৈঠকে তিনি বক্তৃতা করছিলেন, বরাদ্দপ্রাপ্ত বিভিন্ন জরুরি প্রকল্প এইমাত্র এ বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলি হলো : দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার জন্য দুটি বৃহৎ শস্যাগার, বিনামূল্যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বিতরণ, একটি সার কারখানা ও একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে হাসপাতালে ক্রান্তীয় অঞ্চলের রোগশোক মোকাবিলার উপযোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাগার নিয়ে একটি পৃথক শাখা প্রতিষ্ঠা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ বছর তরুণ-তরুণীদের তিনটি পৃথক দলকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হবে, আরো এক শত লোককে দেওয়া হবে ফেলোশিপ, একটি মার্কিন ব্যালে দল এ দেশ সফর করবে, স্থানীয় সাহিত্য বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন থাকছে— আর এ সবকিছুর খরচ বহন করবে আমেরিকার সুপরিচিত একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

বস্তুত এসব নিয়ে রাষ্ট্রদূত নিজের ওপর এত বেশি তৃপ্ত হয়ে ওঠেন যে, শস্যাগার কোন এলাকায় স্থাপন করা হবে, সে বিষয়টি আরেকবার বিবেচনা করে দেখার ব্যাপারে জর্জ হার্ভের আবেদন তিনি বাতিল করে দেন। প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায়, সেগুলি তাঁর নিজস্ব এলাকা দক্ষিণাঞ্চলে স্থাপন করা হোক। হার্ভের যুক্তি, সেটি আর্থিক বিচারে যথাযথ হবে না, কারণ একটি প্রশস্ত নদী দ্বারা দেশটি বস্তুত দু ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে, এর ওপরে একটিমাত্র রেলব্রিজ, জরুরি পরিস্থিতিতে এ যোগাযোগ-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। 'এর মানে দক্ষিণাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের আঁচও লাগবে না, আর ওদিকে উত্তরাঞ্চল ভুখা থাকবে', হার্ভে বলেন।

'প্রধানমন্ত্রী যেভাবে চান, সেভাবেই এটি হতে দিন। তার এভাবে চাওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই যথাযথ কারণ আঁছে', সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন রাষ্ট্রদূত।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর রাষ্ট্রদূত আবার কনফারেন্স টেবিলের চতুর্দিকে তাকান, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে ধীরস্থির কণ্ঠে বলেন, 'আপনারা অবশ্যই জানেন এই কর্মসূচিগুলি ঠিক এ মুহূর্তে গ্রহণ করতে পেরে কেন আমি খুশি। বাইরে থেকে পরিস্থিতি খুব স্বাভাবিক মনে হতে পারে। সরকার সন্তুষ্টচিত্তে মনে করছে, ফাঁড়া কেটে গেছে, দুষ্কৃতকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এ দেশে আমাদের সুনাম যাতে ক্ষুণ্ন না হয়, সে জন্য পত্রপত্রিকাগুলি যথাসাধ্য করছে। কিন্তু কমিউনিস্টদের পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করা গেছে কি না, আমি নিশ্চিত নই। আমাকে এও স্বীকার করতে হয়, তাদের লক্ষ্যপূরণে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি বলে আমার মনে হচ্ছে। যেমন ধরা যাক, গতকাল গবাদিপশু পালনসংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করতে গিয়ে আমার মনে হয়, মানুষজন যেন বরাবরের চেয়ে একটু কম আন্তরিক। হতে পারে শুধু আমারই এরকম মনে হচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য ছোটখাটো ব্যাপারে কী ঘটছে? এই সেদিন জিমের গাড়ির পেছনে 'ঘরে ফিরে যাও' লেখা স্টিকার পাওয়া গেল। আরেক দিন আমাদেরই কারো একজনের স্ত্রী বাজারে জিনিসপত্রের দরকষাকষি করতে গেলে তার দিকে দোকানি শীতল চোখে তাকায়। তুচ্ছ ঘটনা, সন্দেহ নেই; কিন্তু এক এক করে জোড়া লাগালে একটি বড় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তারপর আসুন, আমাদের পিস কোর ভলান্টিয়ারদের কথায়। এদের অনেককেই অনবরত জ্বালাতন করা হচ্ছে। এ সবকিছু থেকে বোঝা যায়, কমিউনিস্টরা তাদের খেলা একেবারে ত্যাগ করেনি, তারা এখন এখানে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। এখানে সর্বদা আমরা ভালোবাসা ও সম্মানের আসনে থেকেছি। এ অবস্থান আমরা অর্জন করেছি সাহায্য হাতে এখানে আসারও বহু আগে। বিচ্ছিন্ন যেসব আমেরিকান স্বীয় উদ্যোগে এখানে এসেছেন, তাঁরাই আমাদের জন্য এ অবস্থান তৈরি করে দিয়েছেন। গত বছর মারা গেছেন কেইথ, তিনি তো শেষ পর্যন্ত এখানকার নেটিভ হয়ে গিয়েছিলেন। এ দেশের জন্য তিনি যা যা করেছেন, সে জন্য তাঁর নাম লোকের মুখে মুখে। এরকম আরো অনেকে আছেন। সাহসী নারী মিস ক্যাথরিনের কথাই ধরুন। গত তিন দশক ধরে তিনি প্রসবকালীন মৃত্যুর বিরুদ্ধে একাগ্রচিত্তে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। এখন আধা অথর্ব হয়ে পড়া সত্ত্বেও তিনি সেই যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছেন। আমি জানি না কীসের টানে তাঁরা এসেছেন, আর যা-ই হোক কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তো আসেননি। তাঁদের নিঃস্বার্থ মানবিক কর্মকাণ্ড এখানকার মানুষের কাছে আমাদের প্রিয় করে তুলেছে। কমিউনিস্টরা সেটি ধ্বংস করে ফেলুক তা আমরা হতে দিতে পারি না। যারা আমাদের ভালোবাসে আমাদের প্রতি তাদের মন বিষিয়ে উঠবে, তা হতে দেওয়া যায় না। এসব কর্মসূচি ঘোষণা করতে পেরে এ কারণে আমি খুশি। আরেকটি কথা। যতভাবে পারা যায়, আবদুল কাদেরকে আমাদের সাহায্য করা উচিত। কমিউনিস্টরা তাঁকে দাসানুদাস হিসেবে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করবে, কিন্তু তাঁর সাহায্য দরকার। যে কারণে আপনাদের এসব কথা বলছি ভদ্রমহোদয়গণ, তা হলো, আমাদের সবাইকে অবশ্যই পরিস্থিতি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং কমিউনিস্টদের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। সর্বোপরি, এখানকার লোকজনের বেলায় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কমিউনিস্টরা আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করার সুযোগ না পায়।'

জর্জ হার্ভে বলেন, 'আমি এ কথা মনে না করে পারছি না যে, আমি পুরোপুরি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও আমার কারণেই এ সবকিছুর শুরু।'

'সে জন্য চিন্তা করবেন না, জর্জ', রাষ্ট্রদূত আশ্বস্ত করেন, 'আপনি হয়েছেন তাদের প্রথম শিকার।'

কনফারেন্স শেষ হয়।

২

'আজ সকালে কথাটি আপনাকে বলার সময় পাইনি।' অফিস কক্ষে ফিরলে রাষ্ট্রদূতকে কনডন বলে, 'মনে হচ্ছে সরকারকে মোকাবিলা করার জন্য একটি গোপন সংগঠন গড়ে উঠেছে, আমরা এখনো জানি না সংগঠনটি কতখানি কমিউনিস্ট। এটির নাম স্বাধীনতা দল।'

দীর্ঘ কনফারেন্সে ঈষৎ ক্লান্ত রাষ্ট্রদূত নীরবে এ ঘোষণা শোনেন। মনে হয়, তাঁর কিছু বলার নেই। তিনি টেবিলের ওপর রাখা জিনিসপত্র অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করেন, টেবিল-ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর বিশেষ কোনো কিছুর দিকে না তাকিয়ে কয়েকবার নিচের ঠোঁট সঞ্চালিত করেন, তারপর বলেন, 'সংগঠনটি সম্ভবত আমাদের বিরুদ্ধেও লাগতে চায়, তাই না?' কনডন কিছু বলার আগেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কী চায় ওরা?'

'বলে তো স্বাধীনতা চায়।'

রাষ্ট্রদূত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করেন, 'কীসের স্বাধীনতা? আর তা না-ই বা মনে করছে কেন তারা?' তাঁর কণ্ঠে ক্রুদ্ধ ভাব। টেবিলের জিনিসপত্র আরো কিছু সময় ধরে নাড়াচাড়া করে কনডনকে ঈষৎ বিস্মিত করে তিনি সহসাই ঘোষণা করেন, 'তোমাকে একটি কথা বলি, স্যাম। বেশ কয়েকদিন ধরেই ভাবছি কথাটি। এসব ঝামেলার জন্য একটি লোকই দায়ী, সে হলো গর্দভ নানাভি। দরকার না থাকলেও সে-ই ছিপি খুলে জিনটিকে বের করে এনেছে।'

এ হুঙ্কারের পর হথর্ন শান্ত হতে থাকে বলে মনে হয়। 'নতুন এ দল সম্পর্কে বিস্তারিত বলো। তবে খুব একটা দুশ্চিন্তা আমি করব না, কারণ জানি এদের কব্জা করার কায়দা আবদুল কাদেরের ভালো জানা আছে।'

'তার মানে আরো গ্রেপ্তার, আরো নিপীড়ন', কনডন আবেগশূন্য কণ্ঠে বলে, 'এর শেষ আসলে কোথায়?'

'এসব করতে ওরাই তো বাধ্য করছে, করছে না? আবদুল কাদেরের জন্য আফসোস হয়। ক্ষমতা গ্রহণের পর বেচারা এক মিনিটের জন্য শান্তি পায়নি।'

কনডন আরেকটি বিষয় নিয়ে ভাবছিল। 'আমি ভাবছি, এসব ব্যাপারে এতদূর নাক গলাতে থাকা আমাদের উচিত হবে কি না। হয়তো ঝড় পুরোপুরি থেমে না যাওয়া পর্যন্ত এ সরকারের প্রতি আমাদের খুব বেশি প্রকাশ্য উৎসাহ না দেখানোই ভালো।'

'না, আমরা সেটি করতে পারি না। আমাদের বন্ধুকে সাহায্য না করাটা অনৈতিক বলেই বলছি না—তাছাড়া রাজনীতিতে সবাই সবসময় এত নৈতিক থাকতেও পারে না—বলছি এ কারণে যে, আমাদের নিষ্ক্রিয়তায় প্রতিপক্ষ উৎসাহ পাবে। তাদের অবশ্যই জানিয়ে দিতে হবে, আমরা পুরোপুরি সরকারের পক্ষে আছি।'

'আশা করি সেই জিনকে শীঘ্রই আবার বোতলে ভরে ফেলা সম্ভব হবে', কনডন বলে।

৩

রোমাঞ্চকর এক অনুভূতিতে চোখ বন্ধ করে জনসন বলে, 'মনে হচ্ছে, অপহৃত হয়ে গেছি এবং অন্ধকার, রহস্যময় অলিগলি পেরিয়ে পূর্বদেশীয় কোনো ঐশ্বর্যময় স্থানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে কোনো অপরূপা রাজকন্যার সঙ্গে আমার দেখা হবে, বহু বছর ধরে যে গোপনে আমার প্রেমে ডুবে আছে।'

তিন্নি হেসে ওঠে। কোনো কথা বলে না।

পুরনো গাড়িটি প্রশস্ত এভিনিউ বেয়ে ছুটে যায়, কোনো অন্ধকার গলিপথ অবশ্য নেই, তাছাড়া বিকেল গড়িয়ে গেলেও নির্মেঘ আকাশে রোদের তেজ বাতাসে কোনো রহস্যের ছিটেফোঁটা রাখছে না।

জনসন চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে, 'আমাকে কোথায় নিয়ে চললে?' মেয়েটিকে তৃতীয়বারের মতো সে জিজ্ঞাসা করে। তিন্নি হাসে। 'আপনাকে না বলেছি, কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।'

গাড়িতে ওরা তিনজন : তিন্নি, জনসন ও এক তরুণ চালক। এখনো পর্যন্ত চালক একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। সে যেন এ মুহূর্তের কর্মটির চেয়ে ভিন্নতর কোনো পদের অধিকারী। জনসন ও মেয়েটি পেছনের আসনে বসেছে, তাদের মধ্যবর্তী স্থানে অনায়াসে যে কোনো পৃথুল ব্যক্তির জায়গা হয়ে যেত।

অন্য জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকা নিশ্চুপ মেয়েটির দিকে জনসন আবার তাকায়, 'গত রাতের চেয়ে তোমার বয়স আজ যেন একটু বেড়ে গেছে?'

'তাই নাকি?' তার দিকে ঈষৎ ফিরে তিন্নি বলে, 'নিজের ইচ্ছেমতো আমরা বড়-ছোট হতে পারি।'

'আমি চাই, তুমি এরকমই থাকো। গত রাতে তোমাকে একটু বেশিই অল্পবয়সী মনে হচ্ছিল।'

'আমার বয়স নিয়ে আপনাকে বিশেষ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে', ঈষৎ রক্তিম হয়ে মেয়েটি বলে, 'আপনাকে না বলেছি, বয়স নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না।'

'মিথ্যে কথা', জনসন বলে, 'তুমিই শুধু এ নিয়ে মাথা ঘামাও না। কারণ রাজনীতি কিংবা যেটিই করছ বলে মনে করো না কেন, এতে জড়িয়ে পড়ার মতো বয়স তোমার হয়নি।'

তিন্নি আর কথা বলবে না মনস্থ করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

রাস্তা অমসৃণ হয়ে ওঠায় গাড়ি এবার ভীষণ ঝাঁকি খেতে থাকে। রাস্তা খানা-খন্দে ভর্তি, চালক সেগুলি এড়াবার চেষ্টা করছে না।

'তুমি আমার চোখ বেঁধে ফেলছ না কেন?' খানিক পরে প্রসন্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে জনসন, 'আমি তো রাস্তা চিনে তোমাদের গোপন সদর দপ্তরের ঠিকানা ফাঁসও করে দিতে পারি।'

'চোখ বাঁধার দরকার নেই', মেয়েটি বলে, 'আমরা জানি আপনি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। যাদের ওপর আস্থা রাখা যায়, আমরা তাদের ওপর আস্থা রাখি।'

'কিংবা তুমি হয়তো জানো, আমার আর ফিরে যাওয়া হবে না।'

'আপনি ফিরবেন এবং এ পথ দিয়েই।'

'না, তুমি দেখছি মজাটিই মাটি করে দিচ্ছ। আমি তো এরই মধ্যে রাজকন্যাকে দেখতে পাওয়ার আশা ত্যাগ করেছি। তোমরা কি আমাকে জিম্মি করারও চেষ্টা করবে না নাকি, যাতে ওয়াশিংটন বর্তমান সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে, আর তোমাদের ক্ষমতায় বসায়?'

তিন্নি এবার ছোট্ট খুকির মতো হেসে ওঠে, 'আপনি খুব শয়তান। চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না?'

'আমি বকবক করছি স্নায়ুর কাঁপাকাঁপি কমাতে। এই সফরে ভয় ঢুকতে শুরু করেছে।' কৃত্রিম আতঙ্কের গলা করে জনসন বলে।

তিন্নি মুখ ফেরায় না, তবে জনসন জানে সে হাসি চাপার চেষ্টা করছে।

গাড়ি বাঁক ঘুরে সহসা আরো সংকীর্ণ কাদামাটির রাস্তায় প্রবেশ করে, বৃক্ষের ঝুলে পড়া ডালপালা গাড়ির ছাদে ঘষা খায়। পানিতে টইটুম্বুর একটি পুকুরের পাশ দিয়ে বিপজ্জনকভাবে বাঁক ঘুরে গাড়ি এসে এক ভগ্নপ্রায় প্রাচীন ইটের বাড়ির সামনে থামে।

'এই আমরা এসে পড়েছি', তিন্নি বলে। তারপর দরজা খুলে লাফিয়ে গাড়ির বাইরে বেরোয়। সামনের পুরনো বাড়িটির দিকে তাকিয়ে খুশি হওয়ার ভঙ্গি করে গাড়ি থেকে জনসন নেবে অপেক্ষমাণ মেয়েটির দিকে ফেরে। 'ভুতুড়ে বাড়ি মনে হচ্ছে।'

মেয়েটির ঠাট্টায় যোগ দেওয়ার মতো অবস্থা নেই। 'প্লিজ আসুন, ওরা অপেক্ষা করছে', মেয়েটি ক্ষীণ বিরক্তির সুরে বলে।

এ সময় লম্বা শীর্ণকায় এক লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে শশব্যস্ত হয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসে। কাছে এলে জনসন দেখে তার উৎকণ্ঠিত মুখে স্নিগ্ধ হাসির রেশ।

চতুর্থ অধ্যায়

১

নিস্তব্ধতা নেবে এলে জনসন অনুধাবন করে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেছে, বাইরে তারস্বরে ঝিঁঝি ডাকে। বাইরে থেকে মাটির সোঁদা গন্ধ এসে মিশেছে ভেতরের পচা গন্ধের সঙ্গে। শীঘ্রই দুটি কেরোসিনের লণ্ঠন আনা হলে উঁচু ছাদের কক্ষটিতে বিষণ্ন আলো ছড়িয়ে পড়ে। নিঃসন্দেহে বাড়িটিতে বিদ্যুৎ নেই।

জনসনকে সরকারের 'বর্বর ও ফ্যাসিবাদী' কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং যাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে তাদের বিস্তারিত বিবরণ শোনানো হয়, বেশির ভাগকেই ধরা হয়েছে শুধু রাজনৈতিক সংস্রবের কারণে। তাদের ওপর চালানো পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী শোনানো হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সরকারের ভাষ্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি লোক কারারুদ্ধ হয়েছে। তবে গত রাতে এর সপক্ষে যেসব তথ্যপ্রমাণের কথা মেয়েটি উলেখ করেছে, বস্তুত তা সংখ্যায় বেশি নয়। ব্যাখ্যায় তাকে বলা হয়, যাদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে, তারা তো এখনো কারাগারেই আবদ্ধ, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও তাদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না, এ অবস্থায় প্রমাণ জোগাড় হবে কী করে। কেউ কেউ নিজেদের দূরবস্থার লিখিত বিবরণ কোনোক্রমে বাইরে পাঠাতে সক্ষম হয়। তাই এসব কথা বিশ্বাস করবে কি করবে না, তা যে পড়ছে তার নিজের ইচ্ছা। যে গুটিকয়েক সহমর্মী পুলিশ কর্মকর্তা ভেতরের খবর তাদের দিয়েছে, প্রকাশ্যে তাদের জিজ্ঞাসা করা হলে তারাও নিশ্চয় তা অস্বীকার করবে। যে তিনজন লোক কারাগারের ভেতর আত্মহত্যা করেছিল, কেউ একজন তাদের ছবি তুলেছিল; কিন্তু লাশের গায়ে ভয়াবহ নির্যাতনের চিহ্ন থাকায় ছবিগুলি জব্দ করা হয়, পরে আলোকচিত্রীকেও কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তাছাড়া বহু লোকের কোনো খোঁজই নেই। তারা কারাগারে আটক আছে, খুন হয়ে গেছে, নাকি নিজেরাই গা-ঢাকা দিয়ে আছে—জানা যায় না। অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রমাণ হিসেবে গণনা করা যায় না।

জনসন চতুর্দিকে ছোট্ট দলটিকে দেখে নেয়। মেয়েটি বাদে চারজন মানুষ তাকে সন্দেহ করে বাড়িটির ভেতরে এনেছে, এখন তারা এক কোণে নিশ্চুপ বসে আছে। এক এক করে তারা সবাই কথা বললেও বাজপাখির মতো চোখের অসম্ভব শীর্ণ লম্বা ভালো

মানুষটিকে এদের নেতা বলে প্রতীয়মান হয়। তারা চাপা স্বরে কথা বলে, এমনকি নির্যাতনের বর্ণনা দেওয়ার সময়ও এদের কণ্ঠ উচ্চগ্রামে ওঠে না। কথাবার্তায় মাঝে মাঝে ক্ষীণ বিষাদের রেশ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রত্যাশিত ঘৃণা যেন নেই। এরা বিশেষ অবস্থাপন্ন নয়, আচার-ব্যবহারে নম্র। জনসন কথা বললে (স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্য জনসনকে তার স্বভাবজাত উঁচু গলা নাবিয়ে রেখে কথা বলার চেষ্টা করতে হচ্ছিল) তারা শ্রদ্ধাভরে শোনে, তার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ কর্ণগোচর করার জন্য অপ্রয়োজনে ঘাড় কাত করে। তবে মাঝে মাঝে সামান্য কিছু জিজ্ঞাসাবাদে জনসন মূলত শ্রোতার ভূমিকা নেয়।

লম্বা শীর্ণ লোকটি নিস্তব্ধতা ভাঙে। 'নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবছেন এসব শোনাতে আমরা আপনাকে কেন এখানে নিয়ে এলাম। আমরা কিন্তু জানি না, আপনার সহমর্মিতা কোনদিকে। আমরা শুধু আপনার সাপ্তাহিকীটির কথা জানি এবং মনে করেছি, পুলিশের বর্বরতাকে আমাদের মতো আপনারও নৃশংস মনে হবে এবং এই সহজ-সরল যুক্তিতে এসব প্রকাশ করতে রাজি হবেন যে, এগুলি বহাল থাকলে এ দেশে আমেরিকার অবস্থানের কোনো ফায়দা হবে না।'

'আমি আপনাদের একটি সোজাসাপ্টা প্রশ্ন করি', জনসন বলে, 'আপনারা কি মনে করেন, আপনাদের এসব নীতি যদি আপনারা এখানে বাস্তবায়নের সুযোগ পান, তাহলে তাতে আমাদের অবস্থানের পক্ষে তা সহায়ক হবে?'

শীর্ণ লোকটি নির্দ্বিধায় জবাব দেয়, 'আমি শুধু এটুকু বলব যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এ সরকারের পক্ষ অবলম্বন অব্যাহত রাখে, তাহলে ধীরে ধীরে সে তার অবস্থান হারাবে। জনগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে, শীঘ্রই তারা নিঃসন্দেহ হয়ে যাবে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি প্রকাশ্যে এ বর্বরতার নিন্দা জানায়, সেক্ষেত্রে আমরা ক্ষমতায় এলে এরকম লেজুড়বৃত্তি করা সরকার হয়তো তারা পাবে না, তবে আমরা শত্রুও হব না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার পক্ষে কোনটি করা ভালো হবে।'

'আপনারা তো আদৌ ক্ষমতায় নাও আসতে পারেন।'

'তারপরও নৈতিকতার প্রশ্নটি থেকে যায়। আমরা এক আলোকিত বিশ্বে বসবাস করছি। নাগরিকের মতো রাষ্ট্রকেও নীতি-নৈতিকতা মেনে চলতে হবে। তাছাড়া আমরা আপনাদের সাহায্য চাই না। আমরা শুধু আপনাদের জানাতে চাই, আপনাদের জনগণকে জানাতে চাই তাদের সরকার এখানে কী করছে।'

'ধরা যাক, আমি আমার পাঠকদের বললাম, এখানে যারাই নিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, সরকার তাদেরই হত্যা করছে, আপনারা কি মনে করেন তাতেই ওখানে সবাই নাড়া খাবে, বিশেষত এসব কর্মকাণ্ড আত্মরক্ষার খাতিরে গ্রহণ করা হচ্ছে জেনেও? ওয়াশিংটন নিতান্ত বাধ্য হয়ে কোথাও কোথাও নিরপেক্ষতাবাদ হজম করে, কিন্তু এতে উৎসাহ দেওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না। নিরপেক্ষতাবাদের চোরাবালি এত ভয়ানক যে ওয়াশিংটন এটিকে হেলাফেলা করতে পারে না।'

শীর্ণ লোকটির পাশে হাঁটু জড়িয়ে বসে থাকা একজন চশমাপরা লোক এবার কথা বলে। স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ কণ্ঠে সে বলে, 'ওয়াশিংটনের আহাম্মুকে অদূরদর্শী আশঙ্কাগুলি আমরা ভালোই বুঝতে পারি। কিন্তু নিরপেক্ষতাবাদকে আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় মনে করি। আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমাদের সুবিশাল দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা দূর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে যৌক্তিক পথটি

গ্রহণ করতে চাই। আমরা বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে, কারণ এ সরকার এ জাতীয় স্বাধীনতাকামী মানুষের দাবির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আর তাই এ সরকারকে সাহায্য করার জন্য আমরা স্বাভাবিকভাবে আপনাদেরও বিরুদ্ধে।'

লম্বা শীর্ণ লোকটি বলে, 'আমরা কী ধরনের স্বাধীনতা চাই, তা যদি আপনারা বুঝতে পারতেন এবং এর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেন, আমাদের নিরপেক্ষতাবাদের দাবি তোলার হয়তো দরকারই পড়ত না।'

চশমাপরা লোকটিকে জনসন জিজ্ঞাসা করে, 'দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রে আপনাদের সবচেয়ে যৌক্তিক পথটি কী?'

চশমাপরা লোকটি শীর্ণ লোকটির দিকে তাকায়, উত্তর জানে না সে জন্য নয়, উত্তর দেবে কিনা এ কথা জেনে নিতে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর শীর্ণ লোকটি সাব্যস্ত করে সে নিজে উত্তর দেবে। সে বলে, 'আমাদের একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি আছে, সমাজতন্ত্রের চেয়ে খুব বেশি আলাদা নয়। আমরা এ নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেছি। বুঝতে পেরেছি, আমাদের গরিব দেশটিকে রক্ষা করার এটিই একমাত্র পথ। আমরা চাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বিশাল দেশ সেটি বুঝুক। আমরা আপনাদের এও বোঝাতে চাই যে, এ পদ্ধতি আপনাদের দেশে চালু করার পরামর্শ দেওয়ার কোনো অভিপ্রায় আমাদের নেই। এর বিনিময়ে আপনারা আমাদের নিজ মর্জিমতো পথে চলতে দেবেন।'

'সহাবস্থান?' ঈষৎ বিদ্রূপমিশ্রিত কণ্ঠে জনসন বলে।

'না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা দেশগুলির নিজ নিজ চাহিদার ব্যাপারে পারস্পরিক সমঝোতা। আপনি যে সহাবস্থানের কথা বলছেন, সেটি হলো দুই দৈত্যের একে অপরকে বিরক্ত না করে থাকার একটি বন্দোবস্ত।'

জনসন উর্ধ্বমুখে হারিকেনের স্বল্পালোকে অগম্য অন্ধকার ছাদের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ বসে থাকে। সহসা তার প্রথম সফরের সময় দেখা হওয়া অধ্যাপক আহসানের কথা মনে পড়ে। মনে হয়, এ লোকগুলি সেই অধ্যাপকের মতোই কথা বলছে।

'অর্থাৎ আপনাদের একটি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি আছে।' জনসন বলে।

তিনজন একত্রে কিন্তু নিম্নকণ্ঠে বলে, 'আপনি সেভাবে ভাবলে ভাবতে পারেন।'

জনসন এখনো ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে একটি সিগারেট ধরিয়ে মুখভর্তি ধোঁয়া ছাড়ে, তারপর কণ্ঠ ঈষৎ রূঢ় করার চেষ্টা করে বলে, 'আপনাদের সঙ্গে এমন জঘন্য আচরণ করার জন্য কি আপনারা আবদুল কাদেরকে দোষী করতে পারেন? তিনি তো সমাজতন্ত্র-বিরোধী। আপনাদের আরেকটি কথা বলি। এরকম কর্মসূচি নিয়ে আমাদের জনগণকে খুব বেশি টানতে পারবেন না। আপনাদের খোলাখুলি বললাম।'

সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়, জনসনের সোজাসাপ্টা ঘোষণায় ভাষা হারিয়ে ফেলেছে যেন। তারপর ঠাণ্ডা লাগার কোনো চিহ্ন না থাকলেও গলায় মাফলার জড়িয়ে রাখা তৃতীয় একটি লোক অস্বাভাবিক মার্জিত ভঙ্গিতে বলে, 'এখানে আপনাদের সত্যিকার কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থ নেই, সে জন্য আমাদের কর্মসূচিতে আপনাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। যে কর্মসূচি আমাদের জনগণকে স্বল্পতম সময়ে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান দেবে, তার বিরোধিতা আপনারা কেন করবেন?'

'নিজেদেরকে যত সরলভাবে উপস্থাপন করছেন, অত সরল আপনারা হয়তো নন।'

সবাই পরস্পরের দিকে তাকায়, জনসনের মন্তব্যের অর্থ যেন বোধগম্য হয়নি। জনসন তাদের ওপর নজর বুলিয়ে নেয়। 'আপনাদের কি মনে হয় না, দারিদ্র্যসমস্যা সমাধানের কোনো গণতান্ত্রিক পথ আছে?'

'আমাদের পথ গণতান্ত্রিক', লম্বা শীর্ণ লোকটি বলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর জনসন বলে, 'আপনাদের দলের আয়তন কত বড়?'

ঈষৎ দ্বিধা করার পর চশমাপরা লোকটি বলে, 'আমরা জানি না। নিজেরাই জানার চেষ্টা করছি।'

তখন জনসন আগের রাতে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নটি আবার করে, 'সেনাবাহিনীর ষড়যন্ত্রটির কী অবস্থা? তাদের সঙ্গে কি আপনাদের কোনো সংস্রব ছিল?'

'না', দলের নেতা উত্তর দেয়। 'দেখুন, গোটা জাতি যখন প্রতারিত বোধ করে, বিচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় আলাদা আলাদা নানা গ্রুপের পক্ষে তখন একই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং প্রায় একই ধাঁচে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব।'

শীঘ্রই কথা ফুরিয়ে যায় বলে মনে হয়। কিছুক্ষণ কক্ষে নিস্তব্ধতা জমাট হয়ে চেপে বসে। বাইরে একটি নিশাচর পাখি অচেনা সুরে ডাকে।

'তারপর?' ঘরের একমাত্র চেয়ারটি ছেড়ে ঈষৎ ওঠার ভঙ্গি করে জনসন বলে, আতিথেয়তার খাতিরে তাকে এ চেয়ারে বসিয়ে বাকিরা কাঠের তক্তপোষে বসেছে। 'আমি এখন শহরে ফিরতে চাই।'

লম্বা শীর্ণকায় লোকটি উঠে দাঁড়ালে বাকিরাও তাই করে। পেছনে তিনিও তাদের অনুসরণ করেন।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে লম্বা শীর্ণ লোকটি বলে, 'আমরা আপনাকে সবকিছু খোলাখুলি বললাম, কারণ লুকাবার কিছু নেই। সরকার বলতে দিলে আমরা প্রকাশ্যেও এসব কথা বলতে রাজি। আপনাকে এসব শোনাতে চেয়েছি, কেননা আপনার দেশের লোকজন এ দেশের প্রতি আগ্রহী। ফরাসি বা জার্মানদের ডাকার তো অর্থ হয় না। আপনারা এসব কথা বুঝবেন। আমরা আশা করছি, আপনি আমাদের বক্তব্য বুঝতে পারবেন। এশিয়ার বহু দেশ আপনার দেখা হয়ে গেছে, তাই আপনিই ব্যাপারটি বুঝবেন।'

জনসন শব্দ করে হাসে। 'ওয়াদা করছি, আমি বুঝতে চেষ্টা করব। কিন্তু সফল হব কিনা বলতে পারছি না।'

২

অন্ধকার নিশীথে ফেরার পথে তারা দুজনই নীরব হয়ে থাকে। কথা বলার কোনো ইচ্ছা জনসনের জাগে না; মেয়েটিও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিস্তব্ধতার জাল ছিন্ন করে না। কেবল তারা যখন শহরে প্রবেশ করে এবং একটি বিশাল নিয়নের বিজ্ঞাপনের আলো অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের গায়ের ওপর এসে পড়ে, জনসন মেয়েটির দিকে তাকায়। 'আমি হয়তো লিখব যে, তোমাদের দলের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে; তবে কথা দিচ্ছি, তাদের আস্তানার খবর ফাঁস করব না। এ কথাও কাউকে বলতে যাব না, তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে গেছ।'

মেয়েটি আবার শীর্ণ হয়ে গেছে মনে হয়। তার দিকে না তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে মেয়েটি বলে, 'বললেও ক্ষতি নেই, ওরা ততক্ষণ ওই বাসায় থাকবে না। আর আমার ক্ষেত্রে যদি নাম বলে দেন, আমি পরোয়া করি না। আজ হোক, কাল হোক, আমার কথা তারা জেনে ফেলবেই।'

অন্ধকারে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জনসন বলতে চায়, সে জানে মেয়েটি রাগ করেছে, কিন্তু বলে না। এ কথা কেন সে বলতে যাবে?

'আমি কথা দিচ্ছি, যা বললাম তার চেয়ে বেশি কিছু আমি করব না, তোমার বন্ধুদের এ কথা জানিয়ে দিতে পারো। আবদুল কাদেরের দমনপীড়নের কথা আমি লিখব। আমার স্থির বিশ্বাস তাঁর বিপুল সমর্থক, দেশ তাঁর পেছনে থাকবে। তবে আমি নিশ্চিত হয়েছি, তিনি বাড়াবাড়ি করছেন, যা তাঁর না করলেও চলে। কারণ তাঁর পেছনেই আছে বিপুল জনসমর্থন। তিনি যদি এরকম বাড়াবাড়ি অব্যাহত রাখেন, পরিস্থিতি খামোখা খারাপ হয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত করতে না পারলে তাঁকে সরে গিয়ে একজন উদারপন্থী ও অধিকতর দূরদর্শী কাউকে জায়গা করে দিতে হবে।' সে আবার মেয়েটির দিকে তাকায়। মেয়েটি উত্তর না দেওয়ায় সে বলে, 'তুমি যা করতে বলেছ, তাই করার অঙ্গীকার করছি, এতে তো অন্তত খুশি হওয়া উচিত।'

তিন্নির মুখে ক্ষীণ সচলতা দেখা দেয়। একটি দোকানের দিকে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে থেকে সে বলে, 'আমাদের খুব একটা গুরুত্ব আপনি দিচ্ছেন না, তাই না?'

জনসন কোনো কথা না বলে তার দিকে তাকায়। তার মুখে ক্ষীণ বিদ্রূপ উঁকি দেয়, 'আমি তোমাদের গুরুত্ব দিচ্ছি। আমি আশা করি, জীবনে তুমি সুখী হবে। তুমি একটি ভালো মেয়ে।'

তিন্নি আরেকটি ছুটন্ত দোকান গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। সে উত্তর দেয় না।

জনসনের সার্কিট হাউসের সামনে পৌঁছলে মেয়েটি সহসা তার দিকে ফিরে বলে, 'আপনাকে ধন্যবাদ, সদয় আচরণের জন্য।'

'আমি তো তত খারাপ মানুষ নই', মৃদু হেসে সে বলে। সে হাসি তার নিজের কাছেই মনোমুগ্ধকর মনে হয়।

'আমরাও খারাপ মানুষ নই।' মেয়েটিও মৃদু হেসে উত্তর দেয়; তবে তার হাসি অত্যন্ত ক্ষীণ, সহসাই মিলিয়ে যায়।

'বিদায়', পুরনো গাড়ির আধো-অন্ধকারের ভেতর থেকে মেয়েটি বলে। তারপর গাড়ি চলতে শুরু করে।

পঞ্চম অধ্যায়

১

'সমস্যা হলো, ওরা আমাদের কথায় গুরুত্ব দেবে না।' টেবিলের ওপর রাখা তার অত্যাধুনিক সেটটি মেরামত করতে করতে নঈম ঘোষণা করে। নাড়িভুঁড়ি বের করা হাইফাই সেটটিকে বীভৎস দেখায়। তবে অপারেশন টেবিলে পেট চিরে ফেলা রোগীর প্রতি শল্যচিকিৎসকের মতো অনাসক্ত চাহনি তার চোখে। 'তুমি নিজে আমেরিকান হলে ওদের মনোভাবটা বুঝতে।'

'মানে?' তার বন্ধু নোমান জিজ্ঞাসা করে। যুক্তরাষ্ট্রে তার অবস্থান নঈমের চেয়ে অনেক সংক্ষিপ্ত ছিল বলে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে সে অনুভব করে, সে দেশ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার ক্ষেত্রে নঈম কেমন এক অধিকার বোধ করে। মনে মনে সে বিরক্ত হয়।

'ইয়া', একটি চিকন লাল তারের সঙ্গে একটি নীল তার যুক্ত করতে করতে নঈম বলে।

নঈম প্রায় ত্রিশের কোঠার এক সুদর্শন যুবক। যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ বছর প্রকৌশলবিদ্যা অধ্যয়ন করে আসার পর এখন একটি প্রকৌশল ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের মালিক। সর্ববিচারে আজকাল তার দিন ভালো যাচ্ছে। এখনো অকৃতদার, আধুনিক ধাঁচে বানানো একটি বিশাল ফ্ল্যাটে থাকে, শনিবারের রাতগুলিতে ড্যান্স পার্টি দেয়, আলোর পোকার মতো এসব পার্টি টিন-এজারদের আকৃষ্ট করে। টিন-এজারদের সে পছন্দ করে, কারণ মনের দিক থেকে সে এখনো নিজেকে তরুণ বোধ করে। তাছাড়া পরামর্শ ও বিনোদনের জন্য তারা তার প্রতি যেভাবে উন্মুখ হয়ে থাকে, সেটি সে উপভোগ করে। এসব পার্টিতে সে মদ পান করে বটে, তবে সেখানে একজন প্রহরী বসিয়ে রাখে যাতে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ভিড়তে না পারে। 'ছেলেদের ক্ষেত্রে পঁচিশ বছর বয়সের আগে কোনো মদ নয়, মেয়েদের বেলায় হাজবেন্ডের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত।' নিজের তৈরি করা এ নিয়ম সে কড়াকড়িভাবে বহাল রাখে।

'ইয়া', নির্দেশনামা মোতাবেক লাল আর সবুজ তার বসিয়ে যেতে যেতে সে আবার বলে, 'ধরো তুমি কোনো আমেরিকান। এখানে এসেছো। কী দেখতে পাবে?

আমাদেরকে দেখতে পাবে না, এ কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি। আমরা এত আণুবীক্ষণিক যে, আমাদের চোখেই দেখতে পায় না ওরা। ওরা কেবল অর্ধনগ্ন দরিদ্র, অশিক্ষিত আর ভয়ানক পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী দেখতে পায়।'

'আর যখন আমাদের দেখতে পায়?'

'তখন আমরা স্বচ্ছ। আমাদের ভেতর দিয়েও ওরা পেছনের হতদরিদ্র, পশ্চাৎপদ মানুষজনকেই দেখে, এ জন্য আমি ওদের দোষও দিই না।'

নোমান ভাঙা ফোনোগ্রাফটি মেরামতে ব্যস্ত নঈমের বাঁ আঙুলের দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর মাথা নাড়ে।

'আমার মনে হয়, ওদের চোখের ওপর এক প্রকার ঠুলি পরানো থাকে। বস্টনে এক চিত্রশালার ঘটনা তোমাকে বলেছি না? প্রতিবার কোনো বিখ্যাত শিল্পীর ছবি চোখে পড়ামাত্র আমি বলে উঠি, আরে এটি অমুকের আঁকা, তমুকের আঁকা ছবিটি না! কতবার যে এমন অযাচিত মন্তব্য করেছি, প্রতিবার ছবির নিচে লেখা নাম ছুটে গিয়ে পড়ে দেখছিলাম, অনুমান মেলে কিনা। আমার আচরণে যে কোনো গর্দভও বুঝতে পারবে, পশ্চিমা শিল্পকলার সঙ্গে আমার ভালো পরিচয়। কিন্তু ওই চিত্রশালায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন যে তরুণ আমেরিকান অধ্যাপক, ঘোরা শেষ করার পর তিনি বললেন, ওই সবগুলি পেইন্টিং আপনার কাছে অদ্ভুত লেগেছে, ঠিক না?'

'এতে কী বোঝা গেল?'

'ওদের মধ্যে কিছু বেঁধে দেওয়া ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, যা ওরা বাদ দিতে পারে না। সেসব ধারণার কারণেই আমাদের ওরা বুঝতে ব্যর্থ হয়।'

নঈম কাজ থামিয়ে বন্ধুর দিকে তাকায়। 'এখানে বোঝার কী আছে? যে, এ দেশে তুমি একটি ব্যতিক্রম? যে, তুমি বতিচেল্লি-রেনোয়ার নাম জানো? ওই অধ্যাপক যদি টের পেত, ও যা যা পড়েছে তুমিও তাই পড়েছো, একই ইতিহাসজ্ঞান তোমারও আছে, একই দর্শন, একই শিল্পকলা তুমিও রপ্ত করেছো, সে কি আর তোমাকে চিত্রশালা দেখাতে নিয়ে যায়? সে ভেবেছিল ভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোনো বিদেশীর দেখা পাবে, ন্যায্য গর্ব নিয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতির কিছু অংশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। কিন্তু তার এ সামান্য আনন্দটুকু কেন মাটি করে দিলে, বাবা? তোমাকে বলেছি, কী করেছি? মনে হচ্ছে এ গল্পটি বলা হয়নি।'

'বলো, শুনি', তার বন্ধু অনাসক্ত কণ্ঠে বলে।

'একটি বারবিকিউ পার্টিতে দাওয়াত পাই, সেখানে এক বয়স্ক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়, তার স্ত্রী চলচ্ছক্তিহীন। অনেকক্ষণ গল্পগুজবের পর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, একদিন তাদের বাসায় গিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে রাজি আছি কিনা, তার স্ত্রী কখনো কোনো এশীয় দেখেনি। আমি যাই। ওহ্! আমি, আমাদের জীবনযাত্রা, সম্পর্কে সবকিছু জানার সে কী কৌতূহল, যদি দেখতে। তাকে হতাশ করতে চাইলাম না, তাই সত্যিকার জংলিদের মতো আচরণ করি। তার সে কী রোমাঞ্চ!'

'আমার কথা তুমি ধরতে পারোনি।'

'ভালোই ধরতে পেরেছি। তোমাকে বলছি তো। একটি ব্যতিক্রম দিয়ে নিয়ম অস্বীকার করা যায় না।'

'না, তুমি আমার কথাটি বুঝতেই পারোনি', নোমান একগুঁয়ের মতো পুনরাবৃত্তি করে।

'তোমার কথাটি আসলে কী? তুমি চাও তোমার আমেরিকান বস তোমাকে গুরুত্ব দিক, কিন্তু সে তা দিচ্ছে না, এই তো? তুমি ভাবো, তার চেয়ে তুমি বেশি বুদ্ধিমান, তার চেয়ে তোমার পড়াশোনা বেশি?'

'সেটি আমার বক্তব্যের একটি অংশ। হ্যাঁ, আমি তার চেয়ে বেশি জানি। হয়তো আমি বেশি বুদ্ধিমানও।'

'তুমি কি বুঝতে পারছো না, আর কিছু না হোক, অন্তত তার এ দেশে আসাটাকে যাথার্থ্য দেওয়ার জন্য হলেও সে নিজেকে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ভাবতে বাধ্য? সে যদি এ কথা মেনেই নেয় যে, যাকে গাইড করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে, তার চেয়েও সে কম জানে, তাহলে তো তার গর্ব করার কিছুই থাকে না। তোমাকে বলে রাখছি : নিজের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার খাতিরেই স্রেফ তাকে হামবড়া ভাব দেখাতে হয়।'

'না, তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। সে এটি মানতেই পারছে না, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব। তার চোখে ঠুলি পরানোর জন্য যে এটি হচ্ছে, তা নয়। ওই ঠুলিপরা চোখে সে কী দেখতে পাচ্ছে, না পাচ্ছে, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু তাকে এ কথা মানতেই হবে যে, যে কোনো দুজন মানুষকে একই শিক্ষা দেওয়া হলে তারা সমকক্ষ হবে।'

'খামোখা নাটক করছো কেন। হয়তো এই যাকে তারা পাঠিয়েছে, সেই বান্দার ঘটে তত বুদ্ধিই নেই। তাছাড়া যারা সত্যিকার বুদ্ধিমান, তারা তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে মোটেই বের হবে না। ওখানেই তাদের দারুণ চাহিদা।'

'না, আমাদের গুরুত্ব দিতে তারা বাধ্য', নোমান একগুঁয়ে ভঙ্গিতে বলে।

নঈম আবার কাজ ফেলে বন্ধুর দিকে তাকায়। 'তোমার কি ধারণা তাদের আমরা গুরুত্ব দিই? যেমন ধরো, আগে থেকেই যা আমার শেখা ছিল তা-ই শিখতে পাঁচ বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে না গেলে আমার কি চলত না? আমরা কি তাদের ডিগ্রিফিগ্রি ডক্টরেট নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করি না? তাছাড়া অন্যকে খাটো করে দেখা মানুষ মাত্রেরই একটি স্বভাব। ইউরোপীয়দের কথাই ধরো। ইউরোপের প্রতিটি জাতি একে অন্যের খুঁত ধরে বেড়ায়। চোখ-কান খোলা রেখে গোটা ইউরোপ ঘুরে বেড়াতে শুরু করলে খুব হাসি পাবে তোমার। ওখানে এ নিয়ে আমিও খুব মজা পেয়েছি। জার্মানদের গিয়ে শুধু শোনাবে ফ্রান্সে তোমার কী ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছে, ফ্রান্সে গিয়ে ইংল্যান্ডের দুর্নাম করবে, তারপর দেখবে মজা।' নঈম কথা থামিয়ে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে। তারপর বলে, 'তোমাকে শুধু ফাইলদের ব্যাপারে একটু সাবধান থাকতে হবে—অ্যাংলোফাইল, ফ্রেঙ্কোফাইল ইত্যাদি। এসব লোকের বেলায় তোমাকে কৌশলটি স্রেফ উল্টে ফেলতে হবে। তুমি একজন ইংরেজ ফ্রেঙ্কোফাইলের কাছে গিয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কিছু বলেছো তো মরেছো, ওর নিজের দেশকেই যেন অপমান করে ফেলেছো, যেন বলেছো, ইংরেজদের রান্নাবান্না, পোশাক, স্বভাব-চরিত্র, আবহাওয়া সবই কী জঘন্য রে, বাবা!'

নোমান আগ্রহ বোধ করে না। 'গোটা বিশ্বের সব জাতি একে অপরের পেছনে লাগুক না কেন, তাতে কী। এখানে প্রশ্নটি তো আত্ম-অহমিকার। আমার যোগ্যতা আর বুদ্ধিমত্তার অহঙ্কার করছি আমি।'

'সেও ভালো', ফোনোগ্রাফে আবার মনোযোগ ফিরিয়ে নঈম বলে, 'সেক্ষেত্রে দুটি জাতি নয়, এ লড়াই দুজন ব্যক্তির মধ্যে। আমার আপত্তি নেই। লড়ে যাও ভায়া, আমার

শুভেচ্ছা সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকবে। পারলে তাকে বোকা-গাধা মনে করো, কিন্তু আমেরিকান মনে কোরো না।'

'এখানেই তো আমার হাত-পা বাঁধা। সে তার দেশের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করতে পারছে, যা আমি পারছি না। বুঝতে পারছো তো, লড়াইটি কেন একটি অন্যায্য বৈষম্যমূলক লড়াই? তার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ে আমাকে নামতে দেওয়া হচ্ছে না।'

'দেখো ছোকরা', নঈম উৎফুল্ল ভঙ্গিতে বলে, 'এই বাস্তব সত্য তোমাকে মেনে নিতেই হবে, কারণ রাতারাতি এ সত্য তুমি পাল্টে ফেলতে পারছো না। তোমাকে তাহলে অপেক্ষা করতে হবে।'

'কতদিন?' তার বন্ধু জিজ্ঞাসা করে। সৌভাগ্যবশত এটি তার কোনো প্রশ্ন নয়, একটি অভিব্যক্তি মাত্র। নঈম কোনো কথা না বলে তার যন্ত্রটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজ রাতে তার বাসায় ড্যান্স পার্টি, সন্ধ্যের আগেই তাই সে সেটি ঠিক করে ফেলতে চায়। খানিক পর তার বন্ধু আবার মাথা নাড়ে। 'তোমার আর আমার মধ্যে বিস্তর ফারাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তোমার বন্ধুদের মধ্যে যে তোমার এত নাম-ডাক, এর কারণ তুমি সবাইকে ধোঁকা দিয়ে বেড়াও, তোমার জ্ঞানের বহর কাউকে টের পেতে দাও না।'

'অথচ তুমি তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো না, এখানে-সেখানে তোমাকে জাহির করতে হয়, তুমি কত জানো। ওখানে তুমি যতদিন ছিলে, তার প্রতিটি মুহূর্ত তুমি প্রচার করে বেড়িয়েছো, কী বিরাট এক দেশ থেকে এসেছো, তুমি শুধু সেই দেশের একজন প্রতিভূ। কী হাস্যকর প্রচেষ্টা। কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা হলে, চুমু খাওয়ার চেষ্টা না করে তাকে শোনাতে হয়েছে, দেশে তোমার মা-বোনরা কত ভালো, খানদানি। স্রেফ আত্মগরিমা। না, শুধু তাই নয়, এক অসুস্থ হীনম্মন্যতাবোধ।' নঈম সহসা মাথা তুলে হো-হো করে দমফাটানো হাসি হাসতে থাকে।

'মেয়েটি হতভাগী', হাসি নিয়ন্ত্রণে এলে নঈম বলে, 'এ কারণেই, বুঝেছো, যে মেয়েটি তোমার মোজা বুনে দিচ্ছিল, তোমার শার্ট ধুয়ে দিচ্ছিল, সে শেষ পর্যন্ত তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে, কারণ প্রতি মুহূর্তে এ কথা শোনা তার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না যে, তোমার মা-বোনদের সমকক্ষ সে হতে পারবে না।'

'সেটি স্রেফ বন্ধুত্ব ছিল, বেশি কিছু নয়', নোমান উত্তর দেয়। তারপর যেন ঈষৎ ঈর্ষাকাতর ভঙ্গিতে সে বলে, 'তাছাড়া ছেলেবন্ধুর জন্য মোজা বানানো, তাদের কাপড়-চোপড় ধোওয়া মেয়েটির একটি বাতিক ছিল, এতে বেশ কিছু ছেলের পকেটের পয়সা বাঁচত।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর নোমান বলে, 'মনে হচ্ছে, আমার কথাটি তুমি কখনো বুঝতে পারবে না। আমার কথা হলো, বস্তুগত পরিবেশের কারণে মানুষে মানুষে তফাৎ হবে এ আমি মানতে রাজি আছি, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে সেটি মানতে রাজি নই। জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন কৃষকের সঙ্গে আমাদের কোনো কৃষকের কোনো তফাৎ আমি দেখি না।'

'তোমার এই বাতিকের কারণে তুমি একটি একঘেয়ে মানুষে পরিণত হয়ে যাচ্ছো', বলেই নঈম লাফিয়ে উঠে হাত-পা ছোঁড়ে, কারণ ফোনোগ্রাফের কাজ অবশেষে হয়েছে। 'এবার ক্ষান্ত দাও। তাছাড়া, দুই কৃষকের মধ্যে যদি পার্থক্য না-ই থেকে থাকবে, তাহলে দুই দেশের দুই কৃষককে এক জায়গায় করে তারপর আমাদের কৃষকের ভাবসাব লক্ষ

করো। তার আচার-ব্যবহার দিয়ে আমাদের কৃষকটিই প্রমাণ করে দেবে কে কাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে।'

তার বন্ধু মাথা নেড়ে বলে, 'তার এ আচরণের পেছনের কারণটিও তোমাকে মনে রাখতে হবে। এর কারণ অংশত ঐতিহাসিক—শ্বেতাঙ্গদের শাসন, অংশত পোশাক-আশাক, উপকরণ এবং মার্কিন কৃষকের ভয়ালদর্শন ট্রাক্টর। প্রথম দর্শনের ভীতি কেটে যাওয়ার সময়টুকু দাও, তারা একে অপরকে চিনুক-জানুক, আমাদের কৃষক নিজেকে হীন মনে করার কারণ খুঁজে পাবে না।'

'যাও, কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দাও', নঈম বলে। 'ওদের সদস্যপদ নেওয়ার সময় তোমার হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

এ মন্তব্য তার বন্ধু পছন্দ করে না বলে মনে হয় না, কারণ এর ফলে তার বক্তব্য বোঝার ক্ষেত্রে তার বন্ধুর অপারগতা যেন আরো প্রকটভাবে প্রকাশ পায়। ভীষণ অসন্তুষ্ট কিন্তু প্রত্যয়ী ভঙ্গিতে সে যুক্তি দেখিয়ে চলে, 'কী করে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হয়, এ কথা গরিব লোকজনকে শেখাতে ওরা যদি পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে পিস কোর ভলান্টিয়ারদের পাঠায়, সেক্ষেত্রে আমাদের এশীয়দেরও উচিত হবে কী করে চিন্তার মান উন্নত করতে হয়, তা শেখাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বেচ্ছাসেবক পাঠানো। শান্তির জন্য সেটি বরং অনেক বেশি জরুরি। আমাদের দরিদ্র জনগণ বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট করতে পারার কথা নয়, কিন্তু মার্কিনিরা চাইলে বিশ্বের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে।'

'ওহ্, আল্লার দোহাই, থামো এবার', নঈম চিৎকার দেয়, 'শুধু এই সামান্য সত্যটুকু স্বীকার করে নাও যে, শক্তিহীন ও পশ্চাৎপদ দেশগুলির তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করা থেকে শক্তিশালী ও অগ্রসর দেশগুলিকে রুখতে পারে এমন কোনো উপায় কেউ বানাতে পারেনি।'

উত্তরের অপেক্ষা না করে সে বিশাল ফোনোগ্রাফটি হাতে নিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে।

২

'আজ আমার বয়স বিশ পূর্ণ হয়েছে। আমার পাওনা থেকে পাঁচ বছরের হিসাব বাদ দিয়ে বাকি মদটুকু দিন', একটি দুর্বিনীত ছেলে উদ্ধত ভঙ্গিতে ডান হাত দুলিয়ে আদেশ করে।

'শাট আপ।' নঈম বলে।

'আর আমাকে কী বলবেন?' জিজ্ঞাসা করে একটি অস্বাভাবিক লম্বা মিষ্টি চেহারার মেয়ে। 'আমার হবু স্বামী বলেছে, আপনার এই পানীয় এক ফোঁটা পান করতে দিতে তার আপত্তি নেই।'

'শাট আপ', নঈম পুনরাবৃত্তি করে। মেয়েটি কর্ণবিদারী হাসিতে ফেটে পড়লে সে ক্রোধে চোখ বন্ধ করে। কেলেঙ্কারি বাড়াতে এ ঠাট্টা শুনতে আরো বেশ কয়েকটি তরুণ এসে ভিড় জমায়, কৌতুকের পুনরাবৃত্তি ঘটলে চারদিকে হাস্যরোলের এমন নিনাদ ওঠে, নঈমকে তার কান চেপে ধরতে হয়।

শীঘ্রই লাউডস্পিকারে একটি নতুন রগরগে ড্যান্স মিউজিক বাজতে শুরু করায় অধিকাংশ তরুণ তাকে ছেড়ে সেদিকে যায়।

'আপনি আসবেন না?' খাটো, নজরকাড়া পোশাকের একটি মেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে, ততক্ষণে নাচতে যাওয়ার জন্য এক যুবক তার বাহু ধরে টেনেছে, যুবকটিকে দেখে মনে হয়, এখানে যেন সে মদ খাওয়ার অধিকার রাখে।

'না, এবার নয়', নঈম টিন-এজারদের জন্য সংরক্ষিত গাম্ভীর্য প্রয়োগ করে বলে।

'আমার মাথায় ঢোকে না, এত ঝক্কি তুমি কীভাবে পোহাও', নোমান মন্তব্য করে, সে এখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে ঠাণ্ডা ও ঝরঝরে দেখায়, খানিকক্ষণ আগে গোসল করার কারণে তার ভেজা চুল চিকচিক করে। তবে আজও তার উচ্ছ্বাসহীন চেহারা।

একটি ডিভানে গা এলিয়ে মেঝের কার্পেটের ওপর বসা নঈম তার পাশে একটি জায়গা নির্দেশ করে বলে, 'এসো, এখানে বসে পড়ো। জানি না সব সময় এসব উপভোগ করি কিনা, তবে তুমি তো জানোই, টিন-এজারদের আমি কেন দাওয়াত দিই। আমি চাই তারা স্বাধীনতা ও জীবনের স্বাদ নিক।'

নোমান উত্তর দেয় না।

'এখনো ধ্যান করছো নাকি?'

'না', তার বন্ধু উত্তর দেয়, তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলে, 'শহরে কিছু একটা হচ্ছে। পুলিশ বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালাচ্ছে। প্রচুর পুলিশ নেবেছে।'

শুনে সে গম্ভীর হয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নঈম পছন্দ করে না, কারণ রাজনীতি প্রকাশ্যে করা হয় না। তবে সে কোনো মন্তব্য করে না।

তার বন্ধু আবার বলে, 'দেশে কিছু একটা হচ্ছে। জানি না কী হচ্ছে।' তার চাপা কণ্ঠস্বরে কেমন অশুভ একটা কিছুর ছাপ।

নঈমের ভেতরটা সহসা ভয়ে কেঁপে ওঠে মনে হয়।

'কমিউনিস্ট ধরছে ওরা', সে সবজান্তার ভঙ্গিতে বলে, তারপর অকস্মাৎ উৎফুল্ল ভঙ্গিতে শিস দিতে থাকে। চিন্তামগ্ন বন্ধুর পাশে বসে আনন্দে শিস দেওয়া কঠিন।

'একজনের কাছ থেকে ফোন পেলাম', নোমান বলে, 'সে কমিউনিস্ট নয়। তবু পুলিশ তাকে খুঁজছে।'

নঈম উত্তর দেয় না। সে দেখে একটি উজ্জ্বল তরুণ জুটি হেলেদুলে তার দিকে আসছে। সহসা উদ্ভাসিত মুখে তাদের উদ্দেশে সে হাত নাড়ে।

'আমি তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম', স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে বলে।

তার বন্ধু ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১

পরদিন চৌঠা জুলাই। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের সামনের রাস্তায় গাড়ি চালাবার নিয়ম সাময়িকভাবে পরিবর্তন করা হয়। সড়কের বাম পাশ দিয়ে চলার বদলে এখানে ডান পাশে চলতে হবে। পুলিশপ্রধানের আদেশে এ নিয়ম বলবৎ হয়। এর ফলে একদিকে যান চলাচলে ব্যাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, কারণ অতিথিদের মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বয়ে আনতে গিয়ে শোফারদের বহির্গমনের পথ দিয়ে ভবনে প্রবেশ করতে হয়; অন্যদিকে ঢোকার মুখের ঠিক সামনে রাস্তার ওপর আপত্তিকর লেখাগুলি অতিথির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

সবার আগে এসে যাঁরা উপস্থিত হন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পুলিশপ্রধান ও তাঁর স্ত্রী। ফটকের সামনে তাঁদের গাড়ি অপর একটি গাড়ির কারণে আটকে যায়। সামনের গাড়িটি বেরিয়ে গেলে পুলিশপ্রধানের চোখে পড়ে রাস্তার ওপর বড় বড় হরফে কিছু লেখা। বিষয়টি তাঁর কাছে অদ্ভুত মনে হওয়ায় তিনি ড্রাইভারকে গাড়ি থামিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। অক্ষরগুলি পাঠ করে প্রথমে তিনি বেকুব বনে যান, তারপর তাঁর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। রাস্তায় লেখা : 'অ্যামেরিকা : ডোন্ট সাপোর্ট হ্যাংম্যান'।

একটি বিষয় পুলিশপ্রধান তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার বুঝতে পারেন অতিথিরা যাতে এ লেখা পড়তে না পারে সে জন্য দ্রুত কিছু একটা করা দরকার। গাড়ির ভিড়ে অবশ্য বাম্পারে বাম্পারে লাগানো অবস্থা দাঁড়াবে, কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম, তবু ঝুঁকি নেওয়া যাবে না।

'সামনে এগিয়ে লেখাগুলির ওপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দাও', করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে তিনি ড্রাইভারকে বলেন। 'তারপর এমন ভান করবে যেন গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না; তখন ট্রাফিক পুলিশকে গিয়ে বলবে, পেছনে অন্য ফটক দিয়ে ঢোকার জন্য বাকি গাড়িগুলিকে পাঠিয়ে দেয় যেন।'

তিনি তাঁর গাড়ি লেখাগুলির ওপরই রেখে দিতে পারতেন, কিন্তু গোটা শহর চেয়ে চেয়ে দেখবে পুলিশপ্রধানের গাড়ি অসহায়ভাবে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তা হতে দিতে তিনি পারেন না। তাঁছাড়া গণ্যমান্য সব ব্যক্তি সংবর্ধনায় আসছে।

বাসভবনগামী গাড়িগুলিকে ভিন্নপথে পাঠিয়ে দেওয়ার পর তিনি দ্বিতীয় নির্দেশ জারি করেন, 'কার্পেট কিংবা এ জাতীয় কিছু একটা জোগাড় করে আনো।' তিনি হিসাব কষে দেখেন রাস্তার ওপর থেকে লেখাগুলি ঘষে তুলে ফেলতে যে সময় লাগবে, তার চেয়ে কম সময়ে তা কার্পেট দিয়ে ঢেকে ফেলা সম্ভব।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আপত্তিকর লেখাগুলি ঢাকা পড়ে যায়। নিজের দক্ষতায় গভীরভাবে সন্তুষ্টি বোধ করেন পুলিশপ্রধান। তাঁর মনে হয়, এ থেকে তাঁর দ্রুত চিন্তা করে পদক্ষেপ নেওয়ার সামর্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আদেশ করেন, 'গাড়ি আগে বাড়াও।'

গাড়িগুলিকে শীঘ্রই আবার স্বাভাবিক নিয়মে দূতাবাস ভবনে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়।

পরমুহূর্তে পুলিশপ্রধান সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য মোতায়েন ট্রাফিক পুলিশের প্রধানকে জেরা করতে থাকেন। 'আপনারা কী করছেন, অ্যাঁ?' বজ্রকণ্ঠে ধমক মারতে গিয়ে তিনি ভুলে যান যে নিকটস্থ দুটি বৃহৎ অভ্যর্থনা কক্ষে ইতিমধ্যে বিপুল পরিমাণে অতিথির ভিড় জমে গেছে এবং তাঁর গলা দরজা পথে তা অতিথিদের কান পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। 'আমি তো দেখতে পাচ্ছি, আপনার নাকের সামনে এসব হয়েছে।'

ট্রাফিক পুলিশের প্রথম জবাব হতে পারত : তার কাজ রাস্তার ওপর দিয়ে চলা গাড়ি-ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ করা, রাস্তার কী হলো না হলো তা দেখা নয়। কিন্তু সে এ কথা বলতে গিয়েও সংবরণ করে। সহসা তার দায়িত্বের সঠিক পরিধি সম্পর্কেও সে যেন দ্বিধায় পড়ে যায়। তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে অন্তত এটুকু শিখেছে যে, দায়িত্বের এখতিয়ার সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করার চেয়ে দায়িত্ব অবহেলার কথা স্বীকার করাই নিরাপদ।

'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, স্যার', করুণ কণ্ঠে সে বলে। আমি ভেবেছিলাম ওরা মিউনিসিপ্যালিটির লোক, আমেরিকানদের উৎসবের দিন হওয়ায় ভাবলাম, ওরা বোধ হয় রাস্তা রং-টং করতে এসেছে।

'ওরা কখন এসেছিল?'

'সোয়া ছটার দিকে', উত্তর দিয়ে পুলিশ কর্মকর্তা দুর্বলভাবে জিহ্বা ভিজিয়ে নেয়। সঠিক সময় সে বলতে পারে না, সে সময় সে ঘড়ির দিকে তাকায়নি, শুধু এটুকু মনে করতে পারে, লোকগুলি চলে যাওয়ার পরপরই অতিথিবাহী প্রথম গাড়িটি এসেছিল।

'ওরা দুটি বাইসাইকেলে চেপে এসেছিল', সে বলতে থাকে, 'তিনজন ছিল। পরনে ছিল রাস্তা সারাইয়ের লোকদের মতো গেরুয়া ইউনিফর্ম। দুজন লাল পতাকা হাতে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থেকে গাড়ি-ঘোড়াকে সতর্ক করে দিচ্ছিল, আর তৃতীয়জন রাস্তার মাঝখানে কিছু একটা করছিল।'

'সে কী করছে দেখতে পাওনি?'

'আমি তাকে দেখতে পাইনি স্যার। লাল পতাকা হাতে দাঁড়ানো একজনের শরীরের আড়ালে সে ঢাকা পড়ে ছিল। তারা খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারে।'

সে অনুমান করেছিল পুলিশপ্রধান জানতে চাইবে তার অপর তিন সহকর্মী তখন কী করছিল, তাদের অবস্থান তখন কোথায় ছিল। তারা তখন বাসভবনের সামনে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছিল।

'চমৎকার', পুলিশপ্রধান বিদ্রূপের স্বরে বলেন, 'যে একজন মাত্র অফিসার ব্যাপারটি দেখতে পেয়েছে, দেখেও তার মনে কোনো সন্দেহ উঁকি দেয়নি, এমনকি লেখাগুলি ফুটে ওঠার পরও ব্যাপারটি তার মাথায় ঢোকেনি।'

ট্রাফিক পুলিশটি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে লেখাগুলি উল্টোভাবে দেখা যায়, তাছাড়া সেগুলি পড়ার দরকার সে মনে করেনি। সে মনে করেছে, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সঙ্গে লেখাগুলি সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকবে। সে ভেবেছিল, এগুলি হয়তো কোনো স্বাগত বাণী।

'আমাকে ওরা বোকা বানিয়েছে', প্রায় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে ট্রাফিক পুলিশ বলে।

পুলিশপ্রধান ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তার দায়িত্বে অবহেলা নিয়ে চোটপাট করার সময় তার দুঃখ কেটে যেতে থাকে।

২

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান লোকে লোকারণ্য। এমনকি পুলিশপ্রধানও বাইরে ফটকের সামনের লেখাগুলির কথা ভুলে গেছেন। এ ব্যাপারে যা করা সম্ভব তিনি করেছেন : লেখাগুলি ঢেকে ফেলার বন্দোবস্ত করেছেন এবং এর মূল হোতাদের পাকড়াও করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এখন ফুরফুরে মেজাজে আছেন। কেবল যখন বাইরে কোথাও বন্দুক ফোটার আওয়াজ হয়, তিনি লাফিয়ে ওঠেন এবং সেটির উৎসের দিকে ফেরেন। কিন্তু এসব আতশবাজির শব্দ। শব্দে আকৃষ্ট হয়ে আতশবাজি দেখতে অতিথিরা বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকে।

অপূর্ব দৃশ্য, চাঁদহীন অন্ধকার আকাশে একের পর এক আতশবাজি বিস্ফোরিত হয়ে উজ্জ্বল বহুবর্ণিল নকশা তৈরি হচ্ছে। অল্প কয়েকজন ছাড়া অতিথিদের সবাই এখন লনে বেরিয়ে এসেছে। মাথা উঁচু করে সবাই এ জমকালো দৃশ্য দেখতে থাকে, তাদের মুখ থেকে নানারকম বিস্ময় ও আনন্দসূচক ধ্বনি নির্গত হয়।

তখন একটি কণ্ঠ বলে ওঠে, 'আরে ওটা কী?'

অতিথি দৃষ্টি ফেরালে একটি সাদা রঙের বল দেখতে পায়, শূন্য ফুঁড়ে সেটি তাদের মাথার ওপর এসে হাজির হয়েছে যেন। কেমন নাটকীয় ও অশুভ ভঙ্গিতে তা ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে গতি কমে এক সময় থেমে গিয়ে নেবে আসতে শুরু করে। নিচে নাবার সময় বলটি টুকরো টুকরো হয়ে যেতে থাকে, অথচ তখন পর্যন্ত তা থেকে কোনো কোনো আলো ও শব্দ বিচ্ছুরিত হয় না। মুহূর্তে অতিথিদের কারো কারো মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, কেউ কেউ আর্তচিৎকার দিয়ে ভেতরে আশ্রয়ের জন্য এগিয়ে যায়, কেউ টের পায় না এরপর কী ঘটবে। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া সাদা বলটির অংশগুলি বড় একটি এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে যায়, তবে এখন সেগুলিকে হালকা মনে হয়, কারণ পাতার মতো তা মাটিতে ঝরে পড়তে শুরু করেছে। শত শত আয়তাকার পাতা। অতিথিরা আশ্বস্তবোধ করলে জিনিসগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে তারা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আতশবাজির প্রতি এখন আর কারো মনোযোগ নেই।

'লিফলেট মনে হচ্ছে', সদ্যোজাত শিশুর মতো মেদস্তরে ঢাকা মুখের এক কেতাদুরস্ত মহিলা বলে। তার চোখজোড়া ধারালো।

লিফলেটই বটে : ছয় বাই আট ইঞ্চি কাগজের পাতলা টুকরো। প্রতিটিতে ছাপা অক্ষর।

হাতের নাগালে আসতেই অতিথিরা লাফিয়ে সেগুলি ধরতে থাকে, অধিকাংশ অতিথি একে উৎসবেরই অংশ বিবেচনা করে। তারপর কাগজের ফড়ফড় শব্দের সঙ্গে আতশবাজির শব্দ মিশে গেলে পুলিশপ্রধানসহ অতিথিরা লিফলেট পড়ে। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে না।

পুলিশপ্রধানের আশপাশে দাঁড়ানো অতিথিরাই সর্বপ্রথম সরকারি প্রতিক্রিয়া শুনতে পায়। পুলিশ কর্মকর্তার মুখ থেকে এ প্রতিক্রিয়া নিঃসৃত হয়।

'এত বড় সাহস!' তিনি বলেন, তার মুখ ক্রোধে প্রায় বিকৃত হয়ে যায়। তারপর দ্রুত চিন্তা করতে সক্ষম হওয়ায় তিনি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে তিনি ভাবেন, লিফলেট না পড়ার জন্য অতিথিদের প্রতি আহ্বান জানাবেন, কিন্তু এ চিন্তা তিনি বাতিল করেন, কারণ ইতিমধ্যে অনেকেই তা পড়ে ফেলেছে। কাজেই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রবেগে বাম দিকে উঁচু বেড়া অভিমুখে ছুটে যান, ওখান থেকেই সাদা বলটি উঠে এসেছিল। নিঃসন্দেহে কেউ বেড়ার ওধার থেকে দক্ষ হাতে গুলতি ছুঁড়ে বলটি ফাটিয়ে দিয়েছে। পুলিশপ্রধান উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটে যাওয়ার সময় পুলিশের তীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজে সারা বাগান কাঁপতে থাকে।

বাতাসে থাকতেই একটি লিফলেট ধরে ফেলেছিল জনসন। দ্রুত সে তা পাঠ করে। কিন্তু সেটির বক্তব্য পাঠ করে মোটেও বিস্মিত হয় না। কারণ এদের সবার মধ্যে একমাত্র তারই এসব কথা ব্যক্তিগতভাবে শোনার সুযোগ হয়েছে, সেটি অবশ্য ভিন্ন এক পরিবেশে, সে কথা সে এখনো কাউকে বলেনি।

লিফলেটে 'জনগণের বিশ্বাসভঙ্গকারী এবং গণরায় পদদলনকারী' বর্তমান সরকারকে 'সমর্থন প্রদান হতে বিরত থাকার জন্য' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আহ্বানকারী পক্ষ দাবি করেছে, তাদের 'ব্যাপক জনসমর্থন' আছে, সেই সঙ্গে তাদের অভিযোগ, সরকার 'পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে এবং প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদের হত্যা ও কারাগারে নিক্ষেপ করে' তাদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে। পক্ষটি সহিংসতার পক্ষের প্রতি তাদের ঘৃণা প্রকাশ করার পাশাপাশি এই মর্মে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে যে, সরকার সহিংস নীতি পরিহার না করলে 'দেশজুড়ে প্রতিবাদের দাবানল' অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকা এ পরিস্থিতি এড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেছে।

জনসন একটি লিফলেট দ্রুত পকেটস্থ করে অতিথিদের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য চতুর্দিকে তাকায়। অতিথিরা কী করবে বুঝতে না পেরে নিশ্চুপ হয়ে আছে। কয়েকজন মহিলা শুধু সশব্দে তাদের হতাশা ব্যক্ত করছে। জনসন লক্ষ করে অতিথিদের কেউ কেউ ভবনের দিকে হাঁটা দেয়, যেন বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।

পরে জনসন ক্ষুদ্র কক্ষগুলির একটিতে সোফায় উপবিষ্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সন্নিকটে নিজেকে আবিষ্কার করে। পুলিশপ্রধান তাঁর পাশে দাঁড়ানো। তিনি মন্ত্রীর কাছে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন। মন্ত্রী একবারও বাইরে বের হননি।

জনসন ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর উচ্চৈঃস্বরে ও কিছুটা জবরদস্তিমূলকভাবে মন্ত্রীর সামনে নিজের পরিচয় তুলে ধরে। এ বিড়ম্বনায় পুলিশপ্রধান স্পষ্টত বিরক্ত হন।

মন্ত্রী তার উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে পুলিশপ্রধানের দিকে ফেরেন। 'তারপর?'

পুলিশপ্রধান জনসনের দিকে অসন্তুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিম্নকণ্ঠে বলে যেতে থাকেন, 'আজকের সমস্ত অনুষ্ঠানসূচি জানে, নিঃসন্দেহে এ রকম কারো কাজ। যে বেড়ার পেছন থেকে লিফলেট ছোঁড়া হয়েছে, সেটির দিকে আমি ছুটে যাই—'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাত দিয়ে একটি ভঙ্গি করেন। অপরাধীদের পাকড়াও করতে পুলিশপ্রধান কী কী করেছেন, কিংবা তিনি বেড়ার ওপারে পৌঁছানোর আগেই গুলতি নিক্ষেপকারীরা পালিয়ে গেছে কি না এ জাতীয় ছোটখাটো বিবরণে মন্ত্রী কোনো আগ্রহ দেখান না।

'এরা সাহস পেয়ে যাচ্ছে', জনসনের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রী বলেন।

'স্বাধীনতা দলের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে', কেন বলছে না বুঝেই জনসন বলে ফেলে।

মন্ত্রীর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে বিলম্ব ঘটে। খবরটি এত অপ্রত্যাশিত, আর এমন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, প্রথমটায় তিনি ভাবতে থাকেন, খবরটি কীভাবে গ্রহণ করা উচিত হবে।

'ও, তাই নাকি?' তিনি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথায়?'

'আমি যেখানটায় উঠেছি, সেখানে ওরাই এসেছিল', চোখের পাতা না ফেলে জনসন বলে।

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। তারপর মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, 'কী বলতে এসেছিল?'

'লিফলেটে যা লেখা আছে, হুবহু তা-ই।' সে মৃদু হেসে বলে, 'ফটকের সামনে রাস্তার ওপরও সে কথা লেখা হয়েছে।'

পুলিশপ্রধান চট করে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি ওটার ব্যাপারে জানেন দেখছি?'

জনসন ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে বলে, 'কেন? অনেকেই তো জানে।'

আবার সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়, কারণ পুলিশপ্রধানের মুখ এখন রক্তিম হয়ে উঠছে। সৌভাগ্যক্রমে মন্ত্রী আবার কথা বলে ওঠেন, 'ওরা এক ভয়ঙ্কর খেলা খেলার চেষ্টা করছে। সব ক'টি বদমাশ। ব্যাপক জনসমর্থনের দাবিটাবি সব বাজে কথা।'

'আমার পক্ষে বোঝা কঠিন, তারা আসলে কতটা শক্তিশালী', জনসন বলে চলে, 'তবে আমার মনে হচ্ছে, তারা কঠিন লড়াইয়ের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো, তারা মনে করছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পারবে, তারাই ন্যায়ের পক্ষে লড়ছে। এটি বিস্ময়কর এ কারণে যে, তারা প্রকাশ্যেই স্বীকার করছে, কমবেশি কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিই তারা পোষণ করে। অর্থাৎ তারা যেন বলতে চায়, তাদের আদর্শ এত শক্তিশালী যে, কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সমর্থন দিতে বাধ্য হবে।'

মন্ত্রী কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকেন। তারপর চোখের তিন-চতুর্থাংশ উন্মীলিত করেন। 'ওরা নিজেদের খুব চালাক মনে করছে। নিজেদের রাজনীতির রং গোপন না করেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্য হলো, আপনাদের ধন্দের মধ্যে ফেলে দেওয়া। কমিউনিস্টরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে অনুনয় বিনয় করছে, এই দেখে যাতে আপনাদের হৃদয় গলে যায় আর কি।'

'আমার মনে হয়, এর মধ্যে আরেকটি ব্যাপার আছে', জনসন বলে, 'তারা বোঝাতে চায় আমাদের জন্যই আবদুল কাদের টিকে আছেন।'

পুলিশপ্রধান মৃদু হাসার চেষ্টা করেন। 'আমি আশা করি, যাদের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আরো তথ্য আমাদেরকে দেবেন।'

জনসন এখন অবশ্যম্ভাবী ঘটনাচক্রের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে বলে মনে হয়। সে বলে, 'এখন যেহেতু থলের বিড়াল বের করেই ফেলেছি, এ অনুরোধ ফেলতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।' তারপর পুলিশপ্রধানের মুখে বিরক্তির ছাপ দেখে সে বলে, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি একজন মার্কিন সাংবাদিক, আপনি আপনার দেশ থেকে আমাকে বের করে দিতে পারলেও আমাকে দিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলতে বাধ্য করতে পারেন না।'

ক্রোধ সংবরণ করে পুলিশপ্রধান বলেন, 'আশা করি, আপনি বুঝতে পারছেন বিষয়টি আমাদের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। কক্ষ ত্যাগের আগেই সরকারের গণযোগাযোগ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা তাঁর পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। সে চাপা কণ্ঠে বলে, 'পুরো শহর জেনে যাবে।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাঁটা থামান না। 'সংবাদপত্রে খবরটি যেতে দিন', তিনি বলেন। 'কমিউনিস্টরা লিফলেট ছিটিয়ে হুমকি দিয়েছে, দেশজুড়ে সহিংসতার দাবানল ছড়িয়ে দেবে।'

জনসন চলে যাওয়ার সময় শোনে শেষ কয়েকটি গাড়ির নম্বর পুলিশ লাউডস্পিকারে ঘোষণা করা হচ্ছে। সে প্রশস্ত বারান্দা পেরিয়ে ঘোরানো পুরু সিঁড়ি বেয়ে নাবতে থাকে। সে তাকিয়ে দেখতে পায় লনের ওপর এখনো লিফলেট ছড়িয়ে আছে, প্রায়শূন্য খাবার টেবিলের পাশে বসা গুটিকয়েক লোক গভীর আলাপে মগ্ন, লিফলেটের দিকে তাদের মনোযোগ নেই। লিফলেটগুলি ছুটির দিন সন্ধেবেলা সৈকতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আবর্জনা যেন।

ড্রাইভওয়ে ধরে জনসন দ্রুত হাঁটতে থাকে। নিজের নেওয়া ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তটি নিয়ে সে ভাবে।

হ্যাঁ, আমাকে আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতেই হবে। সরকারের কঠোরতার কথা আমি পাঠকদের লিখে জানাবো, তবে লিফলেট বিতরণকারীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিষয়টি উলেখ করব না।

সপ্তম অধ্যায়

১

পরদিন সকালে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জরুরি ফোন আসে। দুপুরের মধ্যে রাষ্ট্রদূত হথর্ন কি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?

তিনি সচিবের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করেন, তারপর হাতঘড়ি দেখেন। দশটা পঁয়ত্রিশ। তাঁর ভ্রূকুটি আরো গভীর হয়।

'হ্যাঁ, অবশ্যই যাব।' অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলেন রাষ্ট্রদূত, তড়িঘড়ি হাজিরা দেওয়া তাঁর পছন্দ নয়।

'আপনার লাঞ্চের কী হবে?'

দুপুরে কয়েকজন লোকের সঙ্গে আহারের পরিকল্পনা রাষ্ট্রদূত ভুলে যাননি।

'আমি ফিরব।' তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর, এখন তার বিরক্তি স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা তিনিও ভাবছিলেন, তবে তার আগে কয়েকটি বিষয় তাঁকে সাবধানে তলিয়ে দেখতে হবে। গত রাত থেকে তিনি নিজেকে বোঝাচ্ছেন, দেশের অবস্থা তাঁর কাছে সুবিধার মনে হচ্ছে না। ফটকের সামনের রাস্তায় লেখা (যা ওই রাতেই মুছে ফেলা হয়েছে) কিংবা লিফলেট বর্ষণ—এ সবকিছুর চেয়ে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তিনি ওই দিন সন্ধ্যায় শুনতে পাওয়া এক মন্তব্যে। কেউ একজন আক্ষেপ করে বলেছে, দেশের পরিস্থিতি এখন একেবারে চমৎকার, শুধু দেশটি সমাজতান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে—এটিই যা সমস্যা। লিফলেট বর্ষণের উদ্দেশ্য যদি জনগণের মনোবল দুর্বল করে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা সফল হয়েছে। তবে রাষ্ট্রদূত মনে করেন, কেবল এ ঘটনাটি দিয়ে খুব বেশি কিছু বোঝায় না। অল্প কয়েকজন লোক মিলে এ ঘটনাটি ঘটিয়ে থাকতে পারে, তার অর্থ এই নয় তাদের পেছনে জনগণের বিশাল একটি অংশ আছে।

হ্যাঁ, এ কথা ঠিক, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও দেশটি সমাজতান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। যে লোকটি বলেছে, সে নিশ্চয়ই অন্য কারো উদ্ধৃতি দিয়ে কথাটি বলছিল। এরকম মন্তব্য মুখ থেকে মুখে ছোটে। হয়তো এটি এখনকার একটি বাজার-চলতি মন্তব্য।

স্রেফ গুজব! রাষ্ট্রদূত হ্থর্ন নিজেকে আশ্বস্ত করেন, এ দেশ সমাজতান্ত্রিক হয়ে যেতে পারে না। এ মন্তব্যের সপক্ষে কোনোকিছু কি ঘটেছে? কই, সেনা অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই তো ঘটেনি। তাও বিশ্বস্ত সূত্রে তিনি জেনেছেন, ওই ষড়যন্ত্রটি খুবই খাপছাড়া, অপরিকল্পিত ও নিতান্ত পাগলামিপূর্ণ ছিল, এর পেছনে জড়িত কেবলই অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন রগচটা গুটিকয় তরুণ কর্মকর্তা। জীবন দিয়ে নিজেদের বোকামির মূল্য দিতে হয়েছে তাদের। না, আসলে খারাপ সম্ভাবনাগুলিই বড় করে দেখা মানুষের স্বভাব।

তবে এ কথা সত্যি যে, ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তেমন যাচ্ছে না। এর কারণ আসলে কী?

রাষ্ট্রদূত হথর্নের মনে এ নিয়ে সন্দেহ নেই, ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আবদুল কাদেরের নির্বাচনী ওয়াদা পরিত্যাগের নাটকীয় ঘোষণার সঙ্গে পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার একটি যোগসাজশ আছে। এক হিসেবে এটি অবশ্যম্ভাবীই ছিল, কারণ প্রধানমন্ত্রী যে নীতি গ্রহণ করেছেন, তাঁর অধিকাংশ সমর্থক সেটি গভীরভাবে বিশ্বাস করে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কি তাঁর ক্ষুদ্র বিরোধী অংশটিকে আরো কৌশলে কব্জা করতে পারতেন না? তাদের 'ক্ষোভ' প্রকাশ করতে দেওয়ার মতো সামান্য সংসদীয় স্বাধীনতা তাদের দেওয়া কি সম্ভব ছিল না, যাতে তাঁর বিরুদ্ধে তাদের কঠিন মনোভাব দানা বাঁধতে না পারে? প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর কর্মসূচির যাথার্থ্যে অটল থেকেও এসব সুযোগ দিতেন, নিঃসন্দেহে বিরোধীরা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেত। আবদুল কাদের কেন এমন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন? তিনি কি আশঙ্কা করছেন, বিরোধী পক্ষ এত শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছে যে, তাদেরকে সরকারের সঙ্গে প্রকাশ্য লড়াইয়ে নাবার সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়? নাকি, উল্টোটা মনে হয়েছে তাঁর? ভবিষ্যতে আর কেউ যাতে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে, সে জন্য দৃষ্টান্ত তৈরির উদ্দেশ্যেই কি তিনি এসব করছেন? নাকি এটি তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কারণে ক্ষমতার দম্ভের অপরিণামদর্শী হঠকারী বহিঃপ্রকাশ?

একটি ব্যাপারে রাষ্ট্রদূত হথর্ন নিশ্চিত। বিদেশী শক্তির ষড়যন্ত্র দমনে এমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য না হলেও পারতেন আবদুল কাদের। সেটি স্পষ্টত মিথ্যা অভিযোগ ছিল। রাষ্ট্রদূত হথর্ন মনে করেন, এ দেশে গোপন কিন্তু প্রভাবশূন্য একটি সমাজতান্ত্রিক দল যদি থেকেও থাকে, তবু এ দেশে বিদেশী কমিউনিস্টদের প্রায় কোনো প্রভাবই নেই। এখন তাঁর মনে হয়, বিদেশী শক্তিগুলির গোপন ষড়যন্ত্রের ঘটনা একের পর এক নাটকীয়ভাবে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বরং দেশে-বিদেশে ভুল ধারণা জন্ম নিয়েছে। সবাই মনে করতে পারে, এ দেশে হয়তো এমন বড় কোনো রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব আছে, যাদের মাধ্যমে বিদেশী শক্তি কার্যসিদ্ধি করতে সচেষ্ট। তাছাড়া এ প্রচারণা আবদুল কাদেরের বিরোধীদের কর্মকাণ্ডকে আরো জোরদার করেছে, কারণ তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, ওরকম বিদেশী সহায়তা ও হস্তক্ষেপ হয়তো সম্ভব। এ কারণে শোরগোল না তুলে এটিকে নিছক একটি অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে দেখাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হতো না?

নিজের সরকারের কাছে রিপোর্ট করতে গিয়ে হথর্ন নিজে আবদুল কাদেরের এসব দাবি স্বীকার কিংবা অস্বীকার কোনোটিই করতে পারেননি। সাবধানতার খাতিরে তিনি শুধু বলেছেন, এসব দাবির সত্যতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে বিদেশী কমিউনিস্ট শক্তির যোগসাজশ থাকার সম্ভাবনা তিনি একেবারে বাতিলও করে দিতে পারছেন না। আজ পর্যন্ত নিজ দেশের সরকারকে তিনি সুস্পষ্ট কিছু জানাতে পারেননি।

এসব যোগসাজশ তিনি এখনো যে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারেন, তাও নয়। কিন্তু তাঁর মনে হতে শুরু করেছে হয়তো চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, হয়তো একবারে উল্লেখ না করলেই ভালো। এখনো যেহেতু বিরোধীদের এ লড়াইয়ে ইস্তফা দেওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, এমত অবস্থায় স্পষ্ট করে জেনে নেওয়া জরুরি হয়ে দাঁড়ায়—সরকারের বিরুদ্ধে আসলে কারা এমন লড়াইয়ে নেবেছে। তাছাড়া তাঁরা সবাই যদি কমিউনিস্ট হয়েও থাকে, এমন ধূমকেতুর মতো আচম্বিতে তারা কী করে উদয় হয়, কিংবা এমন নয় তো—আবদুল কাদেরের নির্দয় কর্মকাণ্ডের কারণেই যারা কমিউনিস্ট নয় তারাও ওদের দিকে ঝুঁকছে?

হ্যাঁ, এটিই সবচেয়ে দরকারি প্রশ্ন। আবদুল কাদের তাঁর বিরোধীদের খেদিয়ে লাল শিবিরের পানে পাঠিয়ে দিচ্ছেন না তো?

প্রশ্নটির বিস্তারিত বিচার-বিবেচনা করা এবং একটি সিদ্ধান্তে আসা নিতান্ত জরুরি। হয়তো আবদুল কাদেরকে যথাসময়ে পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

২

প্রধানমন্ত্রী কেমন এক অপ্রত্যাশিত ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন। প্রথম কয়েক মিনিট তিনি ঠাট্টা-তামাশা করেন এবং মফস্বল এলাকায় তাঁর সাম্প্রতিক সফরের সময় সংঘটিত মজাদার ঘটনার বর্ণনা দিতে থাকেন। এমনকি লিফলেট বর্ষণের ঘটনাটিও তাঁর কাছে বিশেষ মজার ব্যাপার বলে মনে হয়।

'ওরা হয়তো আপনাদের স্বাধীনতা দিবসে আপনাকে এভাবেই অভিনন্দন জানাতে চেয়েছে। পদ্ধতিটি এমন বিদঘুটে হওয়ার কারণ ওর কমিউনিস্ট।'

কক্ষে আরো তিনজন লোক উপস্থিত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তার সহকারী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তারা প্রত্যেকে প্রধানমন্ত্রীর মতো প্রসন্নতা বোধ করছিল কি না সন্দেহ আছে, তবে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি রসিকতায় তারা আন্তরিকভাবেই হাসছিল। রাষ্ট্রদূত কদাচিৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসেন, তবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়াবার সময় তিনি নাক দিয়ে দুর্বোধ্য ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করছিলেন।

লিফলেটের ঘটনা নিয়ে মন্তব্যে সৃষ্ট হাস্যরোল মিলিয়ে গেলে প্রধানমন্ত্রী গম্ভীর হয়ে ওঠেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিছু খোঁজখবর করেছেন। আপনি হয়তো জেনে থাকবেন বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশের বিশেষ বাহিনী তৈরি করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এ জন্য আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও উপকরণ প্রয়োজন পড়বে।'

সারাটি সকাল বিচিত্র চিন্তাভাবনার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে রাষ্ট্রদূত কিছুক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন, রুমাল দিয়ে কপাল মুছে আরো কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকেন, অবশেষে বলেন, 'বিশেষ বাহিনীর কথা আমার জানা ছিল না।'

'আসলে এটি একটি পুরনো প্রস্তাব ছিল, আবার সেটি খুঁড়ে তোলা হয়েছে', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'প্রস্তাবটি নানা স্থানে সংস্কার করা হয়েছে, এটি হবে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্র্যাক ফোর্স।'

আর দশজন রাষ্ট্রদূতের মতোই হথর্ন রীতিমাফিক অস্ত্রশস্ত্রের চাহিদার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চান, এ চাহিদাপত্র দ্রুত তাঁর সরকারের বরাবরে পাঠিয়ে দেবেন। বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটার পর তিনি নিতান্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আমার সরকার এখানকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা এসব সংকট সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের সম্পর্ক আরো বিস্তারিত জানতে চায়। সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য : তাদের শক্তিমত্তা, তাদের মদদদানকারী অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির নাম।'

প্রধানমন্ত্রী ক্ষীণ হেসে বলেন, 'আমার ধারণা ছিল এসব তথ্য তাদের রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে তারা পেয়ে থাকবে।'

'তাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে', কণ্ঠে রসিকতার সুর বজায় রেখে রাষ্ট্রদূত বলেন, 'তিনি এখনো জানেন না। প্রতিদিন টুকটাক ঘটনা ঘটেই চলেছে। যেমন ধরুন, এই নতুন গজানো দলটি।'

'অস্ত্রগুলি আমাদের দিন', প্রধানমন্ত্রী সহসা হেসে উঠে বলেন, 'আমরা এর বন্দোবস্ত করব।'

প্রসঙ্গটি উঠে পড়েছে দেখে রাষ্ট্রদূত খুশি হন, শেষ পর্যন্ত তা টেনে নিয়ে যাবেন সাব্যস্ত করেন। তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত আমার সরকার প্রসন্নচিত্তে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে, আপনার প্রতি তাদের বিশেষ আস্থা। কিন্তু এসব বিষয় জানেনই তো। মাঝেমধ্যে তাদের এ কথা জানানো মুশকিল হয়ে পড়ে যে, তারা কোনো দেশে কেবল বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র পাঠাচ্ছে।'

'পক্ষটি কমিউনিস্ট হলেও?'

'সুবিবেচনার খাতিরে ক্ষেত্রবিশেষে কমিউনিস্ট হলেও। তাছাড়া দূর থেকে পরিস্থিতি তো একটু অন্যরকম দেখাবেই। আমি জানি, সেখানে অনেকে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করে দিয়ে তাদের খোলাখুলি লড়াই করতে দেওয়ার নীতিকে সমর্থন করবে। আপনাকে বলে রাখি প্রধানমন্ত্রী, ওরা কিন্তু বেশ উদ্বিগ্ন।'

প্রধানমন্ত্রী প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন। 'আপনাকে একটি কথা বলি। আমাকে যদি খুব কঠোর মনে হয়ে থাকে, তার পেছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে। আমাদের এখানকার লোকজনের স্বভাব-চরিত্র আপনাকে বুঝতে হবে। তিন দিন ধরে বিয়েবাড়ির ধুমধাম শেষ করার পরেও এখানকার মানুষজনের উৎসবের ভাব কাটে না। আমাদের এখানকার লোকজন মনে করছে নির্বাচন এখনো চলছে এবং বিজয়ী দল এখনো ক্ষমতায় বসেনি। এ পরিস্থিতির সুযোগ কারা নিচ্ছে? কমিউনিস্টরা। যারা মনে করে নির্বাচনের উৎসব এখনো চলছে তাদের দলে ভিড়িয়ে কমিউনিস্টরা ঠাণ্ডা মাথায় ফসল ঘরে তোলার পাঁয়তারা করছে। প্রথমে তারা ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। মানুষের মন-মানসিকতা বুঝে যাওয়ার পর এখন তারা নিজেরা একটি দল দাঁড় করিয়েছে।' তিনি থেমে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দিকে তাকান। 'আপনাকে আরেকটি কথা বলতে হয়। আমরা এনডিপির সব সদস্যকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি—নেতা-কর্মী সবাইকে। আমরা স্বাধীনতা দলের মুখোশ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করব। আপনারা তখন দেখতে পাবেন কারা এর পেছনে আছে। আশা করি তখন আর কেউ বলতে পারবে না যে, এভাবে লড়াই করার দরকার ছিল না।'

এনডিপির লোকজনকে ছেড়ে দেওয়ার এ আকস্মিক ঘোষণায় রাষ্ট্রদূতের পালের হাওয়া উল্টো দিকে বইতে শুরু করে যেন। শীঘ্র তিনি আশ্বস্তের মতো বোধ করেন।

'খুব চমৎকার সিদ্ধান্ত।' তিনি মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রীর চোখে গম্ভীর ভাব নেবে আসে, স্তুতিবাক্য শুনলে বরাবর তাঁর তা হয়। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর তিনি ব্যাখ্যা করেন কেন এনডিপির লোকজনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, সে সময় এনডিপিই ছিল কমিউনিস্টদের একমাত্র হাতিয়ার। এখন কমিউনিস্টরা ওই দলের ছদ্মবেশ নেওয়ার কিংবা সেটিকে ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করছে না। 'এনডিপিকে নিয়ে সমস্যা তেমন কিছুই নেই, কেবল ওদের অতি-জাতীয়তাবাদ কানে বড় বাজে।'

রাষ্ট্রদূত প্রস্থান করার আগে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেন। কূটনীতিক এবার আন্তরিক সুরে জানিয়ে দেন শীঘ্রই সেটি পেশ করা হবে।

দরজায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতের হাতে উষ্ণ চাপ প্রয়োগ করেন। ক্ষীণ হাসি মেখে নিচুস্বরে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত বলতে ভুলে গেছেন, অস্ত্রের বিষয়টি আমরা একেবারেই প্রচার করতে যাচ্ছি না।'

স্পষ্ট বোঝা যায়, অস্ত্রের চালান পাওয়ার ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত সন্দেহ রাষ্ট্রদূতের মনেও নেই।

সন্তুষ্টচিত্তে তিনি বিদায় নেন। এতদিনকার ঘোলাটে পরিস্থিতি বুঝি এবার কিছুটা অবয়ব পেতে শুরু করেছে।

৩

পুলিশের প্রস্তাবিত বিশেষ বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন, বেতার যোগাযোগের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণের এক ঢাউস তালিকা পাঠাতে কালবিলম্ব করেন না রাষ্ট্রদূত হর্থর্ন, সেই সঙ্গে বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনা করার ব্যাপারে তাঁর সরকারের কাছে আবেদন করেন। একই সময়ে তিনি সর্বসাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আরেকটি চিঠি ছাড়েন। এ চিঠিতে তিনি লেখেন, আনন্দের সঙ্গে অবগত করানো যায়, পরিস্থিতি এখন পরিষ্কার হতে শুরু করেছে, আড়ালে কারা কলকাঠি নাড়ছে তা বলে দেওয়া এখন সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। তিনি আবদুল কাদেরের এনডিপির সদস্যদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করেন। একে তিনি সবচেয়ে 'প্রশংসনীয়' পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করেন, কারণ এর ফলে অতি-জাতীয়তাবাদীদের থেকে কমিউনিস্টদের আলাদা করা সম্ভব হবে, ফলে সরকারের পক্ষে অতি-জাতীয়তাবাদীদের আঘাত না করে কমিউনিস্টদের কাবু করা সহজ হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে এনডিপিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার কমিউনিস্ট কৌশল অসার হয়ে পড়বে। এ সিদ্ধান্তের আরেকটি ভালো দিক তিনি আবিষ্কার করেন। বিরোধীদের প্রতি সরকারের আচরণ নিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হবে।

চিঠি লেখা শেষ করে রাষ্ট্রদূত তার সরল পাতলা ঠোঁট বাঁকিয়ে শিস দিয়ে অস্পষ্ট কোনো সুর ভাঁজেন। তাঁর সত্যি খুব খুশি-খুশি লাগে, অর্থপূর্ণ কিছু একটা জানাতে পারার খুশি, এমন একটা কিছু যা চোখে দেখা যায়।

পর্ব : ৪

প্রথম অধ্যায়

১

রাতভর প্রবল বর্ষণে বাতাস ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, গাঢ় নীল আকাশ এত নিচু, মনে হয় ছোঁয়া যাবে। ঝরঝরে একটি দিন, পরদিনের পত্রপত্রিকার খবরে জানা যাবে এটি ছিল ভ্রাতৃত্ববোধ, সমঝোতা ও অতীতের ভুলভ্রান্তি বিস্মৃত হওয়ার দিন।

সাদা শার্ট গায়ে দিয়ে আবদুল কাদের যখন একই সঙ্গে প্রত্যয়ী অথচ ঈষৎ অনুতপ্ত, হৃষ্ট অথচ লজ্জাবিনম্র ভঙ্গিতে সশরীরে আবদুর রবের কারামুক্তি তত্ত্বাবধান করতে কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজির হন, ততক্ষণে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য সেখানে মানুষের ভিড় জমে যায়। তিনি চেয়েছিলেন, একে একটি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে রূপ দেওয়া হোক, যাতে মানুষজন প্রফুল্লচিত্তে লক্ষ করে 'ভাইয়ে ভাইয়ে ভুলভ্রান্তি হতে পারে, আবার সে ভুল শোধরানোও যায়'। তাঁর অভিলাষ অনুযায়ী এ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আগাম প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়। আবদুল কাদের অপেক্ষমাণ জনতার দিকে হাস্যোজ্জ্বল চাহনি দেন এবং তাদের উদ্দেশে তাঁর সুপুষ্ট হাত নাড়েন। সমবেত জনতা শুভেচ্ছাসূচক ধ্বনি তোলে। তারপর প্রধানমন্ত্রী তাঁর 'ভাইয়ের' সঙ্গে দেখা করতে চীনা গোলাপের সারির মাঝ বরাবর দ্রুতপায়ে ভারী কারা-ফটকের দিকে হেঁটে যান।

কয়েক মিনিটের মাথায় তিনি আবার বেরিয়ে আসেন, এবার তার পদচালনা ধীর, মুখে প্রশস্ত হাসি, তিনি আবদুর রবের হাত ধরে আছেন; আবদুর রব হাঁটেন বিচিত্র ভঙ্গিতে, অনিশ্চিত পদবিক্ষেপে, যেন কারাবাসের কারণে হাঁটার অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছেন। তারপর, দর্শকদের মধ্যে উল্লাস ধ্বনিত হলে, আবদুর রব থেমে চতুর্দিকে তাকান, প্রবলভাবে চোখ পিটপিট করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকান, প্রধানমন্ত্রী তখন প্রসন্ন হাসিতে দর্শকদের দিকে চেয়ে হাত নাড়ছেন। ক্যামেরায় ক্লিক শব্দ উঠতে থাকে। কিছুক্ষণ পর আবদুর রবও হাত তুলে দর্শকদের উদ্দেশে নাড়েন, তবে তাঁর মুখে কোনো হাসি নেই। প্রবল আচ্ছন্নতার কারণে জনতার হর্ষধ্বনির প্রত্যুত্তর দেওয়ারও ক্ষমতাও যেন-বা তাঁর নেই। কিংবা তিনি হয়তো মনে করে থাকবেন, এসব হর্ষধ্বনি তাঁর সঙ্গের মানুষটির উদ্দেশে।

তারপর প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি মাইক্রোফোন তুলে দেওয়া হয়। প্রথমে তিনি সেটির দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করেন, তারপর ঝট করে তা কেড়ে নেন। 'আজ আমি

কোনো ভাষণ দিতে চাই না', আবেগকম্প্র গলায় তিনি বলেন। 'আমি শুধু এটুকুই বলব, আমার হৃদয় আজ খুশিতে ভরে গেছে এবং আমি নিশ্চিত, আমার পুরনো বন্ধুকে আবার আমার পাশে দেখতে পেয়ে আপনারাও উৎফুল্ল।'

এক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা, সমবেত জনতা হয়তো ভেবে থাকবে প্রধানমন্ত্রী আরো কিছু বলবেন। কিন্তু যখন দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী সদ্যকারামুক্ত বন্ধুর বাহু আঁকড়ে ধরে মোটরগাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, জনতা আবার হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ে। কেউ একজন চিৎকার করে আবদুর রবকে কিছু বলতে দেওয়ার অনুরোধ জানায়, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। তার অনুরোধ যদি-বা দুই রাজনীতিবিদের কান পর্যন্ত পৌঁছে থাকেও, তাঁদের দুজনার মধ্যে তার কোনো ছাপ পড়ে না।

কালো রঙের ঢাউস মোটরগাড়িতে উঠে বসার আগে আবদুল কাদের ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার তোপের দিকে আরো দ্রুত হাত নেড়ে তারপর ভিড়ের দিকে ফেরেন, পাশের লোকটিও একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে নেই দেখে আবদুর রবকে নিজ হাতে উদ্‌গ্রীব ক্যামেরার দিকে ঘুরিয়ে দেন। তারপর চট করে গাড়িতে উঠে বসেন। গাড়ি চলতে শুরু করে।

২

'আমার মাথায় একেবারেই ঢুকছে না, কী কারণে সে এ কাজ করল।' বাড়ির বসার ঘরে নিজের পুরনো চেয়ারে বসে আবদুর রব ঘোষণা করেন।

ছাড়া পাওয়ার খবর শুনে তাঁর বন্ধু ছুটে এসেছেন। তিনি অধৈর্যভাবে বলেন, 'এখন দেখো, তুমি আবার এসব শুরু কোরো না কিন্তু। তোমার নিজের সমস্যার অন্ত নেই। ভাবির অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, তোমাকে আবার জেলে ঢোকালে কিন্তু তাকে আর বাঁচানো যাবে না বলে রাখলাম। তাছাড়া, আমি যদিও জানি না ওরা কেন এ কাজ করেছে, তোমাকে এটুকু বলতে পারি, তুমি ইচ্ছামতো চলাফেরা করো, ওদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করো—তা ওরা হতে দেবে না।'

আবদুল কাদেরের কাছে সেটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। তবে এ সিদ্ধান্তের খবর জানাতে দুদিন আগে আবদুল কাদেরের প্রতিনিধি কারাগারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কোনো শর্তের কথা তো উল্লেখ করেনি। তখনই তাঁর বিস্ময় জেগেছিল। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসাও করেননি কোনো শর্ত আছে কি না, কারণ তাঁর শঙ্কা ছিল শর্ত থেকে থাকলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হতো। তাছাড়া তাঁকে বলা হয়েছিল আটকাদেশের অধীনে এনডিপির যত সদস্য কারারুদ্ধ আছে, সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তার মুক্তি কোনো বিশেষ ব্যাপার নয়। [...]*

আবদুর রবের ভ্রূ ঈষৎ প্রসারিত হয়, তবে তিনি কিছু বলেন না।

টেবিলের ওপর সামনে ঝুঁকে আবদুল কাদের উদ্‌গ্রীবভাবে বলেন, 'আমি আরো জরুরি একটি বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি। আমি জানি, আপনি হঠাৎ করে আপনাকে মুক্তি দেওয়ার কারণ খোঁজার চেষ্টা করছেন। জেলে থাকার সময় বাইরের সব খোঁজখবরই আপনি রেখেছেন, তাই আপনি হয়তো জানেন আপনার যেসব অনুসারী মুক্ত ছিল, তাদের কী হয়েছে। তারাও আপনাকে ত্যাগ করেছে। অর্থাৎ,

আপনার সমর্থকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে।' টিকটিকির জিহ্বার মতো তাঁর চোখ আবদুর রবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'আপনি হয়তো জানেন, আজ আপনি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন।'

আবদুর রব কয়েক মুহূর্ত প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে মাথা নাড়েন, 'না, জানি না।'

আবদুল কাদের টেবিলের ওপর থেকে ক্ষিপ্র বেগে ধুলো ঝেড়ে বলেন, 'স্বাধীনতা দল নামে একটি নতুন পার্টির কথা নিশ্চয়ই আপনাকে জানানো হয়েছে। হয়নি বলবেন না।'

কোনো কথা না বলে আবদুর রব ওপরে-নিচে মাথা দোলান।

'আপনার শিষ্যরা ওই দলেই যোগ দিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এ দলের পেছনে কারা আছে, জানেন?'

'আপনার মুখ থেকেই শুনি', আবদুর রব সতর্ক ভঙ্গিতে বলেন।

'ওরা কমিউনিস্ট। ওরা আপনার লোকজনকে ভাগিয়ে নিয়েছে, শীঘ্রই আপনি সমর্থকবিহীন হয়ে পড়বেন।' কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি বুঝতে পারছেন, কেন আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?'

'না।'

'ঠিক আছে, আমি আপনাকে বলি।' প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্য বিরক্তিমাখা কণ্ঠে বলেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না আবদুর রব এতটা নিরীহ। 'আপনাকে আপনার লোকজনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। ঝোপের আড়াল থেকে ফণা তুলে ধরা এ নতুন সাপের বিরুদ্ধে আমাদের দুজনকে লড়াই চালাতে হবে। ওরা আমাদের উভয়ের শত্রু, দেশের শত্রু।'

কিছুক্ষণ থেমে থাকার পর আবদুর রব বলেন, 'আমি পরিস্থিতি আরো খানিকটা বুঝে দেখি, এ নতুন দল সম্পর্কে আরো খোঁজখবর করি। আমার দলের সব লোকজনকে ছেড়ে না দিলে আমি তো কিছু করতে পারব না।'

'ছেড়ে দিই আর ওরা গিয়ে নতুন দলে যোগ দিক! আপনি জানেন ওরা আগে কী ছিল? কমিউনিস্ট ছিল, কমিউনিস্ট। মনে করবেন না, মনমানসিকতা পাল্টানোর কারণে ওরা আপনার দলে যোগ দিয়েছে।' আবদুল কাদের আবার তার মাথা নাড়েন। 'না, আমি মনে করি না আর কাউকে ছাড়া ঠিক হবে। আপনি চাইলে কারাগারেই তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না, আপনাকে বলে রাখলাম। বের হয়ে আসার স্বার্থে ওরা ভাব দেখাবে আপনার সঙ্গে আছে।'

'আপনি তো আবারও তাদের জেলে ফেরত নিতে পারবেন', আবদুর রব বলেন।

'তাহলে আপনার ধারণা, দল আপনার এখনো অক্ষত আছে?'

আবদুর রব উত্তর দেন না। আবদুল কাদের আবার বলেন, 'সেটি নিজেই বুঝবেন। তখন বুঝতে পারবেন, আমাদের দুজনকে সব মতপার্থক্য সরিয়ে রেখে হাতে হাত মিলিয়ে এ নতুন আতঙ্কের মোকাবিলা করতে হবে।'

'এ নতুন দলটির ব্যাপারে আপনাকে খুব শঙ্কিত মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, একদিক থেকে শঙ্কিতই। আপনারও তা-ই হওয়া উচিত। ওরা রীতিমতো ভয়ঙ্কর।'

'একটি ব্যাপার আমার পরিষ্কার জানা দরকার। আপনি আমাকে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়েছেন। ধরা যাক ওই দলটিকে আমার ততটা ভয়ঙ্কর মনে হলো না, মানে আমি

দেখলাম দেশের খুব বেশি ক্ষতি তাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়, তখন কিন্তু আপনার সঙ্গে হাত আমি নাও মেলাতে পারি। কারণ আমাদের মধ্যে মতের অমিল প্রবল। সেক্ষেত্রে কী করবেন?'

প্রধানমন্ত্রীর মুখে মৃদু হাসি উঁকি দেয়। 'আমাদের দুজনের একত্রে কাজ করার ক্ষেত্র তৈরি হয়ে আছে। কাল সব ক'টি পত্রপত্রিকায় ছবি ছাপা হবে, আপনি আর আমি কারাগারের সামনে হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছি। আপনার মুক্তির পরপরই আমাদের এই অন্তরঙ্গ বৈঠকের খবরও প্রকাশ করা হবে। এই সৌহার্দ্যের ভাবমূর্তি পরিবর্তন করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে।'

'এবং আমার ধারণা, এ ভাবমূর্তি ধ্বংস করার জন্য আমি কোনো কথা বললেও সেটি যাতে জনগণের কাছ পর্যন্ত না পৌঁছায় আপনি তার বন্দোবস্ত করবেন, তাই না?'

'সে রকম পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার আপনার পড়বে না, কথা দিচ্ছি। তাছাড়া যে নেতার সমর্থক নেই, তার সামনে পথও খুব বেশি খোলা থাকে না। হয় তাকে রাজনীতি থেকে অবসর নিতে হয়, নতুবা শরিক খুঁজতে হয়। কে হবে আপনার সেই শরিক? আপনি নিশ্চয়ই কমিউনিস্টদের শিবিরে মিত্র খুঁজবেন না?'

আবদুর রব আবছাভাবে মাথা নাড়েন, প্রধানমন্ত্রী তাকে দিয়ে আসলে কী করাতে চান তা যেন তার মাথায় ঢুকতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ সম্মুখে চেয়ে থেকে তাঁর মুখে একটি ছায়া পড়ে। তিনি বলেন, 'আপনি আমাকে ব্যবহার করতে চান।'

প্রধানমন্ত্রী জিহ্বায় কামড় দেন, 'আরে আরে! দিবাস্বপ্ন দেখা ছেড়ে বাস্তববাদী হতে শিখুন। আপনাকে আরো বলি, হঠাৎ করে এই স্বাধীনতা দল গঠন করার পেছনে কী কারণ? আপনি জানেন, আমাদের প্রতিবেশী দেশের পরিস্থিতি কী? সীমান্তের একেবারে ওপারেই কমিউনিস্টরা দারুণ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আমাদের এখানকার ওরা স্বভাবতই ভাবছে, এখানেও কিছু একটা করার সময় এসে গেছে। ওদের এবং ওদের পরিকল্পনার ব্যাপারে আমাদের হাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো যথেষ্ট তথ্য আছে।'

আবদুর রব নিশ্চুপ থাকেন।

প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি চাইবেন কমিউনিস্টরা এখানে ক্ষমতায় আসুক?'

'না', আবদুর রব উত্তর দেন। 'আমি শুধু ভাবছি, তথাকথিত স্বাধীনতা দলের বিরুদ্ধে আপনি স্পষ্টত যেসব নিপীড়নমূলক পদক্ষেপের পরিকল্পনা করছেন, তাতে সম্মতি দেওয়া উচিত হবে কি না।'

'তাহলে ওরা এভাবে নিজেদের ইচ্ছেমতো চলতে থাকুক এবং এক সময় সংগঠিত হয়ে আমাদের ধ্বংস করে ফেলার মতো সামর্থ্য জোগাড় করে ফেলুক, সেটি চান? এর পরিণাম শুধু ভয়ঙ্কর এক রক্তপাত। সাপের বাচ্চা বেড়ে উঠতে দেওয়ার কারণে বহু দেশে এ জাতীয় ঘটনা ঘটেছে।'

'হয়তো আপনার সব আশঙ্কাই অমূলক। হতে পারে ওই দল তেমন কেউকেটা কিছু নয়। তার চেয়ে বরং চুপচাপ বসে থেকে দেখুনই না তারা কত দূর যায়। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, ওরা বেশি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেলে আপনার সঙ্গে হাত মেলাব।'

প্রধানমন্ত্রীর চোখ কুঞ্চিত হয়। 'তার মানে ততদিন পর্যন্ত আপনি আমার বিরুদ্ধে লড়ার প্রস্তাব দিচ্ছেন?'

'আমি সে কথা বলিনি।'

প্রধানমন্ত্রী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিরক্ত ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে নেন।

আবদুর রব জিজ্ঞাসা করেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি চায় আপনি এ দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন?'

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টানছেন কেন? এটি যে আমাদের দেশের ভালো-মন্দের প্রশ্ন, সেটি বুঝতে পারছেন না?'

'আমাকে কি তাহলে মেনে নিতে বলছেন, যখন আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তখনো দেশের স্বার্থেই তা করা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, দেশের স্বার্থে। কেননা আপনার পরিকল্পনা দেশে কমিউনিস্টদের প্রবেশের পথ খুলে দিত।'

'না, আমাদের পরিকল্পনা ছিল, এবং এখনো আছে, জাতীয়তাবাদকে জোরদার করা, যাতে আমাদের দেশে নাক গলাতে আসা যে কোনো বিদেশী শক্তির আমরা মোকাবিলা করতে পারি।'

এ কথা বলে আবদুর রব ঝট করে উঠে দাঁড়ান।

'আমি আমার লোকজনের সামনে বিষয়টি তুলব। তবে আমি জানি তারা কী বলবে। তারা বলবে আপনার এবং স্বাধীনতা দল উভয়ের বিরুদ্ধেই লড়বে, হয়তো যে যত বেশি বিদেশী শক্তির মুখাপেক্ষী হবে, তার বিরুদ্ধে লড়াইও তত জোরদার হবে।'

'সম্ভবত জেলে বসে, তাই না?'

আবদুর রব কিছুক্ষণ দ্বিধা করে বলেন, 'আপনি আমাকে যে স্বাধীনতা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন, কারাবাসের চেয়ে তা মোটেই উত্তম কিছু নয়।'

আবদুল কাদেরের চেহারায় ক্ষীণ ক্রোধ উঁকি দিলে তিনি নিজেকে সংযত করেন। 'না, খুব তাড়াহুড়ো করে আপনাকে ডেকে ফেলেছি। আপনার বিশ্রাম জরুরি। আজ রাতে ঘুম দিন। কাল আবার বসব। হয়তো কাল আপনি পরিস্থিতি আরো সহজে বুঝতে পারবেন।'

'আপনাকে জানিয়ে রাখি, আমার জন্য যে স্বাধীনতাটুকু বরাদ্দ করছেন, আপনার কর্মকাণ্ডকে মার্জনা বা সমর্থন করা তো দূরের কথা, শরিক হওয়ার মতো যথেষ্ট প্রলোভনও সেটি হতে পারে না। আমাদের কি আপনি নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী অবাধে লড়াই করতে দেবেন?'

'যেমন?'

'যেমন, আমরা ধামাচাপা দেওয়া কোকা বাঁধের ঘটনার একটি সুষ্ঠু তদন্তের জন্য দাবি তুলতে পারি। কমিউনিস্টদের বড় বড় ষড়যন্ত্রের গুজব এবং লোকজনকে বিনাবিচারে আটক করে রাখা চলবে না : জনগণকে প্রকৃত সত্য জানতে দিতে হবে। আমাদের দেশ বাস্তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর কতটা নির্ভরশীল সে বিষয়ে একটি সুষ্ঠু তদন্তও আমরা দাবি করব এবং আমরা জানতে চাইব, এ নির্ভরশীলতায় কতটুকু স্বার্থ দেশের, কতটুকু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। কতটুকু নির্ভরশীলতা না হলেও চলে, কতটুকু অনিবার্য।'

প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে হাতের তালু দিয়ে মুখ ঘষেন। তারপর আবদুর রবের দিকে না তাকিয়ে শীতল কণ্ঠে বলেন, 'এসব ভুলে যান।' তিনি আবার মুখ ঘষেন এবং তারপর তীক্ষ্ণভাবে আবদুর রবের দিকে তাকান। 'ইদানীংকার এতসব ঘটনার কোনো অর্থ কি আপনার কাছে নেই?'

'আছে, অর্থ আছে। বরং আপনিই অর্থ ঠিকমতো বোঝেন না মনে হচ্ছে। আপনি তো স্বাধীনতা দলের আকস্মিক উত্থানের প্রকৃত কারণ বুঝতে পারছেন বলেও মনে হচ্ছে না। দেশে যা যা ঘটেছে বলে আপনি বলছেন, তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতাই বরং আপনার আগে চোখে পড়ত। আপনি কি জানেন, ওরা এখন কী বলে? বলে যে, সমাজতন্ত্র এখন প্রায় শ্রদ্ধেয় একটি শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আর আপনি কি মনে করেন একটি মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য নেওয়া বন্ধ করে দিলেই সমাজতন্ত্র শব্দটি আবার ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে? এ কাজ করলে যে আমাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র মনঃক্ষুণ্ন হবে এবং কমিউনিস্টরা আরো শক্তিশালী হবে, সেটা কি বোঝেন? আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, শুনুন, সুস্থ মাথায় চিন্তা করার চেষ্টা করুন।' প্রধানমন্ত্রী প্রথমে ক্রুদ্ধভাব দেখালেও নিজেকে শান্ত করেন। 'আজ আলোচনা থাক। দয়া করে আবার ভাবুন, ভেবে আমাকে জানান। তবে আপনি যে আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না এবং আপনাকে ছাড়াই যে আমাদের দিব্যি চলবে, এ কথা মাথায় রাখলে ভালো করবেন।'

আবদুর রবের চেহারায় আবার সেই ছায়া এসে পড়ে।

'ঠিক আছে, বিবেচনা করব', ক্লান্ত স্বরে তিনি বলেন। আর কিছু বলার নেই বলে মনে হয়।

৩

ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা বিদায় নেওয়ার পর আবদুল কাদের বিশেষ গোয়েন্দা প্রতিবেদনটি চেয়ে পাঠান।

আবদুর রবের সঙ্গে বৈঠক তাঁর মধ্যে একটি তিক্ত ভাব এনে দিয়েছে। আবদুর রব যে এরকম করতে পারেন, নিঃসন্দেহে সেটি তিনি অনুমান করেছিলেন। তিনি এও জানেন, আবদুর রব পরিস্থিতি বুঝতে না চাইলে বা সহযোগিতা করতে রাজি না হলেও কিছুই যাবে-আসবে না। কেননা আবদুর রব নিজেও এ কথা টের পেয়েছেন যে, তিনি বিবেচকের মতো আচরণ না করলে তাঁর বর্তমান স্বাধীনতা কেবল একটি খোলসে পরিণত হবে। এনডিপির নেতা তাঁর মর্জিমাফিক কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলে আবদুল কাদেরের ভালো লাগত। এতে সবকিছু সহজ ও সুখকর হতো।

তিনি 'অত্যন্ত গোপনীয়' লেখা নথিটির দিকে চেয়ে গর্জন করে ওঠেন, 'ওরা এখন তাহলে নিজেদের সংগঠিত করছে, আর সবখানে ফুটবল দল গজাচ্ছে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'এদের নেতা কারা, খোঁজ পাওয়া যায়নি?'

'আমরা কেবল সন্দেহ করছি, প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সারা দেশে যেসব ফুটবল দল তৈরি হচ্ছে, তাদের একটির সঙ্গে আরেকটির কোনো যোগ নেই বলে মনে হচ্ছে।'

'যা আসলে অসম্ভব।'

'হ্যাঁ', প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী লোকটি বিশেষ জোর দিয়ে বলে। 'এটি সম্ভব নয়। তবে আমরা শীঘ্রই তথ্য উদ্‌ঘাটন করে ফেলতে পারব আশা করছি। ওদের উদ্দেশ্যটা

একবার জানতে পারলেই আমাদের পক্ষে তাদের ধরে ফেলা খুব সহজ হয়ে যাবে। আজ হোক, কাল হোক, তাদের আমরা ফুটবলের মাঠে নাবিয়েই ছাড়ব।'

প্রধানমন্ত্রী আবার গর্জন করেন, 'ওরা ওদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে আমাদের ওপর চড়াও না হওয়া পর্যন্ত তাহলে আমাদের অপেক্ষা করে যেতে হবে, তাই তো?'

'ঠিক তা নয় স্যার। আমরা রশিতে ঢিল দিচ্ছি বটে, কিন্তু সবার ওপর নজরদারি বহাল আছে। বেশি দূর কেউ যেতে পারবে না। ওদের পাকড়াও করতে কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না, অবশ্য সেটি যদি তারা কিছু করার স্পর্ধা দেখায় তবেই শুধু।'

প্রধানমন্ত্রী তাঁর চেয়ারে এলিয়ে পড়ে কয়েক মুহূর্ত গভীর ভাবনায় ডুবে যান। দেশের আনাচে-কানাচে থেকে যেসব খবর আসছে, তার মাথামুণ্ডু মাথায় ঢোকে না যেন। খবরগুলি খুবই অবাস্তব, ঠিক যেন একঝাঁক ব্যস্ত পিপীলিকার সারির মতো, ওপর থেকে তাকিয়ে থাকা মানুষ যেমন পিপীলিকার কর্মকাণ্ডের কোনো অর্থ বোঝে না। নিঃসন্দেহে তিনি পিঁপড়ের বাসা ভেঙে দিতে পারেন, হয়তো সেটিই তাঁর করা উচিত। এলোমেলো ছুটোছুটি করে নিজেদের সংগঠিত করতে থাকা এসব পিপীলিকাবৎ মানুষের গতিবিধি তিনি সময়মতো থামিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এরা কেবল 'ফুটবল দল' গঠন করছে, আর যাদের আপাতদৃষ্ট উদ্দেশ্য শুধু 'জাতির স্বাস্থ্য' সুগঠিত করা, তাদের ওপর খড়গ চালানো হাস্যকর কাজ মনে হবে না? এদের অধিকাংশেরই স্বাধীনতা দলের সঙ্গে কোনো সংস্রব নেই বলে প্রতীয়মান হলেও এসব ফুটবল টিম নির্ঘাৎ ওই দলটির শাখা ছাড়া আর কিছু নয়।

সরকার যদি এ পর্যায়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে কি তারা আদৌ দেশের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠবে? সরকার যে তাদের কাবু করতে পারবে এ ব্যাপারে আবদুল কাদেরের মনে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিশেষ পুলিশ বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও উপকরণ এসে গেলে যে কোনো অশুভ সংগঠনের কর্মকাণ্ড বানচাল করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের শক্তি আরো বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ বাহিনীর প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে পুরোদমে চলছে। ওরা যদি এই উন্মাদ খেলা না থামায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বসে থাকবে না। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যেখানেই কোনো গণতান্ত্রিক সরকার বেকায়দায় পড়ে, আমেরিকানরা শক্তি ও মনোবল উভয় প্রকার সহায়তা নিয়ে উদ্ধারে এগিয়ে আসে।

তবে একটি বিষয় প্রধানমন্ত্রীকে ধাঁধায় ফেলে দেয়।

কীসের তাড়নায় এমন ভয়ঙ্কর একটি পথ তারা বেছে নিয়েছে, আগুন নিয়ে খেলায় মেতে ওঠার এ মানসিকতা তারা কোথায় পেল?

নাকি তারা এত অন্ধ যে, নিজেদের কর্মকাণ্ডের বিপদটুকু দেখার ক্ষমতাও নেই?

প্রধানমন্ত্রী গোয়েন্দা দপ্তরের লোকটির দিকে তাকান। 'না, ফুটবলগুলি বোমা হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব না। অপেক্ষা করার উপায় নেই। সব ফুটবল টিম নিষিদ্ধ করতে হবে। যান, ওদের সত্যিকার উদ্দেশ্য কাউকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিন।'

আমার পক্ষে আর উপায় কী, তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন। ওরাই তো আমাকে এমন নিষ্ঠুর করে তুলছে।

কয়েক মিনিট পর প্রধানমন্ত্রী—যাঁর মুখে এখন কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়ার স্থিরতা—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করেন, 'টুর্নামেন্ট শুরু হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি না, বিশেষত অবাধে ঘুরে বেড়ানো সব ক'টি চিহ্নিত কমিউনিস্ট

সোৎসাহে এসব ফুটবল টিম-এ যোগ দিচ্ছে। ব্যাপারটি খুবই স্পষ্ট। এদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যারা ফুটবলে একটি লাথিও কষতে পারবে না।'

তারপর এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আমরা তাহলে প্ল্যান টিইউ শুরু করে দিতে পারি। আমরা সবকিছু তৈরি করে রেখেছি।'

'টিইউ শুরু করুন।'

'ঠিক আছে।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফোন নাবিয়ে রাখার আগে আরেক মুহূর্ত থামেন। তিনি ততক্ষণে তাঁরই মস্তিষ্কজাত প্ল্যান টিইউ নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। এটি যে এক অভিনব চিন্তা, তা তিনি নিশ্চিত। তিনি অতি সতর্কভাবে এর সমস্ত খুঁটিনাটি চিন্তা করে রেখেছেন—যে কোনো পরিকল্পনার সাফল্যের চাবিকাঠি খুঁটিনাটি চিন্তা করা।

চরম খাদ্যাভাবের কারণে জনগণ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে দক্ষিণের এমন কোনো গ্রামে মার্কিন খাদ্যের চালান যাবে, কিন্তু কমিউনিস্টরা সে খাদ্য পুড়িয়ে ফেলবে। এ যে চরম ক্ষুধার্ত মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার শামিল! এমন নিষ্ঠুর কাজ কেন তারা করতে যাবে? ওরা যে কমিউনিস্ট, ওদের কাছে মানুষের জীবন গণ্য নয়। কারণ তারা চায় না জনগণ জানুক আমেরিকা দয়ার্দ্র, সদাশয়, আমেরিকা কাউকে না খেয়ে মরতে দিতে চায় না। এরপর এমন জঘন্য অপকর্মের হোতাদের বিরুদ্ধে সরকারকে একটি পদক্ষেপ তো নিতেই হবে।

এ হলো এক ঢিলে দুই পাখি শিকার। এর ফলে জনমনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগ্রত হবে।

তাছাড়া কমিউনিস্টরা বাদে আর কেউ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ওইসব স্থানে দ্রুত নতুন করে চালের বস্তা নিয়ে যাওয়া হবে এবং দুর্ভিক্ষকবলিত মানুষের জীবন রক্ষা করা হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহসা সামনে এগিয়ে গিয়ে একটি বোতামে চাপ দেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

বন্ধুসুলভ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে প্রধানমন্ত্রী তাকান আবদুর রবের দিকে। 'আশা করি আপনি সুখবর এনেছেন।'

'আমি আমার লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করলাম। কারো কারো সঙ্গে জেলে গিয়েও আলাপ করেছি। সিদ্ধান্ত একটি নেওয়া হয়েছে।'

তিনি থামলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর দিকে প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে থাকেন।

'আমার মনে হয়, শুনে আপনি খুশি হতে পারবেন না।'

প্রধানমন্ত্রীর চেহারায় নৈরাশ্যের ছায়া নেবে আসে। 'তার মানে, না?'

'বুঝিয়ে বলি।'

প্রধানমন্ত্রী সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, 'বুঝিয়ে বলার আর কী আছে?' তিনি আবদুর রবের দিকে একটি সংবাদপত্র বাড়িয়ে ধরেন। 'পড়েছেন? খাদ্যের বস্তা পুড়িয়ে ফেলার খবরটি?'

'পড়েছি। কিন্তু আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন। আমরা সরাসরি না বলছি না। আপনাকে আমরা সহযোগিতা করতে চাই, কিন্তু কিছু শর্তে।'

'শর্ত?' হতাশায় চিৎকার করে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী, 'কীসের শর্ত?'

আবদুর রব খানিক দ্বিধা করেন। 'শর্ত কী কী সেটি আপনার জানা থাকারই কথা। প্রথম শর্ত হলো, আপনাকে জনগণের দেওয়া রায় অনুযায়ী চলতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো...'

প্রধানমন্ত্রী হাত তুলে আবদুর রবকে থামিয়ে দেন। 'জনগণ! জনগণ! বলুন জনগণ কী জানে?' তিনি ভগ্নহৃদয় মানুষের মতো মাথা নাড়েন, 'না, দেশের পরিস্থিতি আপনি বুঝতেই পারছেন না।'

'জনগণ মনে করে', ডেস্কের ওপাশে বসা মানুষটির দিকে সরাসরি তাকিয়ে আবদুর রব বলে, 'এ পরিস্থিতির জন্য আপনিই দায়ী।'

'আমি জানি, কারা আমাকে দোষী মনে করে', প্রধানমন্ত্রী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দেন, 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বোঝে আমি দেশকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি।'

আবদুর রব উত্তর দেন না। কিছুক্ষণ পর শান্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে আপনার দূরদৃষ্টির অভাব আছে, দারুণ অভাব। আমাকে বোঝান দেখি, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি বরং বহু বছর ধরে এত সাহায্য-সহযোগিতা করে আসছে, তাদের তাড়িয়ে দিয়ে আমাদের কী লাভ? তারা এখন আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সব সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ করে দেবে, অথচ সাহায্য আমাদের ভীষণ দরকার। হ্যাঁ, বিপরীত শিবিরে আমরা যেতেই পারি। বহু দেশ এ কৌশল প্রয়োগ করছে। কিন্তু তারা কি নিজেদের জনগণ এবং গোটা বিশ্বকে ধোঁকা দিচ্ছে না? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক কি তারা আমাদের মতোই রাখছে না, শুধু নিরপেক্ষ নীতি মানার ভান করছে? একটি ব্যাপার নিশ্চিত : এরকম ভণিতা বেশি দূর বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আজ হোক, কাল হোক, এমন একটি সংকট দেখা দেবে যে আপনাকে মুখোশ খুলে ফেলতেই হবে। তখন আপনার প্রতারণা প্রকাশিত হয়ে যাবে। না, আমি মনে করি না এই মৌলিক সত্যটি এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় আছে যে, একটি ক্ষুদ্র পশ্চাৎপদ দেশকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে কোন পক্ষে যাবে এবং যে পক্ষে যাবে সে পক্ষেই তাকে অবিচল থাকতে হবে। আমি জানি, আপনি আমাকে বলবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজে নানা জায়গায় নিরপেক্ষতাবাদ বহাল থাকতে দিচ্ছে। তবে যেখানে তারা জানছে এটি একটি মুখোশ এবং এর পেছনে তাদের অনুকূলে একটি হাসি লুকানো আছে—শুধু সেখানেই তারা এ সহনশীলতা দেখাচ্ছে।'

'কেউ কেউ হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতারণা করতে বাধ্য হচ্ছে, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিরপেক্ষ থাকতে দিচ্ছে না। মনে মনে তারা সত্যিকারের স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই চায় না। কখনো কখনো বৃহৎ শক্তির সঙ্গে আপনাকে প্রতারণা করতে হবে। অন্যথায় সে আপনার কথা শুনবে না।'

'না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়া আমাদের চলবে না। তাছাড়া তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখেও আমরা স্বাধীন থাকতে পারি।'

এবার আবদুর রব নীরব থাকেন।

'আপনি হয়তো কথাটি বুঝতে পারছেন না', প্রধানমন্ত্রী আবার বলেন, 'আমি চাই আপনি আমাকে বোঝান, কেন আপনার মাথায় কথাটি ঢুকছে না।'

'উত্তর একটি আছে, কিন্তু সেটি সবসময় ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না। এটি শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করার ব্যাপার। অর্থাৎ কারো যদি আত্মমর্যাদা, গৌরববোধ ইত্যাদি থাকে, তাহলে।'

কয়েক মুহূর্ত প্রধানমন্ত্রী শূন্য চোখে ডেস্কের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'আমার হয়তো আত্মমর্যাদাবোধ নেই। দেশের স্বার্থে আমি সেটি ভুলে যেতে চাই। মানুষকে তো বাস্তববাদী হতে হবে।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর আবদুর রব বলেন, 'কোনো না কোনো প্রকার বন্দিদশা ছাড়া আমি আপনার কাছ থেকে এখন আর কিছু আশা করি না। গৃহবন্দি করে রাখবেন হয়তো, নতুবা জেলে পুরে রাখবেন।'

'আপনি কোনো বিকল্প রাখছেন না।'

'আমি সেটি বুঝি। তবে আপনার কাছে কি শেষ একটি আর্জি পেশ করতে পারি?'

প্রধানমন্ত্রী পরিশ্রান্ত চোখে তার দিকে তাকান।

'আপনার মার্কিন বন্ধুদের পরামর্শ দিন, ওরা যেন একটু দূরে দূরে থাকে। ওরা একেবারে আমাদের গা ঘেঁষে আছে। অন্তত ওরা বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে এই ভানটুকু তো

করতে পারে যে, আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেছে। দেশ তো এটুকুই চায়। এ প্রত্যাশাকে খাটো করবেন না।'

'দেশবাসী সেরকম কিছু চায় না। কমিউনিস্টরা আর আপনাদের মতো কিছু লোকজন, যারা ঠিকভাবে পরিস্থিতি বিচার করতে পারেন না, তাঁরাই শুধু এটি চান। আপনি এ দেশকে যতটা চেনেন, আমি তার চেয়ে কম চিনি না।'

২

'আপনাদের কাছে আমাদের আরেকটি আর্জি', রাষ্ট্রদূত হথর্ন পড়ে শোনান; তাঁর মসৃণ, আয়ত কপালে কুঞ্চন দেখা দেয়, 'কারণ আমরা জানি সরকার আমাদের বিরুদ্ধে আরো কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করতে যাচ্ছে এবং আমরা আশঙ্কা করছি সময়মতো তা প্রতিহত করা না হলে অত্যন্ত দুঃখজনক পরিণতি নেবে আসবে। আমরা আপনাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, কারণ আমাদের বিশ্বাস জনগণের আস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষমতায় আসা এ সরকারকে আপনারাই নিবৃত্ত করতে পারেন...'

রাষ্ট্রদূত চোখ তুলে কনডনের দিকে তাকান, 'সেই পুরনো কাসুন্দি।'

'হ্যাঁ, চর্বিতচর্বণ। তবে এবার একটু চালাকি করার চেষ্টা করেছে। ওরা বলছে, কমিউনিস্ট শব্দটি দিয়ে সাধারণত যা বোঝানো হয়, সে অর্থে ওরা কমিউনিস্ট নয়। তাছাড়া ওরা বলছে, কমিউনিস্টদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ওরা চালু করতে চায় এ জন্য যে সেটিই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করার একমাত্র পথ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ওদের কোনো বিরোধ নেই এবং এই চমৎকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে আমরা ওদের বাধা না দিলে আমাদের সঙ্গে ওরা স্বাভাবিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে।'

রাষ্ট্রদূত স্বাধীনতা দলের কাছ থেকে আসা চিঠিটি ডেস্কের ওপর ফেলে হাত ভাঁজ করেন। 'সরকার এখন করছে কী?'

'ধান-চাল পুড়িয়ে ফেলার ঘটনার মূল হোতাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। এ ঘটনায় সরকার খুবই মর্মাহত। সরকার বলছে, ক্ষুধার্তরা ভুখা থাকলে কমিউনিস্টদের লাভ। তারা আরো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারবে।'

ওল্টানো নৌকার মতো টেবিলের ওপর পড়ে থাকা চিঠিটির দিকে তাকিয়ে থাকেন রাষ্ট্রদূত। তারপর দৃষ্টি না তুলে বলেন, 'আমাদের লোক কিন্তু বলছে, এটি সাজানো ঘটনা হতে পারে। যদি তা হয়েও থাকে, সরকার ওয়াকিবহাল তারা কোন খেলায় মেতেছে।'

'কাজটি কারা করেছে বলা মুশকিল। আমাদের লোক শুধু অনুমান করছে। যাই হোক, কাজটি যদি সরকারও করে থাকে, তারা কাউকে বলবে না।'

'সে যাই হোক, আমি আশা করি কাজটি সরকার করেনি।' রাষ্ট্রদূত বলেন।

'হয়তো সরকারকেও কিছু কৌশল করতে হয়। চারিদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে তথাকথিত ফুটবল টিম, লাল-কমলারা সবাই খেলাধুলার দিকে ঝুঁকছে। তারা একটা কিছুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওরা আঘাত করার আগেই সরকারকে কিছু একটা করতে হবে।'

রাষ্ট্রদূত আরেকবার চিঠিটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁকে চিন্তামগ্ন দেখায়।

'দুশ্চিন্তার কিছু আছে বলে মনে হয় না', কনডন আশ্বস্ত করে। 'জরুরি খাদ্য সরবরাহ এভাবে পুড়িয়ে ফেলায় জনগণ কমিউনিস্টদের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। কমিউনিস্টদের নিন্দা জানিয়ে সারাদেশে সভা-সমাবেশ চলছে।'

'বুঝতে পারছি না, এর শেষ আসলে কোথায়। সরকার বলছে, চারা অবস্থাতেই বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলতে হবে, কিন্তু চারিদিকে আগাছার মতো চারা গজিয়ে উঠছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলার আর অন্য কোনো পথই কি ছিল না?'

রাষ্ট্রদূত যে ইদানীং খুব দোটানায় ভুগছেন, সে কথা কনডন জানে। রাষ্ট্রদূত স্থির করতে পারছেন না, আবদুল কাদেরের নিপীড়নমূলক নীতির কারণেই এত বিরোধী শক্তি তৈরি হচ্ছে, নাকি উল্টোটা—অর্থাৎ চারিদিকে এত বিষবৃক্ষের চারা দেখতে পেয়ে নিপীড়নের নীতি গ্রহণ না করে প্রধানমন্ত্রীর অন্য পথ খোলা ছিল কি না।

'হয়তো কোনো বিকল্প নেই', রাষ্ট্রদূত আবার বলেন। কমিউনিস্টরা অত্যন্ত কৌশলী ও ভয়ঙ্কর। তথাকথিত স্বাধীনতা দল, যারা নিজেরাই কমিউনিস্ট কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা স্বীকার করে, তারা কিনা তাঁরই কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে নিবৃত্ত করতে। আসলে তারা কী চায়? আবদুল কাদেরকে উৎখাত করার পর মার্কিনিদের বিতাড়িত করা কি তাহলে তাদের লক্ষ্য নয়? তিনি কি তাদের প্রতি নমনীয় হওয়ার জন্য আবদুল কাদেরকে অনুরোধ করবেন?

প্রসঙ্গ পাল্টে হ্থর্ন প্রশ্ন করেন, 'আমাদের নতুন কর্মসূচি কেমন চলছে?'

'চমৎকার। প্রধানমন্ত্রী উত্তরাঞ্চলে আরেকটি খাদ্য গুদাম নির্মাণের অনুমতি দিয়েছেন।'

রাষ্ট্রদূত অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়েন। সহসা তাঁর মাথায় অবকাশের চিন্তা উঁকি দেয়। ইদানীং এ দেশে নিজেকে তাঁর কেমন অপরিচিত মনে হয়। এখানকার কোনো কিছুর সঙ্গেই স্বদেশের কোনো মিল খুঁজে না পেলেও এতদিন এখানে কেমন একটা উষ্ণ আন্তরিকতা বোধ করে এসেছেন। এ উষ্ণতা মুছে যাচ্ছে। কাজকর্মে এখনো সেই একই ঘনিষ্ঠ, বন্ধুত্বপূর্ণ লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, বড় বাড়িটিতে একই অনুগত স্থানীয় ভৃত্য, তাঁর প্রতি তাদের যত্নে কোনো কমতি পড়েনি, তবু কী এক বিচিত্র অনুভূতি।

'আমি জানি, তিনি রাজি হবেন। হয়তো পরিস্থিতিটি তাঁকে শুধু ভালো করে বোঝানো হয়নি।'

কিন্তু তিনি ভাবেন : আবদুল কাদের নামক লোকটিকে তিনি সত্যি কি চেনেন? লোকটি কি আসলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু, নাকি নিজের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বের ভান করে?

আচ্ছা, অযথা তিলকে কেন তাল করছেন—নিজেকে তিনি ভর্ৎসনা করেন, তবে তাঁর চেহারায় কোনো ছাপ পড়ে না।

স্বাধীনতা দলের অনুরোধ সংবলিত চিঠিটি তিনি কনডনের কাছে হস্তান্তর করে বলেন, 'আমার খুব ছুটি নেওয়া দরকার।'

তৃতীয় অধ্যায়

১

জনসংখ্যার ভারে উপচে পড়া দক্ষিণাঞ্চলে দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে তারানি একখানি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়ার কারণে গ্রামটি আকারে বড় ও সমৃদ্ধ। এ অঞ্চলে উৎপন্ন ধান এবং আশপাশের গ্রামগুলিতে তৈরি তাঁতবস্ত্র, মাদুর ও মাটির তৈজসপত্র এ গ্রামের ভেতর দিয়ে চালান হয়। ব্যবসা মৌসুমে দুই নদীতে বিচিত্র রঙের পালতোলা নৌকা গিজগিজ করে।

সেদিন সকালে প্রায় দুর্ভিক্ষের ছায়ার নিচে গ্রামখানি কেমন নির্জীবভাবে ঝিমায়, জনশূন্য হাট-বাজারে নেড়িকুকুর শুধু লেজ নাড়ে। আটটার দিকে সহসা প্রবল সাড়াশব্দে গ্রামটির নিদ্রাভঙ্গ ঘটে। প্রথমে ঢোকে সশস্ত্র পুলিশ বোঝাই কয়েকটি ট্রাক। সরু কাঁচা রাস্তায় সেগুলির চাকার ধুলো শান্ত হতে না হতে উদ্‌গ্রীব প্রামাণ্যচিত্রকার, আলোকচিত্রী ও কারিগরি লোকজন বহনকারী একটি ভ্যান আসে। এরপর দুটি জিপে কিছু বিদেশী ও স্থানীয় সাংবাদিক। সকালবেলা উৎসুক গ্রামবাসীর মনে বিস্ময় জাগানোর জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল। তবে রাস্তার বাঁকে তারা আরো একটি মোটরগাড়ির অস্থির ভেঁপু শুনতে পায়। শীঘ্রই আরো কিছু প্রামাণ্যচিত্রকার ও কারিগরি লোকজনবাহী ইউসিসের একটি ভ্যান তাদের দিকে ছুটে আসে। আরো কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা এবং মার্কিন চালবাহী গাড়িবহর আসা বাকি। এক হিসেবে গাড়িবহর এসেই গেছে। আগেভাগে যাত্রা শুরু করার কারণে সেটিকে এখন দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে মাইলখানেক উজানে, সেটি প্রহর গুনছে যথাসময়ে আনুষ্ঠানিক অনুপ্রবেশের অপেক্ষায়।

'আসুন পোড়ানো চালাঘরটি দেখে আসা যাক', এক সাংবাদিক প্রস্তাব রাখে।

কয়েকজন প্রামাণ্যচিত্রকার প্রস্তাবটি লুফে নেয়।

'সেটি কোথায়?'

মনমরা এক গ্রামবাসী নদীর দিকে আঙুল নির্দেশ করে।

শীঘ্রই লম্বা চালাঘর তাদের চোখে পড়ে, এখন পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। আগুনে পোড়া বাঁশ, কাঠ, চটের বস্তা এবং পোড়া চালের গন্ধে বাতাস এখনো ভারী। ফটোগ্রাফার ও ফিল্মম্যানদের ক্যামেরায় শব্দ ওঠে।

কিছু কৌতূহলী গ্রামবাসী তাদের অনুসরণ করে এসেছে। টেপরেকর্ডার বহনকারী এক মার্কিন সাংবাদিকের চোখ যায় পেটা গড়নের এক যুবকের ওপর। সে ইশারায় স্থানীয় এক সাংবাদিককে ডেকে বলে, 'ওকে জিজ্ঞাসা করো এ ঘটনায় ওর অনুভূতি কী?'

যুবকের দিকে সব ক'টি ক্যামেরা ফেরে। তার চিবুকের নিচে মাইক্রোফোন বাড়িয়ে ধরে বিদেশী সাংবাদিক। যুবক একবার ক্যামেরা আরেকবার সাংবাদিকদের দিকে তাকায়, কোনো কথা বলে না।

'গ্রামের লোকেরা অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলে না', কেউ একজন মন্তব্য করে।

'আরে না। ওর তো লজ্জা পেলে চলবে না। দেখো ওর চোখ জ্বলজ্বল করছে। বলাও, ওকে কথা বলাও।'

'ও কথা বলবে না।'

'এতে হয়তো কাজ হবে', বিদেশী সাংবাদিক পকেট হাতড়ে কিছু খুচরো পয়সা বের করে, 'নাও, এগুলি তোমার।'

বাড়িয়ে ধরা হাতের খুচরো পয়সাগুলির দিকে যুবক চেয়ে থাকে, সেগুলি নেওয়ার জন্য নড়ে না।

'কাজ হবে না', স্থানীয় সাংবাদিক বলে। 'ওকে ওর গ্রামের লোকজনের কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে। এই কেমন দিনকাল যাচ্ছে ওদের, এইসব আর কী।'

'গুড আইডিয়া। জিজ্ঞাসা করো।'

জিজ্ঞাসা করা হলো, কিন্তু যুবক তবু নিশ্চুপ।

'লোকটি কালা।'

'এই, তুমিও কি বধির নাকি?' বিদেশী সাংবাদিক দাড়িওয়ালা এক মধ্যবয়স্ক গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করে। তার কোমরের ওপরে কোনো বস্ত্র নেই, পাজরের সবগুলি হাড় দৃশ্যমান।

'ওকে জিজ্ঞাসা করো : চাল পুড়িয়ে ফেলার ঘটনায় ও কী মনে করছে?'

প্রশ্নটি অনুবাদ করে শোনানো হলে লোকটি মুখ ফিরিয়ে শব্দ করে মাটিতে থুথু ফেলে।

'হ্যাঁ, এবার জবাব দিয়েছে', স্থানীয় সাংবাদিক বিজয়ী কণ্ঠে ঘোষণা করে।

'চালিয়ে যাও। জিজ্ঞাসা করো, আগুন কে দিয়েছে?'

'চাল কে পুড়িয়েছে' স্থানীয় সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। লোকটি চোখ পিটপিট করে। সম্ভবত সে সন্ত্রস্তবোধ করে।

'ভয় পেয়ো না। আমাদের বলো।' ক্যামেরা এগিয়ে আসে। বিদেশী সাংবাদিক গ্রামবাসীর হাতে খুচরো পয়সা গুঁজে দেয়।

'তোমরা কি ক্ষুধার্ত নও? যেসব চাল পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, সেগুলি তুমি ও তোমার পরিবারের কাজে লাগত না?'

লোকটি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

'বলো দেখি, কারা চাল পুড়িয়েছে?'

কিছুক্ষণ পর স্থানীয় সাংবাদিক মাথা ঝাঁকায়, 'কাজ হচ্ছে না। লোকজনের নাম জানলে সে হয়তো বলত। কিন্তু আপনারা যে শব্দটি শুনতে চাচ্ছেন সেটি ওর পেট থেকে বেরোবে না। ওরা ওই শব্দটি শোনেনি।'

টেপরেকর্ডারবাহী বিদেশী সাংবাদিক স্তম্ভিত ভঙ্গিতে তাকায়। 'তার মানে এ লোক কমিউনিস্ট শব্দটি বলতে পারবে না?'

'না, পারবে না। তবে চিন্তা করবেন না। পারবে এমন কাউকে শীঘ্র বের করে ফেলব।'

বিদেশী সাংবাদিকের চেহারায় তীব্র হতাশার ছায়া পড়ে। তারপর তার মাথায় একটি নতুন বুদ্ধি খেলে যায়। সন্দিহান চোখে পয়সাগুলি গুনতে থাকা গ্রামবাসীটির দিকে ফিরে সে জিজ্ঞাসা করে, 'চালগুলি কে দিয়েছিল?'

গ্রামবাসীর চোখে মৃদু হাসি উঁকি দেয়, তাকে আরো কুৎসিত দেখায়। তারপর সে কিছু একটা বলে।

'কী বলল?'

'সে বলল, সরকার দিয়েছিল। এখন ওকে জিজ্ঞাসা করবেন না কোন সরকার।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে বিদেশী সাংবাদিক বলে, 'কী বললে? তার মানে, ও জানে না কারা চাল দিয়েছে?' সে ঝট করে গ্রামবাসীর দিকে ফিরে বলে, 'জিজ্ঞাসা করো, আমেরিকার নাম ও শুনেছে কি না?'

এ প্রশ্ন শুনে গ্রামবাসীর চেহারা কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, যাতে অন্তত বোঝা যায় নামটি সে একবারও শোনেনি তা নয়। অবশেষে উৎফুল্লভাবে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে এবং আরেকবার সেই কদাকার হাসি দেখা দেয়।

'লোকটি শুনেছে।'

বিদেশী সাংবাদিকের কণ্ঠে অনুনয়, 'ওকে বলো, আমেরিকানরা ওই চাল দিয়েছিল, কমিউনিস্টরা তা পুড়িয়ে দিয়েছে।' কথাটি অনুবাদ করার আগেই সে নিজে গ্রামবাসীর দিকে ফিরে বলে, 'কমিউনিস্ট, শব্দটি ভালো করে শোনো, কমিউনিস্ট, ক-মি-উ-নি-স্ট। বুঝেছ?'

২

মার্কিন কনসাল অস্থির হয়ে পড়েন। তার পাশে বসা দুর্বল দৃষ্টিশক্তির কর্মকর্তাটি রাস্তার মোড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। চালবাহী কোনো গাড়িবহরের চিহ্ন নেই।

'আসছে না কেন?' কর্মকর্তা বিরক্ত স্বরে বলে, 'আমরা যখন ওটিকে পেরিয়ে আসি, তখন তো রওনা দেবে দেবে করছিল।'

মার্কিন কনসালের মাথায় ঢুকছে না, গাড়ির বহর গ্রামের এক মাইল বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখার কোন দরকার ছিল। তিনি বিড়বিড় করে বলেন, 'আমরা আসার আগেই ওগুলি এখানে এনে রাখলে কী সমস্যা ছিল?'

কর্মকর্তাটি ঈষৎ অপ্রস্তুতবোধ করে। 'কে যে বুদ্ধিটি বের করল। ভেবেছে, আমরা সবাই বসে-টসে গেলে তারপর যদি ট্রাক আসে তাহলে জনগণের মধ্যে প্রভাব পড়বে। গ্রামবাসীরা নাটকীয় কিছু দেখতে চায়, জানেন তো!'

মার্কিন কনসাল জবাব দেন না। ব্যাপারটি নিয়ে তিনি বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন না। তিনি চত্বরের মাটিতে পা গুটিয়ে বসে থাকা গ্রামবাসীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেখানে ওরা বসে আছে, সেখানে মাথার ওপর কোনো আচ্ছাদন নেই, রোদের তেজ ইতিমধ্যে বেড়ে গেছে, তাদের গরম লাগতে শুরু করেছে।

'আমরা বোধহয় ভাষণ শুরু করে দিতে পারি', কর্মকর্তা বলে।

'ঠিক আছে।'

'চাল এসে পড়লে নিঃসন্দেহে বক্তৃতাগুলি আরো জোরালো শোনাত।'

'সেক্ষেত্রে আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে দেখা যাক।'

কর্মকর্তা এসে খুশি হয়। বোঝা যায়, চালবাহী গাড়িবহরের নাটকীয় প্রবেশের পরিকল্পনায় তার সায় ছিল। সে সাব্যস্ত করে, ইত্যবসরে গ্রামবাসীদের স্লোগান দেওয়ার কাজে ব্যস্ত রাখবে। যুবকমতো একজনকে আঙুলের ইশারা করতে সে শ্রোতাদের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গলা সপ্তমে চড়িয়ে চিৎকার দেয় : 'প্রধানমন্ত্রী আবদুল কাদের জিন্দাবাদ।'

আরো কয়েকজন একই স্লোগান ধরে।

'আমেরিকা জিন্দাবাদ।'

'আমেরিকা জিন্দাবাদ।'

'আমাদের চাল দিচ্ছে কারা?'

'আমেরিকা।'

'চাল পোড়ায় কে?'

'কমিউনিস্ট।'

কর্মকর্তা উদ্বিগ্ন চোখে রাস্তার দিকে তাকায়। গাড়িবহরের এখনো কোনো চিহ্ন নেই।

'গিয়ে একবার দেখে আসো না', সহকারীর ওপর সে চোটপাট করে। সহসা একটি জিপ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায়।

'আমাদের বন্ধু কারা?' যুবক চেঁচায়।

'আমেরিকা, আমেরিকা।' সমবেত কণ্ঠে জবাব আসে।

'আমাদের শত্রু কারা?'

'কমিউনিস্ট, কমিউনিস্ট।'

টেপরেকর্ডার-বহনকারী বিদেশী সাংবাদিক বিরস বদনে পার্শ্ববর্তী স্থানীয় সাংবাদিকের কানে ফিসফিস করে বলে, 'কোনো লাভ নেই, কমিউনিস্ট জিনিসটি কী এরা তা-ই জানে না। তাহলে নাম ধরে বলছে না কেন. স্বাধীনতা দল না কী যেন নাম?'

'আমার মনে হচ্ছে, যন্ত্রপাতিতে হয়তো গোলমাল হয়েছে', কর্মকর্তা বলে।

কনসাল অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলেন, 'গাড়িগুলি আমাদের আগেই এনে রাখা উচিত ছিল।'

শ্রোতারা স্পষ্টত অস্থির হয়ে উঠছে। কনসাল কিছুক্ষণ তা লক্ষ করে কর্মকর্তার দিকে ঝুঁকে বলেন, 'ওরা চাল নিয়ে কোনো ঝামেলা পাকিয়ে ফেলেছে মনে হচ্ছে না তো আপনার?'

কথাটি কর্মকর্তার একেবারে বিশ্বাস হতে চায় না। 'সাহস পাবে না। রাতের আঁধারে ছাউনিতে আগুন দেওয়া এক কথা আর দিনের আলোয় ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে বাহাদুরি দেখানো আরেক কথা। ওরা বোকার মতো কিছু করার চেষ্টা করলে মানুষেরা ওদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। নিশ্চয়ই কোনো যান্ত্রিক গোলযোগে পড়েছে।'

জিপ প্রত্যাবর্তন করে ভয়ঙ্কর শব্দ করে ব্রেক কষে। সহকারী লাফ দিয়ে নেবে কর্মকর্তার দিকে ছুটে যায়।

'ট্রাক নড়তে পারছে না', সে জানায়।

'কেন? যান্ত্রিক গোলমাল?'

'না। মানুষজন ওদের সামনে পিকেটিং করছে।'

প্রথমে নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে কর্মকর্তার কষ্ট হয়। সে যেন কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে উঠতে যায়। কিন্তু সহসা উঠে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার গলায় বলে, 'পুলিশ ডাকো, পিকেটারদের রাস্তা থেকে হটিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করানোর ব্যবস্থা নাও।'

চত্বরে দাঁড়ানো পুলিশ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের গাড়িতে উঠে ছুটে বেরিয়ে যায়। কর্মকর্তা বসে থাকে, বাইরে থেকে তাকে শান্ত দেখালেও ভেতরে ভেতরে সে ক্রোধে টগবগ করে। এক সময় কিছুটা শান্ত হলে তার মাথায় একটি চিন্তা উঁকি দেয়। পুলিশ পাঠানো কি ঠিক হলো? শীঘ্রই সে চিন্তাটি ঝেড়ে ফেলে। অপেক্ষমাণ শান্ত জনতার দিকে তাকিয়ে আশ্বস্তবোধ করে।

তখন একটি ব্যাপার ঘটে। দর্শকদের মধ্যে থেকে এক লোক ছুটে বেরিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে, 'চাল পুড়িয়েছে কে?'

কয়েকজন সমস্বরে বলে ওঠে, 'সরকার, সরকার।'

'এটা কী?' স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন কনসাল। কেউ উত্তর দেয় না, নিজেও তিনি কোনো উত্তরের অপেক্ষা করেন না, কারণ ততক্ষণে দর্শকদের মধ্যে হট্টগোল বেঁধে গেছে। ঘটনার মাথামুণ্ডু অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে কর্মকর্তা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তাকে বাক্‌রুদ্ধ মনে হয়, কারণ সে শোরগোল ও পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত মানুষজনের দিকে অপলকে চেয়ে থাকে। কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়ে দেখে তার কথা শোনার কেউ নেই। তারপর কয়েকটি ছেলে তার ও মার্কিন কনসালের চেয়ারের কাছে আসে। কর্মকর্তাকে উপেক্ষা করে তাদের একজন কনসালকে বলে, 'আপনি বরং তাড়াতাড়ি জায়গাটি ত্যাগ করুন। এ গ্রাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আরেকটি পথ আছে।'

'বাজে কথা, আমরা চলে যাব কেন?' কর্মকর্তা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, কিন্তু লোকগুলি তার কথায় কর্ণপাত করে না।

'পুলিশের ফিরে আসার সম্ভাবনা কম', লোকটি কনসালকে বলতে থাকে। 'যদি তারা ফিরেও আসে মারামারি বাধবে। আমরা অন্যান্য অতিথিদেরও চলে যাওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

'এত বাজে কথা জীবনে শুনিনি', কর্মকর্তা গর্জন করে, 'চালিয়াতি করা হচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ ফিরে এসে তোমাদের শিক্ষা দিয়ে দেবে।'

মার্কিন কনসাল লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি এভাবে পালিয়ে যেতে পারি না। এসবের অর্থ কী?'

'আমাদের হাতে অতশত ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় নেই', লোকটি উত্তর দেয়। 'দয়া করে এখন চলে যান। আপনাদের কিছু হোক আমরা সেটি চাই না। ওই যে লোকজন ছুটে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন? ওরা পুলিশকে ঠেকিয়ে রাখবে।' কনসাল সম্ভবত পরিস্থিতি বোঝার জন্যই চতুর্দিকে তাকান, তারপর কর্মকর্তার দিকে ফেরেন।

'তিনি কোথাও যাচ্ছেন না', লোকটি কর্মকর্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'আমরা তাকে রেখে দিচ্ছি।'

কনসাল কর্মকর্তাটির দিকে তাকান। কর্মকর্তা এ লোকের কথায় বিশ্বাস না করে সভাস্থল ছেড়ে না যাওয়ার জন্য অনুনয় করে। 'আমি বলছি, এটি একটি চালিয়াতি। এরা শুধু আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে।'

'তার কথা শুনলে কিন্তু ভুল করবেন। আপনার কিছু হলেও তার কিছু যায় আসে না। কারণ তিনি আমাদের ওপর দোষ চাপাতে পারবেন।'

কনসাল কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর আচম্বিতে বলেন, 'আমি যাচ্ছি। তবে আমার লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে দিন। ওদেরও যেতে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

তিনি যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই কর্মকর্তা লাফিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পথরোধ করে, তবে লোকগুলির মধ্য থেকে কয়েকজন তাকে দ্রুত ঘিরে ধরে। ঈষৎ অপ্রস্তুত কনসাল আটক কর্মকর্তার দিকে সামান্য ঘোরেন, তারপর তার উদ্দেশে হাত নাড়েন। হাত নাড়তে গিয়ে তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। তিনি আর ফিরে তাকান না।

তিনি গাড়িতে উঠলে জানালাপথে এক যুবক বলে, 'চিন্তা করবেন না, ড্রাইভার রাস্তা চেনে।'

গাড়ি চলতে শুরু করলে কনসালের মনে নানারকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তার কি চলে যাওয়া উচিত হচ্ছে? এ পরিস্থিতিতে অন্য কোনো বিদেশী হলে কী করত? তিনি চত্বরের দিকে তাকান। লোকজনের ভিড় অনেক কমে গেছে, হট্টগোলও তেমন নেই। হয়তো গ্রামবাসী ঘরে ফিরে গেছে। হতে পারে পুরোটাই একটি ধাপ্পা।

গাড়ি চত্বর ত্যাগ করার আগ মুহূর্তে পেছন থেকে আর্তচিৎকার ভেসে আসে। তিনি পেছনের জানালাপথে তাকিয়ে দেখতে পান, কর্মকর্তা পেছন পেছন দৌড়ে আসার চেষ্টা করছে। তার জামাকাপড় আলুথালু, একটু আগের কর্তৃত্বপরায়ণ চোখে উন্মাদের মতো চাহনি।

'থামো!' কনসাল চালককে নির্দেশ দেন।

কিন্তু ততক্ষণে লোকটি কর্মকর্তাকে আবার ধরে ফেলেছে। ছোটখাটো লোকটিকে আর দেখা যাচ্ছে না।

তার গাড়ি থেমেছে দেখে লোকগুলির মধ্যে একজন এগিয়ে আসে।

'তোমরা তাকে নিয়ে কী করতে চাও?' কনসাল জিজ্ঞাসা করেন।

'চাল পুড়িয়ে ফেলার জন্য তার বিচার করা হবে। আমার ধারণা, আপনি চেষ্টা করলেও তা ঠেকাতে পারবেন না। কাজেই দয়া করে এখন যান।'

কনসালের গাড়ি আবার চলতে শুরু করলে এবার আর থামে না।

চতুর্থ অধ্যায়

১

'হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি', রাজধানী থেকে ফোন করা আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে কনসাল বলেন, তার কেমন আশ্বস্ত বোধ হয়। 'কেবলমাত্র পৌঁছেছি। দু-এক মিনিটের মধ্যে আমিই ফোন করতাম।'

ফিরে আসার পর থেকে নিজের আচরণ নিয়ে যত ভাবছেন, তত ঘোলাটে লাগছে। এভাবে তাঁর পালিয়ে আসার মতো কোনো ভয়ঙ্কর কিছু কি ছিল পুরো ঘটনাটিতে? যে লোকগুলি তাঁকে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়, হতে পারে তারা ভাঁওতাবাজি করেছে। হয়তো পুলিশ প্রত্যাবর্তন করলে যারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা ভাবছিল তাদের ওরা হতোদ্যম করতে চেয়েছে। মার্কিন কনসাল নিজেই যেখানে পালিয়ে যান, সেখানে লড়াই করার আর কী যুক্তি থাকতে পারে? তাঁর হয়তো আরো কিছুক্ষণ জোর করে থেকে যাওয়া উচিত ছিল, থেকে গিয়ে হয়রানি ও জবরদস্তির হাত থেকে কর্মকর্তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত ছিল। আবার এও মনে হচ্ছে, ঘটনাস্থল ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে : থেকে গিয়ে হয়তো তেমন কিছুই করা যেত না, তদুপরি নিজের জীবনই হয়তো বিপন্ন করে তোলা হতো।

'পরিস্থিতি গুরুতর মনে হচ্ছে', তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন। 'স্বীকার করছি ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু যত ভাবছি ততই দেখছি পুরো ঘটনাটি এমন হুড়মুড় করে ঘটে যাওয়ার মধ্যে কেমন যেন এক অশুভ ব্যাপার ছিল। হয়তো সে কারণেই চলে আসতে বাধ্য হয়ে থাকব। এক মিনিট আগেই তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে উৎফুল্ল স্লোগান দিয়েছে, পরমুহূর্তে একেবারে ভোল পাল্টে গেল। সে যে কী বিস্ময়কর স্লোগান। কী বুঝতে পারছেন এ থেকে? পারছেন কিছু?'

কনসাল কানের ওপর টেলিফোন ঠেসে ধরেন, যেন রাষ্ট্রদূতের কথা শুনতে পাচ্ছেন না। তারপর তিনি টেলিফোনের পাশে সোফায় উপবিষ্ট তাঁর স্ত্রীর দিকে ফিরে বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলেছে।'

স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া শোনার অপেক্ষা না করে তিনি আবার টেলিফোনে মনোযোগ দেন, 'এসবের মানে কী?'

রাষ্ট্রদূত এর উত্তর জানেন না, শুধু জানেন এটিকে সরকারের বিরুদ্ধে একটি সংঘবদ্ধ ও পরিকল্পিত সহিংসতা বলে মনে করা হচ্ছে। আরো তথ্য পেলে তিনি জানানোর আশ্বাস দেন।

টেলিফোন রাখার আগে রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আমি আপনাকে সন্ত্রস্ত করতে চাই না। তবে শহরের ম্যাজিস্ট্রেটকে অবশ্যই জানিয়ে রাখুন। প্রয়োজন মনে করলে তিনি হয়তো আপনার বাড়িতে কয়েকজন প্রহরী মোতায়েন করতে পারেন।'

'এখানে এখনো তেমন কিছু চোখে পড়েনি। গাড়িতে ফেরার পথে তো সবকিছু স্বাভাবিক মনে হলো।'

'ভালো। তবে জানিয়ে রাখতে তো দোষ নেই।'

'রাখব, ধন্যবাদ।'

টেলিফোন রেখে দিয়ে ঘরের ভেতর তিনি কিছুক্ষণ দ্রুত পায়চারি করেন। তারপর জানালার বাইরে রাস্তার দিকে তাকান। শহরের এই অংশে গাড়িঘোড়া চলাচল সব সময় কম। একটি গাড়িকে তিনি অলসভঙ্গিতে চলে যেতে দেখেন, তারপর কয়েকটি সাইকেল, তারপর ঠেলাওয়ালা এক হকার। কোথাও বিন্দুমাত্র ঝামেলার চিহ্ন নেই, শহর বরাবরের মতো শান্ত।

অবশেষে স্ত্রীর প্রশ্ন তাঁর কানে প্রবেশ করে, স্ত্রী হয়তো আর্তনাদ করে থাকবে। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে কয়েকবার সে প্রশ্নটি করেছে।

'ব্যাপার কী, হানি? কী হয়েছে?'

স্ত্রীর দিকে সম্পূর্ণ ফিরে তিনি তার উদ্বিগ্ন চোখ দেখতে পান।

'একটু ঝামেলা', তিনি অস্পষ্টভাবে বলেন, 'মনে হচ্ছে, আজ সকালে যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে দাঙ্গা জাতীয় কিছু হয়েছে।'

'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যাপারটি কী?'

কনসাল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বেশি কিছু বলবেন না সাব্যস্ত করেন। 'সেটি রাজধানীতে। কেউ তাকে খুন করেছে।'

মাত্র কয়েক মাস আগে তাঁর স্ত্রী এ শহরে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। ছোট্ট শহরটিতে তারা ছাড়া আরেক মার্কিন দম্পতি, এক ইংরেজ মিশনারি ও এক বিতর্কিত পরিচয়ের ওলন্দাজ নাগরিকের বসবাস। তার স্ত্রীর কাছে এ শহর এক প্রত্যন্ত রহস্যময় স্থান।

'সামান্য একটু ঝামেলা', কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে তিনি বলেন, 'ঘাবড়ানোর তেমন কিছু নেই।'

তিনি সাব্যস্ত করেন, ম্যাজিস্ট্রেটকে ফোন করতে হলে অফিস থেকে করবেন।

তবে কয়েক মিনিট পর ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই ফোন করেন। তিনি উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন। 'আপনি নিরাপদে ফিরেছেন জেনে খুশি হলাম। আপনাকে নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। চারদিকে কী কী সব গুজব।'

'ফিরতে অনেক সময় লেগেছে', কনসাল বলেন, 'সোজা রাস্তা ধরে আসতে পারিনি।' স্ত্রীর উদ্গ্রীব চোখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তিনি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেন, 'পরিস্থিতি কী?'

'এখানে কোনো ঝামেলা নেই। তবু ভাবছি আপনার বাড়িতে কয়েকজন প্রহরী পাঠিয়ে দিই।'

'দরকার আছে কি?'

'আপনার নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব আমাদের', ম্যাজিস্ট্রেট ঈষৎ গৌরবময় কণ্ঠে বলেন।

স্থির হয় যথাশীঘ্র প্রহরী পাঠানো হবে। কনসাল ভাবেন, বাড়ির বাইরে যদি প্রহরী দাঁড়ানো থাকে, তাহলে তিনি অফিসে গেলেও তাঁর স্ত্রী নিরাপদ বোধ করবে।

'দুশ্চিন্তার কিচ্ছু নেই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বুদ্ধি আর কি।' তিনি স্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন।

কিছুক্ষণ পর আবার টেলিফোন বাজে। কনসাল ক্ষিপ্রবেগে ফোন তুলে কয়েক মুহূর্ত শোনেন। দূতাবাস থেকে ফোন।

'না', তিনি বলেন, 'আমি তাকে দেখিনি। কী নাম বললেন? জনসন? আবেল জনসন? পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, গাট্টাগোট্টা? গোলগাল মুখ, চুল কম? না, আমার পাশে আর দুজন মাত্র আমেরিকান ছিল, একজন সাংবাদিক, অন্যজন আমাদেরই ইউসিসের লোক। এ রকম চেহারার কেউ ছিল না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। সে যদি পরে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই ঝামেলা দেখতে পেয়ে ফিরে গেছে। এতক্ষণে হয়তো ফিরতি পথে। ছোট ইংলিশ কারে সরকারি তথ্য বিভাগের একজনের সঙ্গে যাচ্ছিল? না, তাদেরকে একবারও দেখিনি। আমি নিশ্চিত, তারা এখন ফেরার পথে। যাই হোক, ওরা ওই জাহান্নামের গ্রামে যায়নি।'

ফোন রেখে দেওয়ার পর চোখে স্পষ্ট ফুটে ওঠা আতঙ্কের ছাপ লুকানোর উদ্দেশ্যে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, 'ওরা তাহলে একজন মার্কিনিকেও খুন করেছে?'

কনসাল নিজের জন্য কড়া হুইস্কি ঢালেন। পানপাত্র ঠোঁটে ছোঁয়ানোর সময় তাঁর মনে পড়ে স্ত্রী কিছু একটা জিজ্ঞাসা করেছে।

'এটি কোনো প্রশ্ন হলো? তাকে মারতে যাবে কেন?' তিনি রাগতস্বরে জবাব দেন।

শীঘ্রই পুলিশের ভারী একটি গাড়ি এসে থামে, চারজন প্রহরী মোতায়েন হয়। তার স্ত্রী জানালায় উঁকি দিয়ে তাদের দেখে নিয়ে স্বামীর দিকে তাকায়। 'ব্যাপারটি আমার পছন্দ হলো না, কেমন বন্দি-বন্দি লাগছে।'

'বললাম তো, ভয় পাওয়ার কিছু নেই', তিনি বলেন। 'তাছাড়া ওরা আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। এত সাহস পাবে না।'

তাঁর স্ত্রী চোখ বন্ধ করে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু অচিরেই সে নানারকম মুখ দেখতে থাকে : অনন্ত ক্রোধে নিষ্ঠুর চেহারা নেওয়া মুখ একটি দুটি নয়, অনেক মুখ, সবগুলি তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে নগ্ন হিংস্রতা চকচক করে ওঠে, ঘৃণায় বিকৃত ঠোঁট।

'দুশ্চিন্তা কোরো না', তিনি আবার বলেন, তবে এবার তার গলা নরম, আদুরে। 'তাছাড়া এখানকার লোকজন আছে আমাদের সঙ্গে। গুটিকয়েক কমিউনিস্ট হয়তো ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সবাই আমাদের সঙ্গে আছে।'

তাঁর স্ত্রী যেন শোনে না। সে চোখে এখনো নানা চেহারা ভেসে বেড়ায়, এতক্ষণে চেহারাগুলি এক রহস্যময় উপায়ে উর্দি পরে ফেলেছে, হাতে বন্দুক, বাইরে দাঁড়ানো প্রহরীদের মতো।

নিজের সন্ত্রস্ত মনের সঙ্গে সে তর্কে লিপ্ত হয় এবং শেষে এই ভেবে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করে যে, তার স্বামী যেমনটা বলেছে, স্থানীয় লোকজনের বেশিরভাগই

আমেরিকানদের পক্ষে এবং এ কারণে এমনকি এই বিচিত্র, পাণ্ডববর্জিত স্থানেও দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু এ যুক্তি এত দুর্বল ও এমনকি অর্থহীন মনে হয় যে, এতে ভয় দূর হয় না। স্থানীয় জনগণ মার্কিনিদের পক্ষে আছে, কথাটির অর্থ কী? যে মার্কিনিদের সঙ্গে ওদের এত অমিল, কী করে ওদের পক্ষে সে মার্কিনিদের গ্রহণ করা সম্ভব? তাছাড়া দুটি জাতি কেবল তখনই বন্ধু হতে পারে যখন তাদের পরস্পরের প্রতি আস্থার জায়গা থাকে, কিন্তু মার্কিনিরা কী করে ওদের ওপর আস্থা রাখবে, এমনকি যারা ধোপদুরস্ত পোশাক পরে এবং বাসায় মার্কিন যন্ত্রপাতি রাখতে পছন্দ করে তাদেরও কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বাস করে? নিজের দেশে মার্কিনিরা এমনকি অপরিচিত প্রতিবেশীকেও বিশ্বাস করতে পারে; ডাকপিয়ন, কলওয়ালা, এমনকি ক্লাবে দেখা হওয়া আড্ডাবাজ মেয়ে মানুষের ওপরও আস্থা স্থাপন করতে পারে, কারণ তারা একই জাতি, একই জীবনযাত্রা। কিন্তু এখানে মার্কিনিদের সঙ্গে স্থানীয়দের মিলটি কোথায়? বাইরের প্রহরীদের কেউ একজন ছুটে এসে যে তাদের দিকে স্টেনগান তাক করবে না, তা কে বলতে পারে?

'আশা করি ওরা রাতেও এখানে থাকবে না', কনসালের স্ত্রী ক্ষীণ স্বরে বলে। 'ওরা বাড়ি ঘিরে রাখলে আমি ঘুমাতে পারব না।'

'আরে, তোমাকে বললাম তো ঘাবড়ানোর কিছু নেই', স্বামী রাগত স্বরে বলে।

কিছুক্ষণ পর তার স্ত্রী সহসা মৃদু হেসে বলে, 'আমি অতো নির্বোধ নই। আমি ঠিক হয়ে যাব।'

তার স্ত্রী চোরা চোখে জানালার দিকে তাকিয়ে সেখানে কৃষ্ণবর্ণ শয়তানের মুখ দেখতে না পেয়ে যেন ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ন হয়।

২

যথাসময়ে গ্রাম্য চত্বর থেকে বেরিয়ে যেতে পারায় মার্কিন কনসাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ওখানে শেষ পর্যন্ত কী কী ঘটেছে তা বিস্তারিত জানতে পারলে তিনি আরো স্বস্তি পেতেন। ফোনে যা শুনেছেন তা রাজধানীতে পৌঁছানো কিছু টুকরো খবর। পুলিশ সব তথ্য পেলেও মার্কিনিদের সবকিছু জানাচ্ছে না। যেমন তারা জানায়নি পিকেটারদের অপসারণ ও গ্রেপ্তার করতে যাওয়া পুলিশের ওপর কী করে মাছ ধরার কোঁচ, সড়কি, চাকু এবং পিস্তলধারী বিপুলসংখ্যক লোক অতর্কিতে হামলা চালায় এবং পুলিশ আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানালে কী এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে উভয়পক্ষে বিপুলসংখ্যক লোক হতাহত হয়। সেখানে নতুন করে সশস্ত্র পুলিশ পাঠানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে ভালো কিছু অস্ত্র হাতে পাওয়ায় গ্রামবাসীও প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ছোট ছোট খাল-খন্দ এবং সেগুলির ওপর স্থাপিত ব্রিজ নড়বড়ে অযোগ্য হওয়ায় গ্রামবাসী সুবিধা পাচ্ছে। তারা পুলিশকে প্রতিরোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

দক্ষিণাঞ্চল থেকে প্রাপ্ত এসব টুকরো তথ্য একত্রে মেলানোর পর পুলিশ সদর দপ্তরের ঔপনিবেশিক আমলের প্রাচীন ভবনটির উঁচু ছাদ দেওয়া বিভিন্ন কক্ষ ও স্তম্ভময় করিডোরে গা-ছমছম করা নিস্তব্ধতা নেবে আসে। কারফিউর কারণে বিরান হয়ে আসা রাজধানী শহর এখনো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বীভৎস হত্যাকাণ্ডে স্তম্ভিত হয়ে থাকে। পুলিশপ্রধান হয়তো হত্যাকারীকে পাকড়াও করার কাজে মনোনিবেশ করতেন, কিন্তু ইতিমধ্যে স্পষ্ট

হয়ে গেছে, এ হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন বর্বর আচরণ নয় : এটি আকস্মিক ছড়িয়ে পড়া সহিংস কর্মকাণ্ডের অংশ, যা দক্ষিণাঞ্চলের অনেক অংশে ছড়িয়ে পড়েছে। সেসব স্থানে সরকারি কার্যালয় ও ভবনে হামলা চালানো হচ্ছে, পুলিশ ফাঁড়ি লুট করা হচ্ছে, কারাগার খুলে দিয়ে রাজবন্দিদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এসব স্থানে দাঙ্গা শুরু হয়েছে, তবে এ দাঙ্গা যে সুপরিকল্পিত, তাতে সন্দেহ নেই।

পুলিশপ্রধানকে বিধ্বস্ত মানুষের মতো দেখায়।

'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা নিজেদের চরম অথর্ব প্রমাণ করেছে', তিনি ঘোষণা করেন, তাঁর কপালে ঘাম চিকচিক করে। 'না, এর জবাব আমার জানা নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বদলে আমার মৃত্যু হলেই ভালো হতো।'

হয়তো সেটি কথার কথা, তবে এমন ঘটনা কী করে ঘটতে পারে, তা ভেবে তিনি কূলকিনারা পান না। সকল রাজনৈতিক কর্মীকে গণহারে গ্রেপ্তার করে এবং বিভিন্ন স্থানে গজিয়ে ওঠা রহস্যময় ফুটবল ক্লাবগুলি ভেঙে দিয়ে তিনি কি এ জাতীয় অঘটন রোধে সর্বোচ্চ সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি?

'এখন আমি যা-ই বলি না কেন, কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। আমাকে সোজা বরখাস্ত করা হবে।'

কয়েক মুহূর্ত মনে হয় তিনি যেন ভেঙে পড়বেন। তারপর তিনি আচম্বিতে অবিশ্বাস্যভাবে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলে চতুর্দিকে দাঁড়ানো অধস্তন কর্মকর্তারা বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

'এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমাকে দেখার দরকার নেই, যান, গিয়ে কিছু একটা করুন, ওদের পিষে ফেলুন, ধরে ধরে সবকটার হাড় গুঁড়ো করুন।'

তিনি হিংস্রভাবে টেবিল চাপড়াতে থাকেন।

৩

'ওহ্, আবার সেই আবর্জনা', কনডনের এগিয়ে দেওয়া টেলিগ্রামটি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেন রাষ্ট্রদূত হথর্ন, এমনভাবে সেটি সরিয়ে দেন যেন কাগজটিতে কোনো কুৎসিত, সংক্রামক রোগের জীবাণু কিলবিল করছে। 'আচ্ছা, এটি টেলিগ্রাম অফিসের ভেতর গলে এল কীভাবে? ওরা কি সরকারকেও দখল করেছে নাকি?'

'এবারও আহ্বান', কনডন তার বসের প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটি উপেক্ষা করে বলে, 'ওরা চায় আবদুল কাদের গংদের উৎখাতে এবং স্বাধীনতা দল ও এনডিপির একটি জোট সরকার স্থাপনে আমরা ওদেরকে সহযোগিতা করি।'

রাষ্ট্রদূত উপহাসের হাসি চাপতে পারেন না। 'চমৎকার ঠাট্টা', তিনি বলেন। তারপর এক ঠাণ্ডা ক্রোধে কঠিন হয়ে যাওয়া কণ্ঠে বলেন, 'কেমন বদমাশ ওরা, আমাদের ভেবেছেটা কী?'

'ওরা বলছে, ওদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আমরা বিরাট ভুল করব। জোর দিয়ে বলছে, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে নয়। আমরা যদি আবদুল কাদের গংদের প্রত্যাখ্যান করি এবং তাদের কর্মকাণ্ড স্বাধীনভাবে চালাতে দেই, তাহলে তারা আমাদের মিত্র ভাববে।'

রাষ্ট্রদূতের মুখভঙ্গি দেখে মনে হয়, এ ব্যাপারে আর কিছু শোনার ইচ্ছা তার নেই।

'এখন পরিস্থিতি কী?' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

'এখনো যথেষ্ট খারাপ।'

'আমার বিশ্বাস শীঘ্রই সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করবে। তবে ওখানেও কিছু ঝামেলা চলছে। সেনাবাহিনী চায় পুরোপুরি দায়িত্ব নিতে। তারা বলছে, সেনাশাসন একটি সাময়িক সমাধান। আমি একে ভালো মনে করছি না।'

কনডন ভ্রূ প্রসারিত করে, তবে মন্তব্য করে না। তার মনে হয় রাষ্ট্রদূতের আরো কিছু বলার আছে।

'না, সেনাবাহিনী সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। এতে শুধু অন্য দেশগুলির সামনে একটি খারাপ নজির তৈরি হবে। কিন্তু একটি কিছু তো করতেই হবে। আমার মনে হয়, আমাদের বন্ধু আবদুল কাদেরকে বিদায় জানাতে হচ্ছে।'

রাষ্ট্রদূত চেয়ার ছেড়ে উঠে মিনিট খানেক ঘরময় ক্ষিপ্রবেগে পায়চারি করেন। তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কনডনের দিকে তাকান। 'অর্থমন্ত্রী মুতালিব সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? সে জনপ্রিয় নেতা না হলেও বেশ পুরনো মিত্র। নানাভির মন্ত্রিসভায় পাঁচ বছর ছিল। নিরীহ ও দক্ষ লোক। অন্তত আমাদের আর্থিক মহলে পরিচিত মুখ।'

'কিন্তু আবদুল কাদের কি যেতে চাইবেন?'

'দেখুন', রাষ্ট্রদূত শুষ্ক কাশি দিয়ে বলেন, 'সেনাবাহিনী বলে দিয়েছে, তাকে বিদায় নিতে হবে। লেফটেন্যান্টদের অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্র কাদেরের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তারা মনে করে তিনি বুদ্ধিমান ও দক্ষ হলে এ জাতীয় ঘটনা কখনোই ঘটতে পারত না। আমার তো মনে হয় না, তার আর কোনো উপায় আছে।'

কিছুক্ষণ বিরতি দেওয়ার পর রাষ্ট্রদূত বলে চলেন, 'কাদের যদি আবদুর রবকে তার পাশে আনতে পারতেন, সেক্ষেত্রে তার নাম অন্তত বলা যেত। কিন্তু তিনি তা পারেননি।'

'না, লোক হিসেবে মুতালিব অনুপযুক্ত নয়', কনডন অবশেষে বলে, তার কণ্ঠে এখনো দ্বিধা। 'শিল্পপতিদের ভোজসভায় তার দেওয়া বক্তৃতা খুব একটা খারাপ হয়নি।'

'আমি জানি সে নিজেও এক বিরাট শিল্পপতি হয়ে উঠেছে। শোনা যায়, টাকা-পয়সার ব্যাপারে লোকটি খুব অসৎ। কিন্তু কী আর করা যাবে? গোটা দেশটিই তো এ রকম।'

'সেনাবাহিনী কি তাকে মেনে নেবে।'

হথর্ন প্রশ্নটি নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বলেন, 'আমার ধারণা ওরা তাকে মেনে নেবে, তারা মোটামুটি যুক্তিবাদী। মুতালিবকে অবশ্যই নিজে থেকে তৎপরতা দেখাতে হবে। তারপর সেনাবাহিনীকে খুশি রাখতে সেনাশাসনও জারি রাখতে হবে।'

রাষ্ট্রদূত দ্রুত ডেস্কের পেছনে গিয়ে বসেন। তাঁর চেহারা দেখে বোঝা যায়, তিনি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। এ ব্যাপারে নিজেকে বা অন্য কাউকে প্রশ্ন করার আর প্রয়োজন নেই।

পঞ্চম অধ্যায়

তথ্য বিভাগের যুবক কর্মকর্তা সজোরে ব্রেক কষায় ক্ষুদ্রাকৃতি ইংলিশ কারটি সহসা থেমে পড়ে। মিহি ধুলার মেঘে দুই যাত্রীর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়।

ধুলা কিছুটা থিতিয়ে এলে চাল বিতরণ অনুষ্ঠানে যথাসময়ে পৌঁছানোর জন্য গত দু ঘণ্টা ধরে প্রাণপণ বেগে গাড়িচালানো যুবক কর্মকর্তা শিস দিয়ে ওঠে। আজ সকালে তার ঘুম ভেঙেছে দেরিতে।

'ওই যে, ট্রাকগুলি', সে প্রফুল্লচিত্তে ঘোষণা করে, 'ওহ্, আল্লাহ রহমানুর রহিম, বিশেষ দেরি হয়নি।'

বস্তুত তার সামনে চালের বস্তা বোঝাই ট্রাকগুলি সংকীর্ণ কাঁচা রাস্তা পুরোটা অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। একদল গ্রামবাসী নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে।

কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই আকস্মিকভাবে যুবক কর্মকর্তার সঙ্গে জনসন যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এখন সে হেসে বলে, 'আপনি হয়তো ভাগ্যবান। কিন্তু ওরা কি দেরি করে ফেলল না?'

'আপনি তো জানেন এখানকার মানুষজনের স্বভাব-চরিত্র। সময়জ্ঞান বলে কিচ্ছু নেই', সখেদে কর্মকর্তাটি বলে। ভুলে যায় সে নিজে আধাঘণ্টা দেরি করে এসেছে।

একটি লোক অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে থাকে। উইন্ডশিল্ডে প্রতিফলিত সূর্যালোক এড়িয়ে ভেতরের যাত্রীদের দেখার জন্য উঁকিঝুঁকি দেয়।

যুবক কর্মকর্তা মাথা বের করে তাকে ডাকে, 'এই যে, ট্রাকের সমস্যা কী?'

কোনো কথা না বলে লোকটি এগিয়ে আসে। গাড়ির নিকটে পৌঁছে মাথা নেড়ে স্পষ্ট ভাষায় বলে, 'ওদিকে কেউ যাচ্ছে না। সামনে গণ্ডগোল।'

'আমাদের যেতেই হবে', যুবক ঘোষণা করে। তারপর জনসনের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার কি মনে হয়, ট্রাকগুলিকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারব?'

এ সময় যুবক কর্মকর্তা স্পষ্ট বুঝতে পারে, এমন নয় যে অনুষ্ঠান শুরু হতে দেরি হওয়া বা কোনো যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ট্রাকগুলি এভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বরং গ্রামের

দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে এগুলিকে এভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, সে এবং তার মার্কিন সঙ্গীটিকে আর সামনে যেতে দেওয়া হবে না।

'চাল-পোড়ানো কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়েছি মনে হচ্ছে', কর্মকর্তা ফিসফিস করে জনসনের উদ্দেশে বলে। 'ফিরে যাবো নাকি?'

কিন্তু তাদের পেছনেও যেতে দেওয়া হয় না। লোকটি অল্প কথায় জানিয়ে দেয়, তারা গাড়ি নিয়ে পেছাতে পারবে না। শুনে যুবক কর্মকর্তা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। রাগের বশে সে গাড়ি পেছনে ঘোরানোর চেষ্টা করে, কিন্তু এ প্রচেষ্টার পরিণতি দেখে ভিড়ের ভেতর দাঁড়ানো তরুণরা ফিকফিক করে হেসে ওঠে : গাড়ির সম্মুখের চাকা রাস্তা বরাবর কাটা নয়ানজুলিতে গিয়ে পড়ে। যুবক কর্মকর্তা এবার আর কোনো ক্রোধ প্রকাশ করে না, গাড়ির ভেতর নিশ্চুপ বসে থাকে, তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আসে।

'নেবে ঠেলা দিলে কেমন হয়?' জনসন বলে। যুবক নিরুত্তর।

বন্ধুসুলভ ও নির্দোষ কৌতূহলের চিহ্ন হিসেবে মুখে ক্ষীণ হাসি ঝুলিয়ে জনসন বিভিন্ন ট্রাকের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকে। এখানে-ওখানে লোকজনের জটলা। দু-একজন তার দিকে তাকালেও অধিকাংশই তাকে উপেক্ষা করে; তবু তার উপস্থিতি সম্পর্কে এরা যে সজাগ, সেটি সে অনুভব করতে পারে। ট্রাকচালকরা কেউ স্টিয়ারিং হুইলে বসে নেই; কেউ কেউ রাস্তার একপাশে মাটিতে অলস ভঙ্গিতে শুয়ে আছে, বাকিরা ফুটবোর্ডে বসা। শুধু একজন চালক তার আসনে হাত-পা ছড়িয়ে গভীর নিদ্রামগ্ন। জনসন সে ট্রাকের ফুটবোর্ডে বসে সিগারেট জ্বালে।

কিছুক্ষণ পর ওপরের জানালায় অবিন্যস্ত চুলের একটি ঘুমকাতুরে মুখ উঁকি দেয়।

'সিগারেট চলবে?' জনসন জিজ্ঞাসা করে।

চালক সিগারেট নেওয়ার পর জনসন তা জ্বেলে দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়।

'ঘটনা কী? এরা সব কীসের জন্য অপেক্ষা করছে?' নিচু দায়সারা কণ্ঠে জনসন জিজ্ঞাসা করে। চালক কষে টান দেওয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ঘুম-ঘুম চোখে দূর দিকচক্রবালে তাকায়, কিছু বলে না। সম্ভবত সে ইংরেজি বোঝে না।

জনসন আবার ফুটবোর্ডে বসে নতুন একটি সিগারেট ধরাতে গিয়ে গুলির শব্দে চমকে ওঠে। এরপরই যেন বিপুল মানুষজনের শোরগোল, আর্তচিৎকার ভেসে আসে। অনুমান করে, শব্দের উৎস রাস্তা বরাবর মাইলখানেক উজানে কোথাও হবে। ট্রাকের আশপাশে দাঁড়ানো সবাই সহসা সেদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে শোরগোল শোনার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ কিছুই ঘটে না। তারপর প্রায় বিশ-পঁচিশজন লোক সেদিকে ছুটতে থাকে। তারা কোনো সংকেত পেয়ে থাকবে। জনসন চতুর্দিকে তাকায়, কেউ তার উপস্থিতির ব্যাপারে সচেতন নয় বুঝতে পেরে সে হাঁটতে শুরু করে, প্রথমে এক-পা দু-পা করে, তারপর বহরের প্রথম ট্রাকটি পেরোবার পর দ্রুতবেগে হাঁটে। তার মুখের হাসি হাসি ভাব উবে গেছে।

কয়েক গজ যেতে না যেতে সে পেছনে ধাবমান পদশব্দ শুনতে পায়। সে পেছন ফিরে না তাকিয়ে সবেগে পা চালায়, কিন্তু পেছনের পদশব্দ ততক্ষণে যেন দৌড়ে রূপ নেয়। তারপর কেউ একজন তার কাঁধে হাত রাখে।

'এ রাস্তায় নয়, মি. জনসন। ওখানে গেলে আপনার বিপদ হতে পারে', পেছনের লোকটি বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলে।

'আপনি আমাকে চেনেন?' পেছনে না ঘুরে হাঁটার গতি অব্যাহত রেখে সে বলে।

'আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চেনে। আপনি কি থামবেন দয়া করে?'

'কেন?'

'আপনাকে বলছি, খুনও হয়ে যেতে পারেন।'

'আমি শুধু দেখতে চাই, ওখানে কী হচ্ছে। আমি একজন সাংবাদিক।'

'ওখানে মারামারি চলছে।'

'সেটি আমিও বুঝতে পারছি। কিন্তু কার সঙ্গে কার মারামারি?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

'যারা চাল পোড়ায় আর যারা উপোস থাকে তাদের মধ্যে।'

জনসন পিছন না ফিরলেও সহসা থেমে যায়। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বেখাপ্পা কিন্তু পরিপাটিভাবে চিরুনি করা কালো চুলের এক ছোটখাটো লোকের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

'কমিউনিস্টরা চাল পুড়িয়েছে। ক্ষুধার্ত লোকজন এখন তার প্রতিশোধ নিচ্ছে, তাই নয় কি?'

'সত্য কথা বললে আপনার বিশ্বাস হবে না। যাই হোক, চলুন ফিরে যাওয়া যাক।'

জনসন ফিরতে বাধ্য হয়। ভিড়ের মধ্যে এসে সে আবার ট্রাকের সেই ফুটবোর্ডেই বসে। ঘুম ছুটে যাওয়া চালককে আরেকটি সিগারেট সাধে, তারপর তার সঙ্গীটির কথা মনে পড়ে। সে গাড়ির কাছে হেঁটে আসে।

গাড়ি খালি। যুবক কর্মকর্তাকে কোথাও দেখা যায় না।

মাথার চাঁদিতে সূর্যের তেজ অনুভব করতে শুরু করলে জনসন নয়ানজুলি ডিঙিয়ে একটি গাছের তলায় গিয়ে বসে। দূর থেকে তখনো গুলি ও মানুষের আর্তচিৎকার ভেসে আসে। লড়াই চলছে।

আরো আধঘণ্টা পর জনসন লক্ষ করে, চতুর্দিকে গভীর নিস্তব্ধতা নেবেছে। সে এই স্তব্ধতা নিঃশ্বাসের মতো টেনে নেয় এবং উঠে বসে ট্রাকের চারপাশে দাঁড়ানো মানুষজনকে লক্ষ করে। শীঘ্রই মানুষজনের আরেকটি বড়সড় দল এসে যোগ দেয়। তারপর সহসা সবাই সচল হয়ে ওঠে। লোকজন ট্রাকের ওপর উঠে চালের বস্তা নিচে ছুঁড়ে দিতে থাকে। আরেক দল লোক সেগুলি উঠিয়ে দূরে নিয়ে যায়। তারা বস্তা নিয়ে রাস্তা বরাবর কিছুদূর গিয়ে নয়ানজুলি ডিঙিয়ে গাছগাছালিতে ভরা একটি স্থানের ওপারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ট্রাক খালি করে ফেলার পর কতিপয় লোক ও চালকদের মধ্যে কিছুক্ষণ শলা-পরামর্শ চলে। অবশেষে চালকরা ট্রাকে চড়ে বসে, খরখর শব্দে ইঞ্জিন সচল হয়। ওরা ফিরে যাচ্ছে সাব্যস্ত করে জায়গা পাওয়ার আশায় জনসন উঠে দাঁড়ায়। তবে কোনো ট্রাকের কাছে পৌঁছানোর আগেই সে লক্ষ করে, একটি ট্রাক পিছিয়ে এসে অর্ধেক নাক ঘুরিয়ে নয়ানজুলির ওপর চাকা উঠিয়ে দেয়। বাকি কোনো কোনোটি পেছনের, কোনোটির সামনের চাকা রাস্তার বাইরে গিয়ে থামে। তারপর টায়ার ফাঁসিয়ে দেওয়া হয় ও ব্যাটারি খুলে নেওয়া হয়। ট্রাকগুলি দিয়ে যে একটি বেড়া দেওয়া হলো, এতে আর সন্দেহ থাকে না। অনেকে চলে যেতে শুরু করায় ভিড় পাতলা হয়ে আসে।

দূর থেকে একটি পুরনো ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসার পর জনসন নিজের বিপন্ন অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে। ছাদে মুরগির খাঁচা বোঝাই একটি সবুজ রঙের নড়বড়ে বাস এসে দাঁড়ায়। যাত্রীরা চাপা কৌতূহলে জানালা দিয়ে মাথা বাড়ায়। চালক দরজা খুলে লাফিয়ে নামে। রাস্তার ওপর কে এভাবে গর্দভের মতো ট্রাক দাঁড় করিয়ে রেখেছে তা অনুসন্ধান করা চালকের লক্ষ্য বলে মনে হয়। তবে বাস যে আর যেতে

পারবে না, চালক এ কথা যাত্রীদের জানানোর আগেই দুজন যাত্রী পেছন থেকে নেবে ট্রাকগুলি দেখার জন্য বাসের উল্টোদিকে এসে দাঁড়ায়। তাদের দুজনার পরনে আঞ্চলিক পোশাক, তবে একজনের হাতে একটি বড় সুদৃশ্য চামড়ার ব্যাগ। তারপর সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে তারা দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করে।

তাদের ব্যাপারে বিশেষ কিছু চিন্তা না করেই জনসন তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে এক মুহূর্তের জন্য সে ভাবে, এ দুজনার আঞ্চলিক পোশাকের সঙ্গে বস্তুত দামি ও ভারী চামড়ার ব্যাগটি মানানসই নয়। তবে এ নিয়ে ভাবনা খুব বেশি দূর গড়ায় না। কারণ সে ইতিমধ্যে জেনে গেছে, এ দেশের লোকজনের পোশাক-পরিচ্ছদ বড় বিচিত্র : পশ্চিমা ধাঁচের চোস্ত একজন লোকের পায়ে সহসা দেখা যাবে কাঠের খড়ম, আবার ভরা বাজারে মাদুরের ওপর পা ছড়িয়ে বসা কোনো স্থানীয়কে হয়তো দেখা যাবে সিল্কের রুমাল বের করে ঘাম মুছতে।

তখন সহসা সে বুঝতে পারে, কেন লোক দুটির দিকে বিশেষত অপেক্ষাকৃত খাটো লোকটির দিকে সে দুবার ফিরে তাকিয়েছে। তাকে কি সে কোথাও দেখেছে? একটি মুখ অবয়ব পাওয়ার জন্য তার মাথার ভেতর যেন প্রাণপণে যুদ্ধ করে, অবশেষে একটি চেহারা সেখানে অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। জনসন আচম্বিতে ছুটতে শুরু করে। ট্রাকের চারপাশে দাঁড়ানো কয়েকজন ঘুরে তাকিয়ে বিস্ময়সূচক ধ্বনি করে, কিন্তু সে কান দেয় না। সে আশ্বস্ত হয়ে লক্ষ করে, তার পেছন পেছন ছুটছে না কেউ।

ততক্ষণে লোক দুটি রাস্তা ছেড়ে দ্রুত পায়ে বাঁশঝাড়ের দিকে রওনা দিয়েছে।

'আহসান সাহেব!' জনসন চিৎকার করে ডাকে। লোক দুটি হাঁটার গতি কমায়; খাটো লোকটি সাবধানে ঘাড় ঘোরায়। এক মুহূর্তের তরে মনে হয় তারা বুঝি দৌড়াতে শুরু করবে। কিন্তু তারা থেমে পড়ে।

'মি. জনসন না?' দুজনের মধ্যে তুলনামূলক খাটোজন যেন ধরা পড়ে যাওয়ার পর কৌতুকচ্ছলে বলে।

'আর আপনি মি. আহসান না!'

'আপনাকে এখানে পাব ভাবিনি', আহসান উত্তর দেন, আঞ্চলিক পোশাকে তাঁকে ঈষৎ বিসদৃশ দেখায়। 'এখানে কী করতে?'

'গ্রামের একটি মেলা দেখতে এসেছিলাম। গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল। মেলার প্রতি আপনার আগ্রহ কম মনে হচ্ছে?'

আহসান উত্তর দেন না। কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর বলেন, 'আমি কিছুটা তাড়াহুড়োর মধ্যে আছি।'

'আপনাকে দেখব ভাবিনি', আহসানের মন্তব্য ইচ্ছে করে এড়িয়ে গিয়ে জনসন বলে, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি কারাগারে।'

আহসান পূর্ববৎ ইতস্তত করেন। 'ছিলাম, আজ সকালে ছাড়া পেয়েছি।'

'আপনার বাড়ি কি ধারে-কাছে।'

'না, এখানেই এক জায়গায় যাচ্ছি। বন্ধুর বাসায়।'

আহসান যদিও বলেন না জেল থেকে তিনি কীভাবে ছাড়া পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর কথার ধরনে বোঝা যায়, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কাজটি হয়নি। এখন বোঝা যাচ্ছে, এ গোলমালের স্থানে তাঁর উপস্থিতি পুরোদস্তুর দৈব ঘটনা নয়।

অপর লোকটি ভারী ব্যাগ নাবিয়ে রেখে তারপর আবার তুলে নেয়, নিঃসন্দেহে তাড়াতাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে সে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু আহসান জনসনের দিকে তাকিয়ে থাকেন, সন্দেহ নেই তিনি নিজের মনে কিছু একটা নিয়ে তর্কে লিপ্ত। তারপর একসময় তার মুখে প্রশস্ত হাসি দেখা যায়। 'আপনি আটকা পড়েছেন। আমাদের সঙ্গে আসুন না কেন ?

জনসনের চোখ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেটি সে গোপন করার চেষ্টাও করে না।

'বেইট দ্য হুক ওয়েল : দিস ফিশ উইল বাইট', সে বলে।

'হুঁ, শেক্‌সপিয়ারের গন্ধ পাচ্ছি', আহসান উত্তর দেন।

'হ্যাঁ, মাছ ঠোকর দিয়েছে।'

'আপনাকে সঙ্গে দেখতে পেলে আমার বন্ধু খুব বিস্মিত হবে। কিন্তু তাতে কী? চাইলে আসতে পারেন। তবে আপনাকে আগেই হুঁশিয়ার করে রাখছি, আমরা কিন্তু কোনো মেলায় যাচ্ছি না।'

'মেলা তো এখানেও হচ্ছে না।'

তারা হয়তো মাইলখানেক হেঁটে থাকবে, জনসন নিশ্চিত নয়। ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে, খালের পাড় বেয়ে, জলাভূমি ডিঙিয়ে, বাদাড়-ঝোপঝাড় ও খামারবাড়ি পাশ কাটিয়ে তারা হাঁটে। সংকীর্ণ রাস্তা কখনো দুজন মানুষের পাশাপাশি চলার মতো প্রশস্ত হয় না, কিংবা কোথায় যাচ্ছে অনুমান করার মতো লম্বা সোজা পথ পাওয়া যায় না।

তারপর তারা ঘন গাছপালা ঠাসা জঙ্গলমতো এক স্থানে প্রবেশ করে। ভেতরের শীতল ছায়ায় জনসন প্রথম টের পায় সে দরদর করে ঘামছে।

'আমরা প্রায় এসে পড়েছি', আহসান বলেন, নিজের ভিজে জবজবে হয়ে যাওয়া সাদা শার্ট তিনি আড়চোখে দেখে নেন।

সহসা তারা অপ্রত্যাশিতভাবে একটি খামারবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়, বাড়িটি পরিচর্যাহীন ও পরিত্যক্ত বলে বোধ হয়, কারণ চারপাশে কোথাও খড় কিংবা গবাদিপশুর বিন্দুমাত্র গন্ধ নেই; সামনের উঠানেও কেমন এক পরিচ্ছন্নতা, যা ঠিক সযত্ন ঝাঁট দেওয়ার কারণে নয়, বরং স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের অনুপস্থিতির কারণে সৃষ্ট বলে মনে হয়।

'আমরা এসে পড়েছি', আহসান বলেন। তারপর কিছুক্ষণ জনসনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। 'আপনাকে এখানে আনার কিছু বিপদ অবশ্য আছে। ওরা হয়তো আপনাকে খুঁজছে। একটি গোলমাল যে চলছে, সেটি জানেন তো?

'অনুমান করছি।'

'কিন্তু আমাদের করারও কিছু ছিল না, তাই না?' আহসান হেসে ওঠেন। 'আপনাকে ওখানে রেখে আসা আরো খারাপ হতো। আমাদের নিয়ে কল্পনায় কত কী যে বানাতেন, তারপর পুলিশকে তথ্য দিতেন।'

'কীসের তথ্য?'

'এই আমাকে দেখেছেন এবং কোনপথে যেতে দেখেছেন এসব আর কি।'

'এ জন্যই কি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন?'

'সেটি হয়তো একটি কারণ। তবে আরো কারণ আছে, বুঝতে পারবেন। আমি অবশ্য আপনাকে জিজ্ঞেস করব না, আমাদের সঙ্গে আপনি আসতে কেন রাজি হলেন। সেটিও বোঝা যাবে।'

ষষ্ঠ অধ্যায়

১

রাত্রি নেবেছে, সূর্যাস্তের আগে আগে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর থেকে অজস্র ব্যাঙের একটানা শোরগোল খামারবাড়ির বাইরের অন্ধকার ভারী করে তোলে। জনসন ভাবে, ম্লান আলো ছড়ানো যে ঘরটিতে তারা বসে আছে, তার ভেতরে দু-একটি ব্যাঙ ঢুকে থাকতে পারে। মৃদু শব্দে দু-একবার সে যন্ত্রচালিতের মতো পা ওপরে তুলে বসে : দিব্যচোখে দেখতে পায় একটি ব্যাঙ লাফিয়ে তার ট্রাউজারের ভেতর প্রবেশের চেষ্টা করছে। একবার সে কান খাড়া করে একটি অদ্ভুত মুখচাপা দেওয়া আর্তনাদ শুনতে পায়। সে জানতে পারে, সেটি সাপের মুখে অর্ধেক প্রবিষ্ট ব্যাঙের আর্তনাদ। তারপর শব্দটি থেমে যায়। ব্যাঙটি কি ছাড়া পেয়েছে, নাকি সাপের নির্দয় গ্রাসের অন্ধকারে তার মৃত্যু হয়েছে? সে আর জিজ্ঞাসা করার অবকাশ পায় না, কারণ ঘরের লোকজন বরাবরের মতো আরেক দফা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

জনসন ইতিমধ্যে এ খামারবাড়িতে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছে। সে লোকজনের বিপুল কর্মকাণ্ড লক্ষ করে। মানুষজন আসছে-যাচ্ছে, স্থানীয় ভাষায় ঘন ঘন পর্যালোচনা বৈঠক বসছে, পেয়ালার পর পেয়ালা গরম কিন্তু বিস্বাদ চা পান করা হচ্ছে।

তার উপস্থিতির কারণে এক নবাগতের মধ্যে সৃষ্ট অস্বস্তি এখন তার কিছুটা গা-সওয়া হয়ে গেছে, লোকটির চোরা চাউনিও তার কাছে তেমন কিছু মনে হয় না। ধীরে ধীরে নবাগত লোকটিও তার উপস্থিতির ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে কিংবা কোনো ইঙ্গিতের মাধ্যমে অথবা ঘরের অন্যদের আচরণের মাধ্যমে লোকটি হয়তো এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে থাকবে যে, মার্কিন ভদ্রলোকের উপস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের বিশেষ কিছু নেই।

জনসনের উপস্থিতির ব্যাপারে সচেতন হয়ে আহসান মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে হাসেন অথবা যাতে একঘেয়ে না লাগে, এ জন্য মাঝে মাঝে একটি-দুটি বাক্যবিনিময় করেন। কিন্তু খামারবাড়ির ভেতরে চলমান এ আলোচনার বিষয়ে জনসনকে তিনি কিছু বলেন না। এ আলোচনায় তার সার্বক্ষণিক মনোযোগ জরুরি বলে মনে হয়। জনসনও তাকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। আলোচনাকালে সবার মুখভঙ্গি, চোখের অভিব্যক্তি, কথা বলার ধরন এবং তাদের যাওয়া-আসা দেখে জনসন অনুমান করে

কোথাও কোনো গোলমাল চলছে এবং এ খামারবাড়িটি বস্তুত স্বাধীনতা দলের অস্থায়ী কার্যালয় হয়ে উঠেছে। আহসান যে এদের নেতা এবং তার মতামতই যে চূড়ান্ত তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

কিছুক্ষণ যাবৎ জনসন তীব্রভাবে অনুভব করতে শুরু করে খামারবাড়ির এ লোকগুলির হাতে সে নিজের অজান্তে বন্দি হয়ে পড়েছে। এখানে আসার পরপরই আহসান অবশ্য বলেছিলেন, তাকে তিনি যেতে দিতে পারবেন না, কারণ সেটি বিপজ্জনক হবে, কিন্তু সে কথার মধ্যে একটি পরিহাসের সুর ছিল। তারপর অন্তহীন কর্মকাণ্ড, মানুষজনের হন্তদন্ত আসা-যাওয়া এবং অবোধ্য ভাষায় গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে হতবিহ্বল হয়ে বসে ছিলেন আহসান। ইচ্ছা হলে সে চলে যেতে পারবে কিনা, তা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন সে বোধ করেনি। এখন সে আঁচ করতে পারে তাকে যেতে দেওয়া হবে না। কিন্তু ওরা তাকে কতক্ষণ আটকে রাখবে?

সবেমাত্র একটি বৈঠক শেষ হয়েছে, আহসান পেছনে হেলান দিয়ে বসে থাকেন, তাঁর দৃষ্টি ঈষৎ চিন্তাচ্ছন্ন। জনসন প্রয়োজনাতিরিক্ত সাড়াশব্দ করে আড়মোড়া ভাঙে, তারপর একটি সিগারেট জ্বালে।

আহসান তার দিকে ফেরেন, তাঁর মুখে ক্ষীণ হাসি উঁকি দেয়। 'কী, নিজেকে যুদ্ধক্ষেত্রের সাংবাদিক মনে হচ্ছে?'

'কোনো যুদ্ধ চলছে নাকি? জানি না তো, আপনি তো কিছু বলেননি।'

আহসান ইতস্তত করেন। 'গোলমাল কিছু চলছে।'

'আপনাকে একটি কথা বলতে পারি। নিজেকে এ মুহূর্তে যুদ্ধবন্দি মনে হচ্ছে।'

'উঁহু, সেরকম ভাববেন না। কেবল একটু সতর্কতা, এই যা।'

'আমি সাংবাদিক, গুপ্তচর নই। তাছাড়া আমি চাই আপনারা আমার ওপর আস্থা রাখুন। আপনি হয়তো জানেন, তিন্নি আমাকে যে জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল, আমি তার কথা পুলিশকে বলিনি।'

আহসানের মুখের অভিব্যক্তিতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে, তিনি চোখ আধবোজা করেন। জনসন এ অভিব্যক্তির অর্থ অনুধাবনের আগেই তা মিলিয়ে যায়। তিনি বলেন, 'আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, তিন্নির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল। ও মারা গেছে।'

'মারা গেছে?'

'আজ বিকেলেই একটি বুলেট লেগেছিল। ঘণ্টাখানেক আগে সে মারা গেছে।'

তিন্নির এ অপ্রত্যাশিত মৃত্যুসংবাদে জনসন কেঁপে ওঠে। তাছাড়া সে এ বিষয়টিও পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারে যে, খামারবাড়ির ভেতরকার এসব কর্মকাণ্ড নিছক ছেলেখেলা নয়, কোথাও ভয়ানক সহিংস কিছু একটা ঘটছে। একটি অকারণ প্রশ্ন তার মনের ভেতর তোলপাড় তোলে। তিন্নির আহত হওয়ার খবরটি কেউ তাকে বলেনি কেন? কিন্তু সে প্রশ্ন করে না। তাকে বলার কী আছে? তাকে যদি বলাও হতো, এমনকি যে স্থানে যন্ত্রণাকাতর হয়ে তিন্নি শুয়ে ছিল, সেখানে যদি তাকে যেতেও দেওয়া হতো, কী শোনাত সে তিন্নিকে? সে কী বলতে পারত, এভাবে বুলেটবিদ্ধ হওয়ার কোনো মানে হয় না, কারণ একদল লোক তাদের আসলে বিভ্রান্ত করছে? এ কথা বলার মাধ্যমে কি তার যন্ত্রণা এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গনের ব্যাপারটিকেও ভয়ানক অর্থহীন করে তোলা হতো না? না, তিন্নিকে বলার মতো কিছুই তার থাকত না : তাদের দুজনার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। তার মনে পড়ে অধ্যাপকের বাসায় নৈশভোজে তিন্নি তাকে কী বলেছিল : যে মানুষটি তার

দেশকে এ কারণে ভালোবাসে যে দেশ তাকে দু হাত ভরে দিয়েছে এবং যে মানুষটি দেশের কাছ থেকে কিছুই না পাওয়ার কারণে দেশকে ভালোবাসে, তাদের দুজনার মধ্যে কোনো মিল কি হওয়া সম্ভব? জনসন সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

'আমি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, আসলে কী ঘটছে? আমাকে সব খুলে বলুন', সে আহসানের চোখের দিকে সরাসরি তাকায়।

'আমাদের জনগণ উন্মাদ হয়ে গেছে। তারা এমন করে বুলেটের মুখে দাঁড়াচ্ছে, যেন সেগুলি বুলেট নয়, গোলাপের পাপড়ি।'

জনসনের ভেতর ক্রোধ হিংস্র হয়ে ওঠে, তবে কথা বলার সময় শুধু তার কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনায়, 'তাহলে আপনারা সহিংসতার পথ ধরেছেন?'

'আপনি কেন মনে করছেন, আমরাই সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছি?'

'আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আপনারাই সহিংসতা শুরু করেছেন।'

'আমি বলতে যাচ্ছিলাম আপনি একটি অথর্ব সাংবাদিক। কিন্তু মনে পড়ে গেল, আপনি তো আবার আমেরিকান। ব্যাঙের আর্তনাদ শুনেছেন তো?'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'আপনার মতে তো সাপটিই নির্দোষ।'

জনসন তার হাতের সিগারেটের গোড়া অমসৃণ মেঝেতে হিংস্রভাবে পিষে ফেলে। 'হয়তো আপনারাই ঘাসের ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা সাপ। আপনাদের খাবার জন্য ব্যাঙ প্রয়োজন। এখনো যদি ব্যাঙ না খেয়ে থাকেন, তার কারণ আপনারা আকারে এখনো ছোট আর ব্যাঙটি পূর্ণবয়স্ক জাত-ব্যাঙ।'

আহসান কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকেন। তারপর বলেন, 'বর্তমানে কী ঘটছে তা যে এতক্ষণ আপনাকে বলতে চাইনি, তা শুধু এ কারণে নয় যে, আপনি বাইরে জানিয়ে দেবেন, বরং বলিনি কারণ আমি জানতাম, বললেও আপনি বুঝতে পারবেন না। অর্থহীন আলোচনার সময় আজ নয়।'

'এখানে বোঝার কী আছে?'

'আপনারা বুঝতে পারেন না যে আমাদের জনগণ শুধু হাতের পুতুল নয়, আপনারা গুটিকয়েক সুতো নাড়িয়ে যা-ইচ্ছা তাই করিয়ে নেবেন। তারা জানে-বোঝে। তাদের নিজেদের দাবি-দাওয়া আছে, ক্রোধ আছে। একটা সীমা পর্যন্ত অবিচার ও নির্যাতন তারা সহ্য করে।'

জনসনের ভেতর আরেক দফা ক্রোধ জেগে ওঠে। কী শূন্যগর্ভ ও বালখিল্য আহসানের এসব বাগাড়ম্বর।

'তাদের জন্য কোনটি ভালো, তারাই কি শুধু সেটি জানে?'

'হ্যাঁ, শুধু তারাই জানে', আহসান শান্ত কণ্ঠে বলে। 'একমাত্র তাদেরকেই যন্ত্রণা পোহাতে হয়, এ জন্য শুধু তারা জানে; আপনারা এবং এখানে আপনাদের গুটিকয় সাঙ্গপাঙ্গ নয়।'

জনসন কিছুক্ষণের জন্য আলোচনা থামিয়ে দেওয়ার কথা ভাবে, সে একটি সিগারেট জ্বালানোর মাধ্যমে তার প্রতিজ্ঞার নীরবতা শুরু করে। কিন্তু দু-এক টান দেওয়ার পর আহসানের শেষের কথাগুলির ব্যাপারে তার বক্তব্য জানিয়ে দেওয়ার তাড়নার কাছে সে নতিস্বীকার করে। 'তিন্নির মৃত্যুর পর এখন আপনি যা বলছেন সবই অমানবিক শোনাচ্ছে।'

আহসান নিজেই তর্কটি মাঝপথে থামিয়ে দেন। সৌভাগ্যবশত তক্ষুনি তার কাছে একজন বার্তাবাহক হাজির হয় এবং তিনি তাঁর কাজে প্রত্যাবর্তন করেন। জনসন ঘরের কোণে রাখা মাথাভাঙা পুরনো মাটির পাত্রটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

বার্তাবাহক প্রস্থান করলে আহসান আবার কথা বলেন। 'আপনি হয়তো জানতে আগ্রহী হবেন, আমরা আপনাদের সরকারকে এ মর্মে আশ্বাস দিয়েছি যে, যদিও আমরা বিশ্বাস করি কঠোর অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে এ দেশে জনগণের দারিদ্র্য দূর করার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, তবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করতে পারলে আমরা খুব খুশি হব এবং যেহেতু রাশিয়া ও চীনের চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশি, সে জন্য এ দুই কমিউনিস্ট দেশের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কের বাইরে কোনো সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব আমরা দিচ্ছি না।'

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সত্যি সত্যি আশ্বস্ত হবে বলে আপনি আশা করেন?'

'আমরা আশা করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশ্বস্ত হওয়া উচিত। কারণ আমরা আশ্বস্ত না হওয়ার কারণ দেখতে পাচ্ছি না। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই জনগণের পক্ষ নিতে হবে। সেটি যত দ্রুত হয় ততই ভালো। জনগণকে তারা চিরকাল উপেক্ষা করে যেতে পারে না।

'না, তারা আপনাদের কথায় আশ্বস্ত হবে বলে মনে হয় না। ওরা আপনাদের ফন্দি-ফিকির ঠিকই ধরতে পারবে। আপনারা ভেবেছেন, নিজেদের কর্মকাণ্ডে সফল হলে বাড়তি সময় হাতে পাবেন। আর যদি বিফল হন, তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অসম্ভব কিছু একটি করার জন্য অনুরোধ করে তারপর সমর্থকদের বোঝাবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কত খারাপ।'

আহসানের চোখ কঠিন হয়ে ওঠে। 'দেখুন মি. জনসন, আমাদের সমস্যাগুলি এত প্রকট যে, ছলনার আশ্রয় নেওয়ার অবকাশ নেই।' তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলেন, 'তাছাড়া এটি আমাদের নিজেদের দেশ, নিজেদের সমস্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি আমাদের বন্ধুত্বের প্রস্তাব গ্রহণ করতে না চায়, তারা চলে যেতে পারে। যদি না যায়, আমাদের জনগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্যক্তিস্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদারি করা গুটিকয়েক লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব কিছু হাস্যকর ধ্যান-ধারণার কারণে আমাদের জনগণ সম্পূর্ণ দারিদ্র্যে বসবাস করতে পারে না।'

জনসন ম্লান আলোর নাগালের বাইরে ছাদের পানে তাকিয়ে থাকে। উত্তর দেয় না।

২

মধ্যরাতের পর খামারবাড়ির কক্ষটির আবহাওয়া নাটকীয়ভাবে পাল্টে যায়। বেশ কয়েকজন বার্তাবাহক এসে উপস্থিত হলে তড়িঘড়ি করে একের পর এক বৈঠক বসতে থাকে। এমনকি যে আহসান এতক্ষণ শত ক্লান্তি সত্ত্বেও চেহারায় অবিচল ভাব বজায় রেখেছিলেন, এবার তাঁকেও বিধ্বস্ত দেখায়। মাঝে মাঝে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন এবং তাঁর মুখের ওপর একটি ছায়া পড়ে। বিদ্রোহীরা যে একটি বড় ধরনের বিপত্তিতে পড়েছে এতে সন্দেহ থাকে না। কী ঘটেছে, তা জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠে

জনসন, কিন্তু বৈঠক করার সময় ওরা যেন তার উপস্থিতির কথাও বিস্মৃত হয়। অপেক্ষা না করে উপায় নেই।

কিছুক্ষণ পর সে সাব্যস্ত করে, আহসানকে একটি প্রশ্ন করে দেখা যেতে পারে। 'খারাপ খবর?'

আহসান ঝট করে তার দিকে তাকান, প্রথমে চিনতে পারেন না যেন। তাঁর মুখ বিমর্ষ। কিন্তু পরক্ষণে তার অভিব্যক্তি পাল্টে গিয়ে একটি ক্ষীণ হাসি উঁকি দেয়। তিনি বলেন, 'জেনে হয়তো খুশি হবেন, দক্ষিণাঞ্চলে সেনাবাহিনী জোরেশোরে অভিযান শুরু করেছে।'

জনসনের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য আহসান অপেক্ষা করে না। সে পাশের লোকটির দিকে ফেরে। কিছুক্ষণ পর একজন এসে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি সাইকেল চালাতে পারেন?'

'হ্যাঁ, পারি।' জনসন বুঝতে পারে ওরা খামারবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। হয়তো অন্য কোথাও চলে যাবে। লোকটি প্রস্থান করে।

আহসানই তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানান। জনসনকে ভোরবেলা চলে যেতে হবে। একজন গাইড তাকে পার্শ্ববর্তী একটি মফস্বল শহরে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে জনসন পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

আহসান ও অপর লোক আবার তাদের কর্মকাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করে। তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে জনসন তাদের উদ্বেগ টের পায়। তারা হয়তো নতুন ঘটনাপ্রবাহের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন ও পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ণয়ের চেষ্টা করে। তারা কি ভয় পেয়েছে? তাদের অবস্থা যে কী অসহায়, তা কি তারা জানে? নাকি তারা ভাবছে সেনাবাহিনী তলবের কারণে তাদের কৌশলে সামান্য কিছু রদবদল ঘটবে মাত্র, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন ঘটবে না? নিঃসন্দেহে তারা কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে, কিন্তু ভয়ের কোনো চিহ্ন নেই। হয়তো তারা এত বেশি বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে, আতঙ্ক বোধ করতে পারছে না কিংবা বুঝতে পারছে না, খেলা শেষ হয়ে গেছে। এই প্রথমবারের মতো জনসনের মনে হয়, এরা ভীষণ সরল-সোজা লোকজন। তিন্নির মতো এদেরও মধ্যে হয়তো বিভ্রান্ত বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন কিছু মানুষ এদের মধ্যে কিছু কলাকৌশল ঢুকিয়ে দিয়েছে যাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবনে এরা অক্ষম। জনসন লক্ষ করে এদের বিরুদ্ধে তার ক্রোধ হ্রাস পাচ্ছে, এমনকি একবার সে আহসানকে সতর্ক করে দেওয়ার কথাও চিন্তা করে। সে স্থির করে আহসানকে বলবে, মার্কিন সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত কতিপয় অস্ত্র সম্পর্কে যেহেতু তার ধারণা আছে, তাই তার জোর পরামর্শ হবে এ উন্মাদ খেলা পরিত্যাগ করা।

কিন্তু যখন তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আসে, তখন জনসন তা উল্লেখ করে না। সে জানে তাকে কোনো উপদেশ দেওয়া বৃথা। তাছাড়া এদের দেওয়ার মতো কোনো পরামর্শ কি তার আদৌ আছে? বরং সে বলে, 'একটু হাঁটতে বেরোব ভাবছি।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই', উত্তর দেয় আহসান। 'তাজা বাতাসে আপনার ভালো লাগবে। এখানে গুমট হয়ে গেছে। আমি একটি ছেলে পাঠাচ্ছি। আপনার ওপর নজর রাখবে, যাতে পথ না হারান। সঙ্গে একটি টর্চ নিয়ে নিন। সাপ আছে, জানেন তো।'

কেউ একজন পুরনো ধাঁচের একটি লম্বা, শক্তিশালী টর্চ তার হাতে দেয়।

'বিশ্বাস করুন, ছেলেটি শুধু নিরাপত্তার জন্য আপনার ওপর নজর রাখবে', আহসান আবার বলে।

জনসন ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত আহসানের চোখের দিকে তাকায়। তারপর সহসা সে হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

নক্ষত্রে ঠাসা রাতের বাতাস তরতাজা ও শীতল। জনসন গভীর শ্বাস নেয়। সে উঠোনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। পেছনে কয়েক গজ দূরে একটি ছায়ার মতো অবয়ব। আকাশের অযুত নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থেকে জনসনের মনে হয় সে মহাশূন্যে ভাসছে। তারপর সে হাঁটতে শুরু করে। তার সামনে পথের ওপর শক্তিশালী টর্চ একটি রুপালি চাকতি ছুঁড়ে দেয়। ছায়াটি পেছনের অন্ধকার অনুসরণ করে।

কিছুক্ষণ চলার পর জনসন থেমে পেছনে তাকায়।

'আমার পেছনে এসে দাঁড়াও', সে ছায়ার মতো অবয়বটিকে ডাকে। 'সাপ আছে, জানো তো।'

সে ফিকফিক হাসির শব্দ শুনতে পায়। তারপর ছায়াটি এগিয়ে আসে।

৩

আধঘণ্টা হাঁটাহাঁটির পর জনসন যখন ফিরে আসে, ঘরের আলো তখন আগের চেয়ে ম্লান। প্রথমে ঘর খালি মনে হয়। পরে শীঘ্রই ছায়ার ভেতর থেকে একটি অবয়ব নড়ে ওঠে।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বোধ হয়', আহসান লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, 'হাঁটাহাঁটি ভালো হলো?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর ঘন ছায়ার ভেতর থেকে আহসান হাসেন। 'একটি মজার স্বপ্ন দেখলাম।'

'তাই?'

'খুব হাস্যকর। দেখলাম সেনাবাহিনী এগিয়ে আসা বন্ধ করেছে।'

'আতঙ্কিত হওয়ার কারণে, নাকি আপনাদের পক্ষে যোগ দেওয়ার কারণে?'

'কোনোটিই না। রাজধানী থেকে নির্দেশ আসার কারণে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ওয়াশিংটনে কেবিনেটের জরুরি বৈঠক, ওরা বুঝতে পেরেছে, আমরা যা করতে চাই তাতে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না।'

'সে খবর শুনে আপনাদের লোকজন উল্লাস করছে?'

'উল্লাস করত নিশ্চয়ই, কিন্তু তার আগেই তো ঘুমটা ভাঙালেন।'

আহসান আবার হাসেন, সংক্ষিপ্ত হাসি রাতের নিস্তব্ধতায় মিলিয়ে যায়। দূরে কোথাও করুণ সুরে একটি রাতপাখি ডাকে।

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই কেন আপনাদের সঙ্গে একমত হতে হবে, আপনারা নিজেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতামত মানলে অসুবিধা কোথায়?' কিছুক্ষণ পর জনসন জিজ্ঞাসা করে। নিস্তব্ধতা তাকে পীড়া দিয়ে থাকবে।

'দেখুন, এটা আমাদের দেশ', সংক্ষিপ্ত উত্তর আসে। তারপর আবার নেবে আসে স্তব্ধতা।

গোটা খামারবাড়ি নিশ্চুপ।

জনসন বুঝতে পারে না, অধিকাংশই চলে গেছে, নাকি বাড়ির পেছন দিকে কোথাও গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে, কারণ আসন্ন দিনটি তাদের জন্য কঠিন হবে।

'এক ঘণ্টার মধ্যে দিনের আলো ফুটবে। হালকা একটু ঘুমিয়ে নেবেন নাকি?'

জনসন ঘরের কোণে একটি শক্ত কাঠের তক্তপোশে শুয়ে পড়তে রাজি হয়ে যায়।

'আমি আপনাকে জাগিয়ে দেব', আহসান বলেন। তিনি গিয়ে সলতে কমানো লণ্ঠনের আলো আরো কমানোর চেষ্টা করেন। তারপর ফিরে এসে চেয়ারে বসেন।

'শুভ রাত্রি', অন্ধকার কোণ থেকে জনসনের গলা।

'শুভ রাত্রি', আহসান মৃদুকণ্ঠে বলেন।

চোখ খোলা রেখে জনসন ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, ছাদটা কী এক অবয়ব ধারণ করছে যেন। সে ভাবে, এক বছর পর আবার এখানে প্রত্যাবর্তন করলে আজ রাতের মতো হাঁটতে পারবে কিনা। তবে একটু পরেই ভাবনাটা সে বাদ দেয়। এ জাতীয় প্রশ্ন এ মুহূর্তে জরুরি বলে বোধ হয় না।

কিছুক্ষণ পর রাত্রির স্তব্ধতা চিরে টিনের চালের ওপর প্রবল শব্দে বৃষ্টি পড়তে থাকে। জনসনের তন্দ্রামতন এসেছিল, কিন্তু এ শব্দ তাকে জাগিয়ে দেয়। বর্তমানে বৃষ্টির শব্দ মৃদু, কোমল ও দূরবর্তী হয়ে আসে। তারপর শুরু হয় মশার উৎপাত, রক্তপিপাসু আক্রোশ নিয়ে তারা জনসনকে ঘিরে ধরে। চেয়ারে আহসান নড়েচড়ে ওঠেন।

'জেগে আছেন?' চেয়ারে ক্লান্ত এলানো অবয়বের দিকে তাকিয়ে জনসন ফিসফিস করে।

'হ্যাঁ।'

জনসন উঠে বসে একটি সিগারেট জ্বালে, তারপর বিছানার ধারে বসে ধোঁয়া ছাড়ে।

'মশা?' আহসান প্রশ্ন করেন।

'হ্যাঁ।'

স্বপ্নের মতো আলতো ভঙ্গিতে বৃষ্টি পড়ছে।

'একটি কথা বলব?' আহসান আবার প্রশ্ন করেন। এখন তার কণ্ঠস্বরও বৃষ্টির শব্দের মতো দূরবর্তী এবং কিছুটা বিষাদাচ্ছন্ন শোনায়।

'বলুন।'

'রাতের বেলায় লোকে কী অদ্ভুত স্বপ্নই না দেখে। অদ্ভুত সব ভাবনাও পেয়ে বসে। আপনি কি আমাকে ঘৃণা করেন?'

অপ্রত্যাশিত এ প্রশ্নে জনসন ঈষৎ বিহ্বল হয়ে পড়ে। 'কেন?'

'ভয়ের কিছু নেই, উত্তর দিন।'

জনসন অন্ধকারে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে থেকে তারপর বলে, 'না।'

'সেক্ষেত্রে আপনাকে আমার তত্ত্বটি শোনানো যায়', ঈষৎ হাসি মেশানো কণ্ঠে আহসান বলেন। 'আমার ধারণা, দরিদ্র এশীয়রা তাদের দারিদ্র্যকে জয় করতে কিছু কঠোর পদক্ষেপ নিলে তাতে অন্তরের অন্তস্তলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অখুশি হয় না। নিঃসন্দেহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব পদক্ষেপ তার দেশে গ্রহণ করতে চাইবে না; তাদের তা প্রয়োজনও নেই। পশ্চিমের দেশগুলিতে এসব কর্মসূচি গৃহীত হোক, সেও হয়তো তারা চায় না। কিন্তু চরম দরিদ্র দেশগুলির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ভিন্ন।'

'আপনার তাই ধারণা?' জনসন সতর্ক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে। আহসানের চিন্তা-ভাবনার এ নতুন ধারা দেখে সে বিস্মিত।

'হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা', তিনি উত্তর দেন। তার কণ্ঠে কোনো দ্বিধা নেই। 'একমাত্র সমস্যা হলো, তারা একবার যখন নিজেরা নিজেদের বুঝিয়েছে যে, এ জাতীয় কর্মসূচিতে তারা বিশ্বাস করে না, তারপর থেকে তাদের দেখাতে হচ্ছে, অন্য কোথাও, এমনকি ক্ষুধার্ত এশিয়ায়ও তারা এসব কর্মসূচি বরদাশত করে না।'

জনসন কথাটি কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখে। 'আপনার তত্ত্বের পক্ষে আপনি কী যুক্তি দেখান, বুঝতে পারছি না।'

'যুক্তি দেখাতে পারি না তো', আহসান বলেন, এ কথা স্বীকার করতে তাকে মোটেও বিব্রত দেখায় না। 'তার মানে এই নয় যে, কথাটি অসত্য। আমি মানুষের হৃদয়ের কথা বলছি। নানারকম লোকদেখানো ভঙ্গির প্রকাশ্য সিদ্ধান্ত, অটল বিশ্বাসের অন্তরালে হয়তো কোথাও সত্যিকার মানব-হৃদয় একটি আছে। সেই হৃদয় অন্যের দুঃখ-দুর্দশা বুঝতে পারে।'

জনসন হাসির মতো একটি শব্দ করে। 'আপনি জানেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আপনি পাবেন না।'

'সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। এখানে আপনাদের সাঙ্গপাঙ্গরা কাল আমাকে মেরেও ফেলতে পারে। সে কথা হচ্ছে না। এমন বহু আইনকানুন আছে, যেগুলি তামাদি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেসব আইনের অধীনে মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে।'

'আপনি বলতে চান কমিউনিস্টদের জন্য গোপনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে?'

'না, আপনারা কমিউনিস্টদের ঘৃণা করেন। আমার বক্তব্য সেটি নয়, আমি বলতে চাই : আমাদের ক্ষুধার্ত মানুষজনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কিন্তু তারা এ কথা স্বীকার করতে পারছে না।'

জনসন ঘাড় ফিরিয়ে আহসানের চেহারা দেখার চেষ্টা করে। সে ভাবে, আহসানের চোখ হয়তো এখন অর্ধনিমিলিত; সে এখন নিঃসন্দেহে স্বপ্ন দেখছে। চেয়ারে লেপ্টে থাকলেও এখন তার পা স্থানীয় কায়দায় ছড়ানো।

জনসন উত্তর দেবে না সাব্যস্ত করে। তার আর বলার কী আছে? সে বরং বৃষ্টির অস্পষ্ট শব্দ শোনে। ঘরের ভেতর শত-সহস্র মশার পাখার শব্দ অদৃশ্য গুঞ্জন তোলে।

'একদিন এ কথা আপনি স্বীকার করবেন', কিছুক্ষণ বিরতির পর প্রায় অশ্রোতব্য কণ্ঠে আহসান বলেন।

জনসন এবারও নিশ্চুপ থাকে। সে বৃষ্টিপতনের দূরবর্তী শব্দই শুনতে থাকে। শুনতে শুনতে তার মনে হয়, সে বাইরে বেরোলে হয়তো দেখবে কোনো বৃষ্টি নেই, হাঁটতে থাকলে গায়ে বৃষ্টিপতনের কোনো অনুভূতিই হয়তো পাবে না। সে কি পিছলে কোনো এমন জগতে হাজির হচ্ছে, যে জগৎ অবাস্তব, এ জগৎকে সে চেনে না বলেই এর রঙ, আকার ও মাত্রা নিয়ে সে প্রশ্ন করতে পারে না?

'ওরা আপনাকে জ্বালাতন করছে, তাই না?' বাহুর ওপর চটাস করে একটি মশা মেরে আহসানের দিকে ফিরে জনসন বলে।

'মশার জন্য দুঃখিত', আহসান উত্তর দেন। জনসনের মতো তিনিও জানেন কথাটি খুব সরল নয়, কিন্তু এ প্রতীক্ষার প্রহরে এতে হয়তো কিছু যায় আসে না।

'না, আমি আপনাকে ঘৃণা করি না', জনসন অবশেষে ঘোষণা করে।

একজন এশীয়র সংলাপ

এশিয়া ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ অঞ্চলে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কেন প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যায় না এবং সে তুলনায় অনেক কম অর্থ ব্যয় করে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে কিছু ব্যয় না করেই, শত্রুপক্ষ কী করে এত ভালো ফলাফল করছে, এ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায়শ গুরুতর অনুসন্ধান শুরু হয়। তখন স্থানীয় ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ও ককটেল পার্টিকেন্দ্রিক কূটনীতি থেকে শুরু করে অনুন্নত দেশে অপ্রয়োজনে বড় বড় প্রকল্পে অর্থব্যয় অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাভবের নানা কারণ আবিষ্কৃত হয়।

এসব কারণের পেছনে যুক্তি আছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ ও সামর্থ্য বিচারে এসব সীমাবদ্ধতার কোনোটিকে জয় করাই দুঃসাধ্য নয়। আমরা কি ধরে নিতে পারি, এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠামাত্র বিজয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতের মুঠোয় চলে যাবে?

এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের আগে আমাদের অবশ্যই আরেকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লড়াইটি কীসের?

পরিস্থিতি কেন অনুকূল হচ্ছে না এবং এশিয়া ও অন্যত্র মার্কিন নীতির আরো উন্নতি-সাধনের পরামর্শ বাস্তবায়িত হয়ে যাওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কতটা সাফল্য প্রত্যাশা করা উচিত—তা নির্ণয়ের জন্য আগের প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান জরুরি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, তার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ও তর্কাতীত। সমাজতন্ত্র-বিরোধী হিসেবে সমাজতন্ত্রের বিস্তার প্রতিরোধ করার এবং সম্ভব হলে সমাজতন্ত্রকে পরাভূত করার এক সুবিশাল দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে এবং যেহেতু অকমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে সম্পদশালী ও শক্তিমান, সে জন্য এ ব্যাপারে তার নেতৃত্ব স্বভাবত মেনে নেওয়া হয়। সেই একই কারণে কিউবায় বাতিস্তা সরকার উৎখাত হলে কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঢেল অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা সত্ত্বেও ভিয়েতকংদের পিষে ফেলতে দিয়েম ব্যর্থ হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই দায়ী করা হয়। পশ্চাৎপদ এলাকা ত্যাগে বাধ্য হওয়া পুরনো পরাশক্তিগুলি তখন উপহাসের হাসি হেসে সাব্যস্ত করে, কূটনীতি ও বিশ্ব-পরিস্থিতির বিষয়ে এখনো অনভিজ্ঞ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শত্রুর সমকক্ষ হতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও চলে অনিবার্য বিলাপ ও মর্ষকামী আত্মসমালোচনা : সে তার দায়িত্ব পালনে ও লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু এতে এশিয়ার জনগণের মনোভাব কী? নিঃসন্দেহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ প্রশ্নটি নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। হয় তারা ধরে নেয় দরিদ্র এশীয়দের কর্মকাণ্ডে তাদের কিছু যায়-আসে না, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ লড়াইয়ের উদ্দেশ্য বোঝার মতো শিক্ষা-দীক্ষা তাদের নেই; অথবা মনে করা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য এশীয়দের (সমাজতান্ত্রিক প্রচারণার শিকার গুটিকয়েক লোক বাদে) অনুধাবন করতে হবে এবং এর মর্ম উপলব্ধি করতে হবে, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ন্যায়ের পক্ষে।

এশিয়ার জনবহুল একটি দেশের এক কৃষকের কথা ভাবা যাক। ভূমিহীন এ কৃষকের পরিবারে চারজন সদস্য, তাদের মুখে খাবার যোগানোই তার সার্বক্ষণিক চিন্তা, তিনবেলা কারো খাবার জোটে না। বলা নিষ্প্রয়োজন, তার এ দুর্দশা কোনো ব্যতিক্রম নয়, দেশের ৮০ শতাংশ কৃষকের মধ্যে ৫০ শতাংশেরই জমিজমা নেই।

একদিন এক নিবেদিতপ্রাণ মার্কিনি হাঁটতে বেরোয়। ভাষাশিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সে স্থানীয় ভাষায় নির্ভুলভাবে কথা বলতে পারে।

কৃষক : আমাদের গ্রামে আপনি কী চান?

মার্কিনি : আমি ধানের ফলন বাড়াতে তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি।

কৃষক : আপনার কী দয়া! কিন্তু আমাদের জন্য এসব করে আপনার লাভ?

মার্কিনি ইতস্তত করে, কারণ এখন পর্যন্ত কেউ তাকে এ প্রশ্ন করেনি। এ দেশের দরিদ্র লোকজনের প্রতি আন্তরিক টানের কারণে কি সে এ কাজ করছে? সে জানে না। সে কি সামান্য মিথ্যাচার করবে? না, লোকটিকে সে সহজ-সরল সত্যটি জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

মার্কিনি : আমি চাই তোমরা ভালো থাকো, কারণ আমি চাই না কমিউনিস্টরা তোমাদের নাগাল পাক।

কৃষক : কমিউনিস্ট আবার কারা?

মার্কিনি : ওরা খারাপ লোক। মানুষের জমি কেড়ে নেয়।

কৃষক : আমার কাছ থেকে তো কাড়তে পারবে না। আমার জমি নেই।

মার্কিনি : কোনোদিন জমি হলে তখন কেড়ে নেবে। একদিন তো তোমার জমি হবেই।

কৃষক : ওরা কি আমাদের জোতদারদের চেয়েও খারাপ?

মার্কিনি : (চারপাশে তাকিয়ে) তার চেয়েও জঘন্য। ওরা মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতাও কেড়ে নেয়। ওরা মানুষকে দাস বানায়।

কৃষক : আমার ছেলে-মেয়েগুলিকে ওরা খেতেটেতে দেবে না?

মার্কিনি : (বিরক্ত ভঙ্গিতে) খাওয়া-দাওয়াই সবকিছু নয়। মানুষের আরো চাহিদা আছে, তাই না?

কৃষক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

মার্কিন ভদ্রলোক কৃষকের নিজের ভাষায় কথা বলে, কিন্তু তার কথার অর্থ সে বুঝতে পারে না।

এশিয়ার বিপুল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থ হওয়ার কারণ ভাষার প্রতিবন্ধকতা নয় বরং নিঃসন্দেহে তাদের বক্তব্য; তাদের এ লড়াইয়ের উদ্দেশ্য বুঝতে দরিদ্র এশিয়াবাসী ব্যর্থ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যদি কোনো বক্তব্য থেকে থাকে, তাদের কাছে তা কোনো অর্থ বহন করে না। একজন মার্কিনির আতঙ্কের বিষয় তাকে আতঙ্কিত করে না। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র এমন কিছু রক্ষা করতে চায় যা তার আছে, বিপরীতে এশীয়রা এমন কিছু রক্ষা করতে চায় যা তাদের নেই।

এশিয়া ও বিশ্বের অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের প্রত্যাশা কী? সর্বাগ্রে তারা চায় অত্যন্ত অবমাননাকর মানবিক অবস্থা থেকে মুক্তি : নিজেকে এবং নিজের পরিবারের খাবার যোগানোর অক্ষমতা, অনাহারের সার্বক্ষণিক হুমকি, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি। আজ তারা এমন এক মুক্তবিশ্বে বসবাস করছে, যেখানে কেউ দারিদ্র্য গোপন করতে পারে না। তার চারপাশে তাকিয়ে যা দেখে, তাতে সে গভীর লজ্জায় পতিত হয়। এ এমন এক লজ্জা, যা অবস্থাপন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীটিও উপেক্ষা করতে পারে না, কারণ ধনী দেশগুলি এদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা না করে বরং উৎস-দেশের অবস্থা বিবেচনায় নেয়। দেশের অভ্যন্তরেও এরা এদের সুদৃশ্য গৃহে বাস করে কিংবা গাড়িতে বসে বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে না। কারণ চতুর্দিকে মানুষের ভয়াবহ দুরবস্থা তাদের ঘিরে রাখে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখানে সম্পদশালী হওয়ার স্বপ্ন দেখে না। শুধু কুৎসিত শকুনের মতো ক্ষুধার স্থলে তাদের সন্তানের মুখে হাসি ফোটানোর মতো সামর্থ্যটুকু হলেই তাদের চলে।

এ জন্য এশিয়া ও অন্যত্র কোটি কোটি মানুষের প্রধান দুশ্চিন্তা নিঃসন্দেহে সমাজতন্ত্রের হাত থেকে নয়, ক্ষুধা ও অনাহারের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি তাদের অনাহার থেকে রক্ষা করতে পারবে? এটি চিন্তা করাও বাতুলতা যে, সর্বান্তঃকরণে মানবদরদি হওয়া সত্ত্বেও একটিমাত্র দেশের পক্ষে এত বিপুল জনগোষ্ঠীকে ভয়াবহ দারিদ্র্যের গহ্বর থেকে টেনে তুলতে বিশেষ কিছু করা সম্ভব। তাই পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন, তা কেবল এক শুভেচ্ছার নিদর্শন ছাড়া বিশেষ কিছুই হতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেও মনে করে, এ সাহায্য এসব দেশে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটাতে না পারলেও, অন্তত কিছু পরিমাণে তাদের দুর্দশা লাঘবে সহায়ক হবে। এদিকে, এসব দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টার অর্থহীনতা অনুধাবন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাহায্য-সহযোগিতা সবচেয়ে সুবিধাজনক অংশটির হাতে পৌঁছে দেবে বলে সাব্যস্ত করেছে, আর সেই অংশটি হলো অতি ক্ষুদ্র ধনিক শ্রেণী। ক্ষুদ্র হওয়ায় এদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। তাছাড়া সমাজতন্ত্রের বিপদ অনুধাবনের সামর্থ্যও এরা রাখে। এরা পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হয় যে, ব্যক্তিমালিকানা ও অবাধ বাণিজ্যের মতো নীতিগুলি অক্ষত থাকার ওপরই তাদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে এবং এ কারণে স্বভাবতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্বেগের এরাও অংশীদার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সহায়তা যা দেয়, তার একটি অংশের লক্ষ্য থাকে মার্কিনপন্থী গোষ্ঠীগুলির ভিত শক্ত করা। এ ছাড়াও তারা এসব দেশের সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নে সহায়তা করে, তাতে শুধু মার্কিন সামরিক ঘাঁটিরই সুবিধা হয় না, ক্ষমতাসীনরাও যে কোনো অনভিপ্রেত জঙ্গি-বিরোধিতা মোকাবিলায় সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে জনগণকে এ কথা বোঝানোর জন্য প্রচার-প্রচারণা শুরু হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সহায়তা ছাড়া দেশ ভেঙে পড়বে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র না থাকলে রাশিয়া কিংবা চীন ঢুকে পড়বে। প্রথম যুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার নৈতিক অধিকার লাভ করে, দ্বিতীয় যুক্তিটি কাজে লাগে প্রতিরক্ষা খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিরুদ্ধাচরণকারীদের মুখ বন্ধ করতে। ওয়াশিংটনে এসব দেশের ক্ষমতাসীনদের গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে জাহির করা হয় এবং এরা এক ধরনের ভূমিসংস্কার পদক্ষেপ গ্রহণ

করার সঙ্গে সঙ্গে তা নিয়ে ব্যাপক গুণকীর্তন শুরু হয়। এ ভূমিসংস্কার কর্মসূচিতে ভূস্বামীরা তাদের অগাধ সম্পত্তির একটি ক্ষুদ্র অংশ ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সরকারের কাছে সমর্পণ করে, সেই অর্থ তখন বিনিয়োগের পেছনে ব্যয় করা হয়, আর এ প্রক্রিয়ায় সামন্তপ্রভুদের রাতারাতি রূপান্তরিত করা হয় আধুনিক শিল্পপতিতে। ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন চক্রটি এটুকু অনুধাবনে সক্ষম হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া দেশ ভেঙে পড়ুক আর না পড়ুক, তারা নিজেরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। নিজ দেশবাসীর দুর্দশা বিস্মৃত হতে পারে না বলে নিজেদের কথা ও কাজের অমিল সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল থাকে এবং এ কারণে তারা বুঝতে পারে তাদের ক্ষমতা আসলে সাময়িক, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ফলে তারা যত দ্রুত সম্ভব নিজেদের এবং আত্মীয়স্বজনের পকেট ভারী করতে সচেষ্ট হয়। জনগণ তাদের গুরুতর সংকটের আশু সমাধানের জন্য যতই দাবি জানাতে থাকে, ক্ষমতাসীনরাও ততই নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, আর বিপরীত দিকে বিরোধী পক্ষও ততই শক্তিশালী হয়। ক্ষমতাসীন চক্রটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় আরো নিরাপদ বোধ করে এবং দেশ পরিচালনায় তাদের সামর্থ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশ্ন তুললে তারাও এই জুজু দেখায় যে, সমাজতন্ত্রই তাদের একমাত্র বিকল্প, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট যে কোনো এশীয় গোষ্ঠী এতদিনে জেনে গেছে, কমিউনিস্টদের এ জুজু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বোধশক্তিহীন করে তোলে। আর এভাবে এক দুষ্টচক্র বহাল থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট ক্ষমতাসীন এ চক্রের ঝুঁকিরও অন্ত নেই। চক্রটি এ কথা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য তাদেরকে মূল্য দিতে হচ্ছে। তবু ব্যক্তিগতভাবে বিপাকে না পড়লে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষির অভিপ্রায় দেখায় না। কিন্তু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঢেল সাহায্য-সহযোগিতার ফিরিস্তি জনগণকে দেখানোর পরও আসলে যে সত্যিকার কোনো ইতিবাচক ফলাফল জনগণের সামনে উপস্থাপন করা যাচ্ছে না, এ সামান্য কথাটি বুঝতেও কি তারা অক্ষম? দেশের মানুষকে সমাজতন্ত্র প্রতিরোধের সামর্থ্যলাভের উপযোগী করে গড়ে তুলতে মার্কিন জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে উদ্‌গ্রীব হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের এ সহযোগিতার পরিপন্থী অনেক কর্মকাণ্ড যে করছে, এতে কি ক্ষমতাসীনরা এতটুকু অস্বস্তিও বোধ করে না? যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের প্রকৌশলী নিয়োগ করতে এবং সাধ্যের অতিরিক্ত মূল্যে মার্কিন যন্ত্রপাতি কিনতে এসব দেশকে বাধ্য করে; এসব দেশের কোনো রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন করতে শুরু করলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেসব পণ্যের শুল্ক বাড়িয়ে দেয়; নিজেদের কাঁচামালের দাম ক্রমাগত পড়ে যেতে শুরু করায় দরিদ্র দেশগুলির পক্ষে বাণিজ্যচুক্তির শর্ত মেনে চলা অসাধ্য হয়ে উঠলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। অগ্রসর ও পশ্চাৎপদ দেশের মধ্যে দূরত্ব সংকুচিত হওয়ার বদলে প্রতিনিয়ত ক্রমাগত প্রশস্ত হচ্ছে।

তবে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এবং বর্তমান যুগের দুরূহ জটিল অর্থনীতি অনুধাবনে সক্ষমতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাদের তারিফ করে যাচ্ছে, হয়তো এসব স্ববিরোধ তাদের দৃষ্টি এড়ায় না। হয়তো তারা বুঝতে পারে এক হাতে সাহায্য বাড়িয়ে ধরা হলেও অন্য হাতে তা ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। হয়তো মুখ বন্ধ রাখাই তারা শ্রেয় মনে করে থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার নীতির কাছে ভাগ্য সঁপে দেওয়ার কারণে এ লোকগুলি যারা তাদেরকে ক্ষমতায় বহাল রেখেছে তাদের চূড়ান্ত বিচার-বুদ্ধির ওপর আস্থা স্থাপন করে নিতান্ত দর্শকের আসনে বসে যাওয়া ছাড়া হয়তো আর কোনো বিকল্প খুঁজে পায় না।

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত চোখে পড়ে না, বরং ধনী কেবলই ধনবান হতে থাকায় জনগণের মনে হতাশা ও ক্ষোভ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এরকম অবস্থায় সত্যিকার কঠোর অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি তোলা থেকে জনগণকে কতদিন আর বিরত রাখা সম্ভব? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি এমন কোনো জাদুর কাঠি পেয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে, যা ছুঁইয়ে দেওয়ামাত্র ক্ষুধার্ত জনগণ সম্মোহিতের মতো বিশ্বাস করতে থাকবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে যাওয়া এবং মুক্তবাণিজ্য ও পুঁজির ধীর প্রবৃদ্ধির নীতিতে অবিচল আস্থাই তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু দারিদ্র্যকে একদিন পরাস্ত করতে সক্ষম হবে? তারপর রয়েছে স্বাধীনতার প্রশ্ন, পশ্চাৎপদ দেশগুলির জনগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই স্বাধীন থাকার অধিকার চায়। সাহায্যে কেউ কৃতার্থ হয় না। কারণ এ সাহায্যের সঙ্গে তারা একটি স্বার্থের সুতো বাঁধা দেখতে পায়। এমনকি স্বাধীনতা সামান্যটুকু খর্ব না করেও যদি-বা এ দক্ষিণা গ্রহণ করা সম্ভব হতো, তবু অন্য দেশের দান-দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকার অবমাননা তাদেরকে তাড়িত করত। সমাজতন্ত্রের আতঙ্ক কি দক্ষিণা-গ্রহণকারীর কাছে এ জাতীয় অবমাননা বহাল রাখার পেছনে পর্যাপ্ত যুক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে?

দরিদ্র দেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপদ সম্পর্কে তারা যে সচেতন নয়, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। এমনকি এসব দেশের কোনোটি বিগড়ে বসলে তা যে কেবল কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্রের কারণেই ঘটেনি সে ব্যাপারেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াকিবহাল থাকার কথা। এ ব্যাপারে তারা যে পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিবহাল তা অপ্রকাশিত থাকে না। কারণ দেখা যায়, পশ্চাৎপদ দারিদ্র্যপীড়িত দেশের জনগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। যেমন, প্রতিবছর হাজার হাজার মার্কিন নাগরিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করতে গেলেও, দরিদ্র দেশগুলি থেকে কারো সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়া প্রতিরোধ করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো প্রচেষ্টা বাদ রাখে না।

এ কারণেই কি সব কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব দেশকে তাদের পক্ষে রাখার আশা পোষণ করে? কিন্তু এক্ষেত্রেও তাদের সাফল্য বিতর্কিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অদম্য এক সামরিক শক্তি তাতে সন্দেহ কী। তারা চাইলে পারমাণবিক বোমা ও নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ করে পৃথিবী থেকে মানবজাতির নিশানাও মুছে দিতে পারে। আর এ কারণেই নিজের প্রকৃত সামর্থ্য সম্পর্কে কোনো রোমান্টিক ধ্যান-ধারণা কিংবা মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাস পোষণ করা থেকে তাদের নিজেদের বিরত থাকা এত জরুরি। কারণ একটি ভুল পদক্ষেপ শুধু তাদের জন্য নয়, গোটা বিশ্বের জন্যই ভয়াবহ হতে পারে।

একটি পশ্চাৎপদ দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সে দেশে তাদের স্বার্থরক্ষা করা সম্ভব কি না এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এক্ষেত্রে কিউবা একটি ভালো দৃষ্টান্ত। কেননা আজ আক্ষরিক অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থাবার নিচে বসবাস করা সত্ত্বেও কিউবা তাদের তোয়াক্কা না করে চলতে পারে। কাস্ত্রোর গৃহীত নীতি অতি রুচিহীন মনে হলেও তাকে উৎখাত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে না। বিদেশের মাটিতে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিরুচি হয়? এ যুক্তি ধোপে টেকে

না, কারণ কোরীয় যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশ নিয়েছে, সেখানে ৫৫ হাজার মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামেও বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ভূমিকা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি এ জন্য ভয় পায় যে, কিউবাকে সহায়তা করতে রাশিয়া এগিয়ে এলে শেষ পর্যন্ত তা বিশ্বব্যাপী এক ভয়াবহ হানাহানিতে পর্যবসিত হবে? হতে পারে। এ যদি সত্যি হয়, তাহলে আর সন্দেহ থাকে না যে, সমমাপের অথবা প্রায়-সমমাপের একটি সামরিক শক্তি হিসেবে রাশিয়ার উত্থান এবং সমাজতান্ত্রিক চীনের অভ্যুদয়ের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষাবর্ম অনেকখানি সংকুচিত হয়ে গেছে এবং এ কারণে এশিয়ার বহু দেশ আজ নির্বিঘ্নে কিউবার মতো স্পর্ধা দেখাতে সক্ষম। কিন্তু কাস্ত্রোর এখনো ক্ষমতায় টিকে থাকার মূল কারণ সম্ভবত এই যে, মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে যেমন বলা হয়েছে, দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবেতনভুক স্কুলশিক্ষক, কেরানি ও অন্যান্যদের মধ্যে কাস্ত্রোর ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। তাছাড়া কাস্ত্রো এমন কোনো হিস্পানি শাসক নন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যার বিরুদ্ধে রাফ রাইডারদের পাঠিয়ে দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে শুধু যা করা সম্ভব তা হলো এই আশায় প্রহর গুনতে থাকা যে, একদিন কিউবার জনগণ কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে, যেমনটি তারা গড়ে তুলেছিল বাতিস্তার বিরুদ্ধে; ঠিক যেভাবে চিয়াং কাইশেক প্রহর গুনছেন, মূল ভূ-খণ্ডের চীনারা একদিন মাও সে তুংয়ের সরকারকে উৎখাত করবে। কাস্ত্রো যদি টিকে থাকেন তবে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, একজন দেশনেতা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে শুধু বাগাড়ম্বরের আশ্রয় না নিলে এবং তাদের আশু সমস্যা অনুধাবন করে তা সমাধানের উদ্যোগ নিলে (সে নেতা হয়তো তার দেশকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করতে পারবেন না, তবে তার প্রধান চিন্তা হবে জনগণের দারিদ্র্যমোচন) অগাধ সম্পদ সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না।

এমন পরিস্থিতিতে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, পশ্চাৎপদ দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যময় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এসব দেশে তার প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থও হয়, তবু কারো পক্ষে হলফ করে বলা সম্ভব নয় কতদিন পর্যন্ত সে-প্রভাব অটুট থাকবে।

এ ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি কিছু করার আছে? তার মহান নিয়তি পরিপূর্ণ করতে এবং বিশ্ব তার কাছ থেকে সঙ্গত কারণেই যা প্রত্যাশা করে তা পূরণ করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কিছু একটা করতেই হবে।

সবার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, তার নিজের জন্য যা মঙ্গলজনক, পশ্চাৎপদ দেশগুলির জন্য তা মঙ্গলজনক নাও হতে পারে। সে আজ যে অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, তার পেছনে নিঃসন্দেহে রয়েছে অবাধ বাণিজ্যের ভূমিকা, কিন্তু পশ্চাৎপদ দেশগুলির জন্য তা অপর্যাপ্ত ও নৈরাজ্যজনক হয়ে উঠতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এও মেনে নিতে হবে যে, দরিদ্র দেশগুলি যা চায়, রাশিয়া ও চীন না থাকলেও তারা তা-ই চাইতে পারত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এও বুঝতে হবে, পশ্চাৎপদ দেশগুলির কোনোটি যদি তাদের বিপরীত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে সাফল্য লাভ করে, তাহলে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় ও রাশিয়ার বিজয় হিসেবে বিবেচ্য হওয়া উচিত নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ কথাও মনে করার কোনো কারণ নেই যে, একটি পশ্চাৎপদ দেশের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নিলে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাশিয়া বা চীনের দিকে

ঝুঁকে পড়বে। পশ্চাৎপদ যেসব দেশ নানারকম সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টা করছে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু বা মিত্র হতে না পারার কোনো কারণ নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যেকোনো দেশের গণমানুষের পক্ষাবলম্বন করতে হবে, কেননা সব দুর্দশা তাদেরই পোহাতে হয় এবং এ কারণে তারাই একটি দেশের আসল নীতিনির্ধারক। তাদের সমর্থন ছাড়া সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কৃত্রিম ও ভঙ্গুর হতে বাধ্য, যে কোনো আলোড়নে তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে।

একটি কল্পিত দেশের পটভূমিতে রচিত এ উপন্যাসের এটিই মূল বক্তব্য। দেশটি কল্পিত হলেও এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর এখনো নির্ভরশীল যে কোনো দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

আহসানের স্বপ্ন হয়তো কোনো অলীক কল্পনা নয়; এমন আশাও হয়তো বাতুলতা নয় যে, ক্ষুধাকে জয় করার লক্ষ্যে উদ্‌গ্রীব একটি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দের পথ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও সেখানে তার ইচ্ছা জবরদস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিরত থাকতে হবে। এটি যদি সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে কিউবার ব্যাপারে তার কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার ভিন্ন একটি কারণ উপস্থাপন করা সম্ভব। সম্ভবত কেবল যুদ্ধের ভয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না—এ কথা মনে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এক প্রকার অবিচারই করা হচ্ছে। আবার বিবেকের তাড়নার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংযত হয়ে আছে, এমন মনে করলে নিঃসন্দেহে সেটি হবে আত্মপ্রবঞ্চনা। কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে বিষোদগার করে, নিরন্তর হুমকি দেয়, কিন্তু এ কি একেবারে অসম্ভব যে, মনে মনে তারা বাতিস্তার চেয়ে শ্মশ্রুল এই জননেতাকেই কিউবার উপযুক্ত বলে বেশি বিবেচনা করে? নিঃসন্দেহে কাস্ত্রোর ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার আপাত বিরোধিতা দেখিয়েই যেতে হবে, নিজের তৈরি করা ভাবমূর্তির মুখোশ তাকে পরে বেড়াতেই হবে। ভিয়েতনামের জঙ্গলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যা করতে হচ্ছে, তেমনিভাবে হয়তো সে পেশী প্রদর্শন করে যেতে বাধ্য হবে, কিন্তু কাস্ত্রোকে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলেই পিষে ফেলতে চায়? প্রকাশ্যে তারা যাই বলে বেড়াক না কেন, কেউ কি এমন মনে করতে পারে না যে, মনের অন্তস্তলে কোথাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সত্যি সত্যি এ কথা মেনে নেয় যে, ক্ষুধার রাক্ষসকে পরাস্ত করে দারিদ্র্যের চরম অবমাননা ঘোচাতে মানুষের উত্থান নিয়তিনির্দিষ্ট।

নিজের আত্মদম্ভী, স্বেচ্ছাচারী আচরণ, নিজের ব্যবস্থা ও ভয়ঙ্কর অস্ত্রভাণ্ডার টিকিয়ে রাখার এই বাসনার অন্তরালে প্রতিটি মার্কিন নাগরিকের হৃদয়ে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও সযত্নে রক্ষিত আছে চরম দুর্দশার ভেতর দিনাতিপাতকারী পশ্চাৎপদ মানুষের জন্য সহমর্মিতা। হয়তো এই সহমর্মিতাই কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে তাকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছে।

দুর্ভাগ্যবশত এ কথা নিজ মুখে স্বীকার করার সাহস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই। কিন্তু যেদিন সে এ কাজ করতে পারবে, সেদিন ভাষা জানা থাক বা না থাক, বিশ্বের যে কোনো ক্ষুধার্ত জনগণের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে তার কোনো কষ্ট হবে না। কেননা সে তখন তাদের সঙ্গে একমত হবে যে, ভিন্ন একটি দেশের নীতির সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য তারা দুর্দশার মধ্যে দিনাতিপাত করতে পারে না, করা উচিত নয়। সেদিন থেকে এ বিশ্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া অন্তহীন ক্ষুধা ও প্রাণঘাতী অস্ত্রকে আর ততটা ভয়ঙ্কর মনে হবে না।
